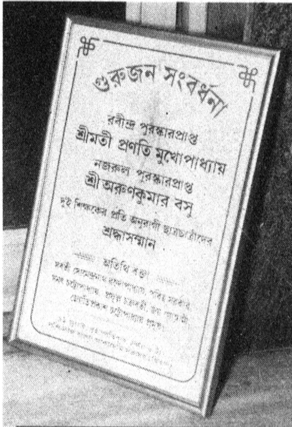
এক মুঠো ফুল

সম্পাদক : অসীম দাশশর্মা

পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা - ৯



গুরুজন সংবর্ধনা : একটি পোস্টার



মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য রবীন্দ্র পুরস্কার স্মারক প্রদান করছেন প্রণতি মুখোপাধ্যায়ের হাতে



উচ্চশিক্ষামন্ত্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী নজরুল পুরস্কার স্মারক প্রদান করছেন অরুণকুমার বসুকে

প্রথম প্রকাশ ২০০০

প্রকাশক
গোপা দাশশর্মা
অরুণকুমার বসু ও প্রণতি মুখোপাধ্যায় সংবর্ধনা সমিতি
নবার্ক। ৫৮/৪৭ বি, প্রিন্স আনোয়ার শাহ্ রোড
কলকাতা ৭০০০৪৫

সম্পাদক পর্ষৎ
মুখ্য সম্পাদক : অসীম দাশশর্মা
সদস্যবৃন্দ : তুলসীদাস লাহিড়ী, বৈদ্যনাথ বসু, কাবেরী রায়, কবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্যামলী মিত্র, গীতশ্রী চট্টোপাধ্যায়, জয় ঘোষাল, মিতা বসু, অনন্যা ঘোষ।

প্রচ্ছদ
রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

অক্ষর বিন্যাস
প্রিন্ট ম্যাক্স, ইছাপুর, ২৪ পরগণা

মুদ্রক
দেজ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩



অরুণকুমার বসুকে সংবর্ধিত করছেন প্রাক্তন ছাত্রী মঞ্জুলা মিত্র



প্রণতি মুখোপাধ্যায়কে সংবর্ধিত করছেন প্রাক্তন ছাত্র তথা ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন শিক্ষক অতীশরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

উৎসর্গ

অধ্যাপক অরুণকুমার বসু ও

অধ্যাপিকা প্রণতি মুখোপাধ্যায়

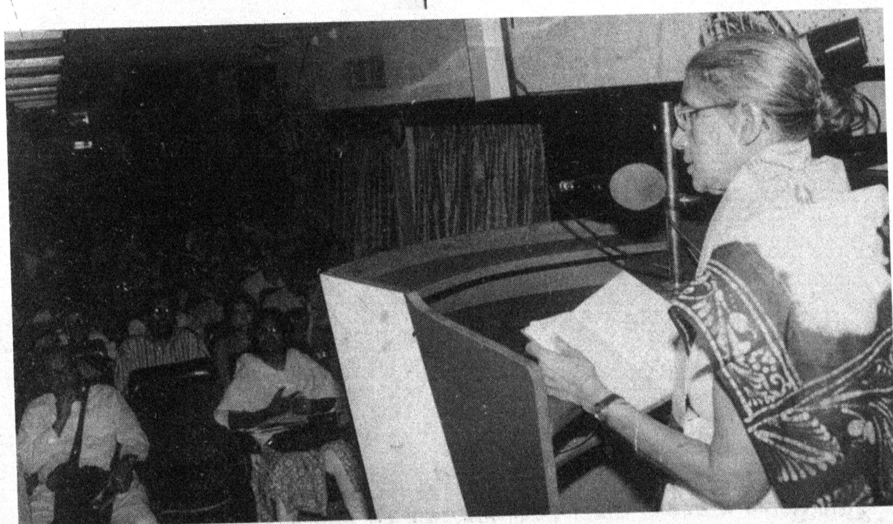
শ্রদ্ধাস্পদেষু



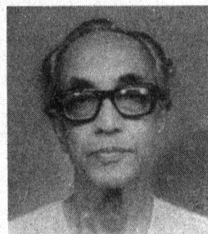
মঞ্চে সভাপতি সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণকুমার বসু ও প্রণতি মুখোপাধ্যায়



প্রত্যভিভাষণ : অরুণকুমার বসু



প্রত্যভিভাষণ : প্রণতি মুখোপাধ্যায়



সদ্যপ্রয়াত অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাস



'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে'



শান্তিনিকেতনের আশ্রমকন্যা অমিতা সেনের সাক্ষাৎকার ১৭ জানুয়ারি ২০০৩

সূচিপত্র

প্রথম পর্ব :	গুরুজন সংবর্ধনা		(৯-৫৪)
	প্রতিবেদন		১১
	সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ		১৪
	আমরা চিরঋণী	নন্দদুলাল বসু	১৫
	শিক্ষকের প্রেরণায় বোধের জাগরণ	শ্যামলী মিত্র	১৭
	প্রণত চিত্তে ঋণ স্বীকার	সুশান্ত নাগ	১৯
	আলোর মত, বাতাসের মত	কাবেরী রায়	২৩
	পথ দেখালেন সোমেনদা	ভক্তি দেবী	২৫
	পারিবারিক প্রভাব	দীপ্তিময় বসু	২৬
	অন্তরের সম্পর্ক, অবিমিশ্র আনন্দ	সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়	২৭
	আমি শ্রদ্ধাশীল	পবিত্র সরকার	২৯
	দুজনেই সারস্বত সাধনায় নিবেদিতচিত্ত	মঞ্জুলা বসু	৩২
	আমরা একই তরণীর যাত্রী	প্রফুল্ল চক্রবর্তী	৩৪
	প্রণতি মুখোপাধ্যায়	তপোব্রত ঘোষ	৩৮
	প্রত্যভিভাষণ :		
	আমার কথা	প্রণতি মুখোপাধ্যায়	৪১
	আমি তো তার ভেলা	অরুণকুমার বসু	৪৭
	সভাপতির ভাষণ	সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫০
	বিশেষ প্রবন্ধ : আমার বন্ধুভাগ্য	দিলীপকুমার বিশ্বাস	৫২
	অনুলেখকের কথা	কাবেরী রায়	৫৪
দ্বিতীয় পর্ব :	প্রসঙ্গ অরুণকুমার বসু		(৫৫-১০০)
	অরুণ বরণ কিরণমালা	বিশ্বনাথ রায়	৫৭
	দিব না ভুলিতে	সুদিন চট্টোপাধ্যায়	৬৫
	নজরুল ঃ পুনর্নির্মাণের মহৎ চেষ্টা	সুধীর চক্রবর্তী	৭৩
	অধ্যাপক অরুণকুমার বসুর জন্য কিছু প্রশ্ন		৭৯
	সে তো আজকে নয়	অরুণকুমার বসু	৮১
	অরুণকুমার বসুর রচনাপঞ্জি	মৌসুমী মল্লিক	৮৯
	ভাস্কর বসুর কিছু গান		৯৯

তৃতীয় পর্ব :	প্রসঙ্গ প্রণতি মুখোপাধ্যায়		(১০১-১৬৭)
	অমর্ত্যকুমার সেন রচিত ক্ষিতিমোহন সেন ও অর্ধশতাব্দীর শান্তিনিকেতন গ্রন্থের মুখবন্ধ : ফ্যাক্‌সিমিলি কপি		১০৩
	আমাদের দিদি — প্রণতিদি	কবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়	১০৬
	আমাদের দীনতাকে লঘু করে দিক এই গ্রন্থ	পার্থ বসু	১০৮
	মোহনদাস প্যাটেলের কয়েকটি চিঠি প্রসঙ্গে		১১০
	'শান্তিনিকেতনে আশ্রমকন্যা' অমিতা সেন-এর একটি সাক্ষাৎকার ও একটি চিঠি	অসীম দাশশর্মা	১১৮
	পাখি তোর সুর ভুলিসনে	প্রণতি মুখোপাধ্যায়	১২৭
	প্রণতি মুখোপাধ্যায়ের রচনাপঞ্জি	গোপা দাশশর্মা	১৫৫
	লেখক পরিচিতি		১৬২

প্রথম পর্ব

গুরুজন সংবর্ধনা

এবছর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রবীন্দ্র পুরস্কার ও নজরুল পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন আমাদের অত্যন্ত আপনজন এবং শ্রদ্ধেয় দুই শিক্ষক। শ্রীযুক্তা প্রণতি মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেছেন তাঁর গবেষণা কর্ম 'ক্ষিতিমোহন সেন ও অর্ধ শতাব্দীর শান্তিনিকেতন' গ্রন্থের জন্য।

ড. অরুণ কুমার বসু তাঁর গবেষণা গ্রন্থ 'নজরুল - জীবনী'র জন্য নজরুল পুরস্কার লাভ করেছেন।

টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ থেকে আগামী ১১ জুলাই ২০০২ সন্ধ্যা ৬টায় পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমী সভাঘরে একটি অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে আমরা এঁদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা সম্মান জ্ঞাপন করব।

সভায় আপনার সানন্দ উপস্থিতি ও সহযোগিতা কামনা করি।

৩১ জুন, ২০০২

সংবর্ধনা সমিতি।

নবার্ক, ৫৮/৪৭ বি, পি.এ.শাহ রোড, কলকাতা-৭০০ ০৪৫

বিনীত -

অনুরাগী ছাত্রছাত্রী

গুরুজন সংবর্ধনা : একটি প্রতিবেদন

মে মাসের শুরুতে যখন *ক্ষিতিমোহন সেন ও অর্ধশতাব্দীর শান্তিনিকেতন* গ্রন্থটির জন্য রবীন্দ্রপুরস্কার প্রাপিকা প্রণতি মুখোপাধ্যায়ের নাম ঘোষিত হল তখন আমাদের মধ্যে আনন্দের প্রবল তরঙ্গোচ্ছ্বাস সৃষ্টি হল। প্রণতিদি চিরকালই নীরব তপশ্চর্যায় বিশ্বাস করেন, একটু যেন গোপনচারী। তিনি উপস্থিত থাকলে তাঁর ব্যক্তিত্বটি প্রকাশ পায়। কিন্তু তিনি কোনো কাজ করলে বা স্থানত্যাগ করলেও শব্দমাত্রার কোনো হেরফের হয় না। প্রচারের আলোতেও তিনি অস্বস্তি বোধ করেন। আমাদের ধারণা, এইসব কারণেই তিনি বেশ ছায়াচ্ছন্ন ছিলেন। প্রণতিদির রবীন্দ্রপুরস্কার প্রাপ্তিতেই গুরুজন সংবর্ধনা নিয়ে ভাবনার সূত্রপাত।

আমাদের আনন্দের মাত্রা দ্বিগুণিত হল যখন এক মাসের মধ্যেই ঘোষিত হল যে *নজরুল জীবনী* রচনার জন্য নজরুল পুরস্কার পাচ্ছেন অধ্যাপক অরুণকুমার বসু — আমাদের আর এক শিক্ষক। অরুণদা বিশাল বৃত্তের মানুষ; নানা কাজও করেছেন, অনেক সম্মানও পেয়েছেন। তথাপি আরো বড় একটা সম্মান তাঁর অবশ্য প্রাপ্য ছিল।

কয়েকটি সভায় আলোচনার মধ্য দিয়ে গুরুজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের রূপরেখা নির্ধারিত হল। কিন্তু সবচেয়ে কঠিন বাধা এই দুই শিক্ষকের আপত্তি। অবশেষে সে বাধাও দূর হল। ছাত্রছাত্রীদের আন্তরিকতা অনুভব করে দুজনেই রাজি হলেন সংবর্ধনা গ্রহণে।

বাংলা আকাদেমি সভাঘরে ঠিক সন্ধ্যা ছ'টায় অনুষ্ঠান শুরু হল। আমাদের সংশয় ছিল যে কুলগোত্রপরিচয়হীন ছাত্রছাত্রীদের মুখের উপরে 'না' বলতে না পারলেও বিদ্বৎজন অনেকেই হয়তো শেষপর্যন্ত অনুষ্ঠানে আসবেন না তাঁদের ব্যস্ত কর্মসূচীর ক্ষতি করে। কিন্তু আমরা বিস্মিত হলাম যে নিতান্ত দু'একজন ছাড়া কেউ অনুপস্থিত নেই। শুধু এই অনুষ্ঠানের জন্যই সুদূর শান্তিনিকেতন থেকে এসেছেন বর্ষীয়ান অধ্যাপক সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। অসুস্থতার কারণে আসতে পারেননি অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাস। এসেছেন বাংলা আকাদেমির সচিব সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য পবিত্র সরকার, রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ও টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন শিক্ষক প্রফুল্ল চক্রবর্তী ও ইনস্টিটিউটের বর্তমান সম্পাদিকা মঞ্জুলা বসু এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক তপোব্রত ঘোষ। বুঝলাম, সকলেই এসেছেন অরুণকুমার বসু এবং প্রণতি মুখোপাধ্যায়ের নাম-মাহাত্ম্যে। শুধুই আসেননি, দীর্ঘ সভায় উপস্থিত থেকে এবং বক্তৃতাদানে সভাকে সার্থক করে তুলেছেন।

আরও বিস্ময়কর টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি। যদিও একথা ঠিক যে এই সংবর্ধনা সভার উদ্যোগ নিয়েছিলেন ৯০-দশকের পূর্ববর্তী প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা, তাঁদের আন্তরিক প্রয়াস সত্ত্বেও যথার্থ সংগঠনের অভাবে সব প্রাক্তনীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। এই দুঃখ তাঁদের এখনও রয়ে গেছে। সেই সন্ধ্যায় বাংলা আকাদেমি সভাঘরে দেখা গিয়েছিল বহু হারিয়ে-যাওয়া মুখ এবং বহু নতুন মুখও। এঁদের

মধ্যে ছিলেন ইনস্টিটিউটের নতুন প্রজন্মের ছাত্রছাত্রীরা, ইনস্টিটিউটের সঙ্গে সম্পৃক্ত নন এমন বহু খ্যাত-অখ্যাত মানুষ। উপস্থিত ছিলেন বাংলা আকাদেমির কর্তাব্যক্তিরা এবং সাধারণ কর্মীবৃন্দ। তাঁদের সকলকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

· স্বাতী বসুর সুকণ্ঠের পরিবেশনায় 'আমার মাঝে তোমারি মায়া জাগালে তুমি কবি' গানটিতে অনুষ্ঠানের সুর বাঁধা হয়ে গেল, তাঁর সঙ্গে সহযোগিতায় ছিলেন তরুণ শিল্পী সৈকত শেখরেশ্বর রায়। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক সোমেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় সভাপতির আসন অলংকৃত করায় সভাটি পূর্ণ মর্যাদা লাভ করে। অসুস্থ শরীরে তিনি এই সভায় এসেছিলেন আমাদের আবেদনে, তাই তাঁকে সহায়তার দায়িত্বে ছিলেন আমাদের সতীর্থ কবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দীর্ঘ তিনঘন্টার সভায় সভাপতির দায়িত্ব পালন করে ফিরে যাওয়ার পথে অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় এত অসুস্থ হয়ে পড়েন যে প্রায় একমাস তাঁকে সেবা-নিবাসে চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে থাকতে হয়েছিল। তাঁর প্রতি আমরা সবিশেষ কৃতজ্ঞ।

ছাত্রছাত্রীদের ভাষণ-পর্বের শুরুতেই নন্দদুলাল বসু সভার নান্দীমুখ পাঠ করেন অকালপ্রয়াত অধ্যাপক টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের রূপকার সোমেন্দ্রনাথ বসুর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে এবং রবীন্দ্রচর্চার এই মূলমন্ত্রটি উচ্চারণ করে —

রবীন্দ্রচর্চা আমাদের জীবনচর্চা।

ছাত্রছাত্রীদের ভাষণের পর সংবর্ধনা প্রদান পর্ব। ফুল, ফল, মিষ্টান্ন, বস্ত্র ও তাম্রফলক দিয়ে শ্রদ্ধেয় দুই শিক্ষককে সংবর্ধিত করা হয়। অধ্যাপিকা প্রণতি মুখোপাধ্যায়কে সংবর্ধিত করেন ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন ছাত্র তথা প্রাক্তন শিক্ষক— অধ্যাপক অতীশরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। অধ্যাপক অরুণকুমার বসুকে সংবর্ধনা প্রদান করেন আমাদের বরিষ্ঠা সতীর্থ মঞ্জুলা মিত্র।

অধ্যাপক প্রণতি মুখোপাধ্যায়কে অর্পিত তাম্রফলকে ছিল *নৈবেদ্য* কাব্যগ্রন্থের ৮২ সংখ্যক কবিতা থেকে উদ্ধৃতি —

শ্রীযুক্তা প্রণতি মুখোপাধ্যায়
করকমলেষু
'তোমার মাধুর্য যেন বেঁধে নাহি রাখে,
তব ঐশ্বর্যের পানে টানে সে আমাকে।'

অধ্যাপক অরুণকুমার বসুকে অর্পিত তাম্রফলকে উদ্ধৃত হয়েছিল কাজী নজরুল ইসলামের *সিন্ধুহিল্লোল* কাব্যের একটি কবিতার অংশ।

শ্রীযুক্ত অরুণকুমার বসু
করকমলেষু
'নিমেষে নিমেষে নব পরিচয়ে
হলে'-পরিচিত মোদের হৃদয়ে,
আসনি বিজয়ী—এলে সখা হয়ে,
হেসে হরে নিলে প্রাণমন।

রাজাসনে বসে হওনিক' রাজা
রাজা হলে বসি হৃদয়ে।'

পরবর্তী পর্যায়ে ভাষণ দেন সম্মাননীয় অতিথিরা। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ভক্তি দেবী, দীপ্তিময় বসু, সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়, পবিত্র সরকার, মঞ্জুলা বসু, প্রফুল্ল চক্রবর্তী ও তপোব্রত ঘোষ।

শিক্ষকদের প্রত্যভিভাষণ পর্বে 'আমার কথা' শীর্ষক লিখিত আত্মকথা পাঠ করেন অধ্যাপিকা প্রণতি মুখোপাধ্যায়। এরপর ছাত্রছাত্রী ও সমবেত সুধীজনের উদ্দেশ্যে স্বল্পায়ত ভাষণ দেন অধ্যাপক অরুণকুমার বসু। তাঁদের ভাষণের মূল সুর ছিল — 'তোমারি সোনা বোঝাই হল, আমি তো তার ভেলা' — রবীন্দ্রগানের এই কথাটি।

সভাপতির ভাষণে অধ্যাপক সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের দুই শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের সারস্বত সাধনা সম্পর্কে মনোগ্রাহী ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ঐতিহ্য অনুসারে সমবেতকণ্ঠে 'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে' — এই গানে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

এই গ্রন্থের 'গুরুজন সংবর্ধনা' পর্বে অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র, কিছু ছবি, সংবাদপত্রে প্রকাশিত কিছু সংবাদ তথ্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হল। সেইসঙ্গে সেই সন্ধ্যার বক্তাদের ভাষণও সংযুক্ত হল।

গুরুজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বহুজনের সহায়তা ও সমর্থন আমরা পেয়েছি যাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকারের সুযোগ পাওয়া যায়নি। কোনো বিশেষ নাম উল্লেখ না করে তাঁদের সকলকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

পরিশেষে, ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই বাংলা আকাদেমি কর্তৃপক্ষকে তাঁদের কাছ থেকে যে সহায়তা লাভ করেছি তার মধুর স্মৃতি মনে রেখে।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ

৭ জুলাই ২০০২ রবিবারের প্রতিদিন

নগর-দর্পণ

গুরুবন্দনা

এবারে গুরুবন্দনার পালা আমাদের। যে শিক্ষকেরা নিজেদের মানসিক জ্ঞানভাণ্ডার উজাড় করে দিয়েছেন আমাদের সঠিক শিক্ষালাভের জন্য, সেই শিক্ষকদের সংবর্ধনার মাধ্যমে আমরা আপ্লুত হব, গর্বিত হবো। ঠিক এরকমটাই ভাবছেন টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট' এর প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা। কারণ আগামী ১১ জুলাই তাঁরা সংবর্ধিত করতে চলেছেন তাঁদের দুই শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রণতি মুখোপাধ্যায় এবং ড অরুণকুমার বসুকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য প্রণতি মুখোপাধ্যায় এবছর 'রবীন্দ্র পুরস্কার' লাভ করেছেন তাঁর গবেষণা কর্ম 'ক্ষিতিমোহন সেন ও অর্ধশতাব্দীর শান্তিনিকেতন' গ্রন্থের জন্য অন্যদিকে ড অরুণ কুমার বসু তাঁর গবেষণা গ্রন্থ 'নজরুল-জীবনী'র জন্য 'নজরুল পুরস্কার' লাভ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি সভাঘরে এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অতিথি বক্তা হিসাবে থাকবেন সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পবিত্র সরকার, জয় গোস্বামী, জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় এবং তপোব্রত ঘোষ।

কোথায় কী
আনন্দবাজার পত্রিকা
১১ জুলাই ২০০২

বিবিধ ১১.৭.০২

বাংলা আকাদেমি সভাঘর, সন্ধ্যা ৬টা। প্রণতি মুখোপাধ্যায় ও অরুণ কুমার বসুর সম্মাননা উপলক্ষে বলবেন সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পবিত্র সরকার, জয় গোস্বামী, জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়, তপোব্রত ঘোষ, সনৎ কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

আনন্দ

সভা ও অনুষ্ঠান বর্তমান ১১ জুলাই ২০০২

প্রণতি মুখোপাধ্যায় সংবর্ধনা সমিতি: ৬-৩০ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি সভাঘরে এ বছরের রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপক প্রণতি মুখোপাধ্যায় ও নজরুল পুরস্কার প্রাপক অরুণকুমার বসুকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন।

[ছয়] ২৬ জুলাই ২০০২ বর্তমান

নানারকম

২৬.৭.০২ বর্তমান

গুরুজন সংবর্ধনা

শ্রদ্ধা, বিশেষ করে শিক্ষক-গুরুজনদের উদ্দেশে, বিনয় এবং অন্তরের সহমর্মিতা যে আজও নিঃশেষ হয়ে যায়নি তার নিদর্শন রাখলেন টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা।

এই বছর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছেন প্রণতি মুখোপাধ্যায় তাঁর গবেষণা কর্ম 'ক্ষিতিমোহন সেন ও অর্ধ শতাব্দীর শান্তিনিকেতন' এবং নজরুল পুরস্কার পেয়েছেন ডঃ অরুণকুমার বসু তাঁর গবেষণা গ্রন্থ নজরুল-জীবনী'র জন্য। সেই উপলক্ষে টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের দুই প্রিয়জন আদর্শ শিক্ষককে বাংলা অ্যাকাডেমিতে সংবর্ধনা দিল ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রীরা। অনুষ্ঠানে আন্তরিকতার স্পর্শ ছিল সর্বক্ষণ। অনুষ্ঠান শুরু হয় আনন্দ মাঝে তোমারি মায়া ও 'এহি করুণা করুণাময়' রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসঙ্গীত দিয়ে। অসুস্থ শরীর নিয়েও শান্তিনিকেতন থেকে এসেছেন সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সারাক্ষণ মঞ্চে বসে থেকে পৌরোহিত্য করলেন, সুললিত ভাষায় বললেন শান্তিনিকেতনের কথা, রবীন্দ্র পরিবেশের ভূমিকা আর প্রণতিদেবীর গবেষণার বাস্তবতার দিনে তাঁর পাশে থাকার অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের কথা। এই বক্তৃতাও একটি গ্রন্থ হতে পারে।

বহু প্রবীণ-নবীন অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রী যেমন তপোব্রত ঘোষ, সুশান্ত দাস, কাবেরী রায়, শ্যামলী মিত্র, নন্দদুলাল বসু, মঞ্জুলা বসু পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহের সকলের সুখস্মৃতিরোমন্থন প্রতিনিধিত্ব করেছেন, তেমনই ছিলেন আরও দুজন ছাত্র পবিত্র সরকার ও সনৎ চট্টোপাধ্যায়।

সংবর্ধনার উত্তরে অরুণ বসু ও প্রণতি মুখোপাধ্যায়ও দিলেন মনোজ্ঞ ভাষণ। দুজনের ভাষণের মূল ভাবনা ও সুরেও ছিলেন সেই রবীন্দ্রনাথ 'দিনু যত নিয়েছি তার বেশি এ আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে।'

☐ স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

২৭ জুলাই ২০০২ আজকাল (তিন)

বই

সংবর্ধিত অরুণ ও প্রণতি

কৃষ্ণা দাস এ বছর অর্ধশতাব্দীর প্রণতি মুখোপাধ্যায় তাঁর গবেষণা গ্রন্থ 'ক্ষিতিমোহন সেন ও অর্ধ শতাব্দীর শান্তিনিকেতন'-এর জন্য পেয়েছেন রবীন্দ্র পুরস্কার এবং নজরুল পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন ড অরুণকুমার বসু তাঁর 'নজরুল-জীবনী'-র জন্য দুই পুরস্কারপ্রাপককে শ্রদ্ধা জানাতে টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি সভাঘরে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় স্বাতী ঘোষের রবীন্দ্রসঙ্গীতে। এর পর প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ও টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন ছাত্র প্রতীপরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণতি মুখোপাধ্যায়কে এবং ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন ছাত্রী মঞ্জুলা মিত্র ড অরুণকুমার বসুকে স্মারক প্রদান করেন। উপস্থিত ছিলেন ড. মঞ্জুলা বসু, সনৎ চট্টোপাধ্যায়, ড. পবিত্র সরকার, রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিক্ষক প্রফুল্ল চক্রবর্তী, অধ্যাপক তপোব্রত ঘোষ প্রমুখ। সংবর্ধনার উত্তরে প্রণতি মুখোপাধ্যায় ও অরুণকুমার বসু বলেন তাঁদের অনুভূতির কথা। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন বিশ্বভারতীর অধ্যাপক সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠান শেষ হয় ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের 'আগুনের পরশমণি' গানটি দিয়ে।

আমরা চিরঋণী

নন্দদুলাল বসু

এত গুণীজনের সামনে পুরস্কারপ্রাপকদের পরিচয় তুলে ধরার ধৃষ্টতা আমার নেই। তাঁরা স্বনামধন্য। এখানে উপস্থিত প্রায় সবাই আমাদের ঘরের লোক। তাঁদের সামনে কিছু নিবেদন করা এক কঠিন কাজ; তবু চেষ্টা করছি।

এই শুভ সন্ধ্যায় সবাইকেই শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জানাই। সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের রূপকার রবীন্দ্রচর্চাভবনের প্রাণপুরুষ অধ্যাপক সোমেন্দ্রনাথ বসুকে — যিনি আমাদের পরম শিক্ষক বন্ধু ও একান্ত নির্ভর সকলের প্রিয় 'সোমেনদা', যাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল :

রবীন্দ্রচর্চা আমাদের জীবনচর্চা।
রবীন্দ্রনাথ পড়ুন, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে পড়ুন।

সেই রবীন্দ্রচর্চায় নিবেদিতপ্রাণ আমাদের শিক্ষকমন্ডলীর অন্যতম অধ্যাপিকা প্রণতি মুখোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক অরুণকুমার বসু এ বছর একই সময়ে দুটি উল্লেখযোগ্য পুরস্কার পেয়েছেন। ভাবা যায়! পরপর একই সময়ে আমাদের সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্বীকৃতি রবীন্দ্র-নজরুল নামাঙ্কিত দুটি পুরস্কার আমাদের সকলের প্রিয় প্রণতিদি এবং অরুণদা পেয়েছেন। আমরা যারপরনাই আনন্দিত। এবং এই আনন্দের রেশটুকু পাথেয় করে আমরা সকলের সাথে আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করছি আমাদের শিক্ষকদ্বয়কে। আমাদের এই শিক্ষকমন্ডলী বিনা পারিশ্রমিকে শুধু প্রাণের টানে দিনের পর দিন সানন্দে পড়িয়েছেন এবং আজও পড়ান। মনে পড়ে, খাবার ও চা-পানের জন্য নিজেরা ব্যাগ থেকে টাকা বার করে দেন — যা আজকের দিনে দুর্লভ। তাঁদের কাছে পড়া জীবনের স্মরণীয় প্রাপ্তি। একই বিষয়ে যদি একাধিক শিক্ষকের কাছে পড়া যায়, সব পড়া নতুন মনে হয়। তাঁদের ক্লাস করতে কী আনন্দ! এ দুর্ভাগা দেশে এ রকম শিক্ষক পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। একবার অরুণদা বলেছিলেন — রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে এত উপকরণ আছে যা নিয়ে টানা দু'বছর পড়ানো যায়। অনেকেই জানেন, কলেজের অধ্যাপনা ছেড়ে দিয়ে প্রণতিদি সম্পূর্ণ সময় রবীন্দ্রচর্চার কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। সিলেবাসের পড়ার বাইরে আমরা তাঁদের কাছে জীবনবোধের পাঠ পেয়েছি।



সোমেন্দ্রনাথ বসু

তাঁদের ঘনিষ্ঠ সহজ সান্নিধ্যে সত্য সুন্দর ও উন্নত রুচিবোধের শিক্ষায় জীবনের একটা সার্থকতা খুঁজে পাই। সে পাওয়ার গভীরতা অপরিসীম—একান্ত অনুভব ও উপলব্ধিতে মোড়া। তাঁরা আমাদের কাছে একাধারে শিক্ষক ও সখা। তাঁদের অকৃত্রিম ভালবাসায় আমাদের আবদারের মাত্রা বাড়ে। রক্তের আত্মীয়তার বাইরে তাঁদের সঙ্গে আমরা আত্মীয়-বন্ধুর মত মিশে আমাদের ভাল মন্দ সব কথা বলতে পারি। খুব কাছ থেকে দেখেছি, রোজ পড়াবার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের নিত্যদিনের কাজ, নানা অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা ও তার আয়োজন সংগঠন ও রূপান্তর এবং সর্বোপরি রবীন্দ্রচর্চার সাধনা—যা যথার্থ ভাষায় প্রকাশ করার সাধ্য আমার নেই। এই দীনতা মার্জনা করবেন। তাঁদের কাছে আমরা চিরঋণী। গুরুদক্ষিণা দেবার সাধ্য নেই, শুধু বলি—

তোমারে যা দিয়েছিনু
সে তোমারি দান।

নমস্কার।

শিক্ষকদের প্রেরণায় বোধের জাগরণ

শ্যামলী মিত্র

উপস্থিত সুধীজনকে নমস্কার, দর্শকাসনে গুরুস্থানীয়দের এবং মঞ্চে উপবিষ্ট আমাদের পরম শ্রদ্ধার ভালোবাসার দুই শিক্ষক অরুণদা ও প্রণতিদি এবং মাননীয় সভাপতি শ্রীসোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমার প্রণাম জানাই।

প্রণতিদি আর অরুণদার পুরস্কারপ্রাপ্তিতে আমরা নিজেদের আনন্দের অনুভবকে সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে একসাথে জড়ো হয়েছি, আর খুশির মাত্রাটা এতটাই যে আমিও নিজের অনুভবকে পাঁচজনের সামনে বলতে মঞ্চে উঠেছি। যদিও, ইতোমধ্যে, 'লালমোহনবাবু'র মত সত্যিই আমার হাঁটুতে-হাঁটুতে কনসার্ট শুরু হয়ে গেছে। বলার সময় খেই হারালে আজ ওঁরা তিনজন আমায় বকতেও পারবেন না। কেন না, বাড়িতে কোনও উৎসব-অনুষ্ঠান হলে দেখা যায় বাড়ির ছোটরা কিছু নাহক কাজ খুব সপ্রতিভভাবে করে ফেলে। আমিও সেই সুযোগটা নিচ্ছি।

শিক্ষকদের প্রেরণায় বোধের জাগরণের কথা মনে হলে দুটি নাটকের কথা খুব মনে হয়। একটি *চন্ডালিকা,* অন্যটি সাম্প্রতিক কালের একটি প্রযোজনা — *জন্মদিন*। দুটি নাটকেই দুজন মেয়ের নতুন করে জন্ম ঘটেছিল। সন্ন্যাসী আনন্দ প্রকৃতিকে জলদানের আহ্বান জানিয়ে তার মনে নতুন বোধের জন্ম দিয়েছিলেন। অন্যদিকে *জন্মদিন* নাটকে শিক্ষিকা মিস্ সুলিভান্ অসীম ধৈর্য ও পূর্ণতাবোধ দিয়ে তাঁর ছাত্রী অন্ধ মূক বধির কিশোরী হেলেন কেলারের জীবনের জড়ত্ব ঘুচিয়ে নতুন জন্মদান করেছিলেন। সে ইতিহাস সবার জানা। আমার মত সাধারণ ছাত্রীর জীবনেও এই শিক্ষকদের ভূমিকা এমনি বড়, উদার। নইলে এমনভাবে সকলের সামনে কিছু বলব—এই সাহস আমার কোনওদিন হত না। পড়ার সিলেবাসের নিয়মের মধ্যে সাহিত্যরসের স্বাদ ও ছাত্র-শিক্ষকের মধুর সম্পর্ক আমার পক্ষে বোঝা-ই সম্ভব হত না, যদি না এঁদের সান্নিধ্য পেতাম। বিশেষ করে টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটে পড়তে এসে এটা মর্মে মর্মে বুঝেছি। এ প্রসঙ্গে স্বর্গীয় সোমেন্দ্রনাথ বসু অর্থাৎ সোমেনদার কথা সবার আগে মনে পড়ে।

অরুণদাকে ইনস্টিটিউটে যেমন তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়েও শিক্ষকরূপে পেয়েছি। গুণিজন ও অধ্যাপক হিসেবে ওঁর স্থান কোথায় তা বলার যোগ্যতা আমার নেই। এটা ভণিতা করছি না। তবে, কত কঠিন বিষয় বা বহুপঠিত কবিতাকে সহজ ও নতুন করে দেখার চোখ তৈরী করে দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে আমাদের *কাহিনী* কাব্যের *'কর্ণকুন্তীসংবাদ'*, *লিপিকা, সোনার তরী-র* 'বৈষ্ণব কবিতা' পড়ানোর কথা মনে পড়বে। একটু ব্যক্তিগত কথা হলেও বলি।

স্যারের চূড়ান্ত ব্যস্ততা সত্ত্বেও ইউনিভার্সিটির ফাইনাল পরীক্ষার সময় রবীন্দ্রনাথের *আত্মপরিচয়*-এর প্রবন্ধ কিভাবে পড়লে এর মূল ভাব ধরা যাবে, তা তিনি অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে বুঝিয়েছিলেন-যা এই নিরেট মগজে এখনও কিছু রয়ে গেছে।

প্রণতিদির কথা বলার সময় আমার একটা স্বাভাবিক সঙ্কোচ হচ্ছে। কেন না, খুব আপন ভালোবাসার মানুষের কথা বলতে গিয়ে কখনও কখনও অতিরঞ্জন এসে পড়ে। আমার ক্ষেত্রে যদি তাই হয় তবে আমি নাচার। তবু একটা কথা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, আমি যা বলব তা কখনও অতিরঞ্জন হবে না, এ কথা আমার সহপাঠীরা মনে মনে বেশ অনুভব করবেন। প্রথমে বলি দিদির পড়ানোর কথা। ইনস্টিটিউটের ক্লাসে উনি *রবীন্দ্রজীবনী, ছিন্নপত্র, জাপান-যাত্রী* পড়িয়েছিলেন। সেই অল্প বয়সেই বুঝেছিলাম রবীন্দ্রজীবনের সঙ্গে রবীন্দ্রসাহিত্যের যোগসূত্রের গভীর দিকটি। একজন শিক্ষকের কতটা যত্ন এবং নিষ্ঠা থাকলে এটা সম্ভব সেটা ছাত্রছাত্রী মাত্রেই উপলব্ধি করতে পাববেন। ক্লাসে *জাপানযাত্রী* পড়াতে গিয়ে দিদির পড়ানো একটা লাইন এখনও আমার কানে বাজে—

মানুষ কি শুধু লোহার কল?

এটা উচ্চারণের মধ্য দিয়ে দিদি এই লাইনের নির্যাসটুকু আমাদের অন্তরে পৌঁছে দিয়েছিলেন। আর এর তাৎপর্য বলার কথা আমাদের সবার নিশ্চয় মনে পড়বে।

আর, এর বাইরেও, ব্যক্তিগত জীবনে নানা প্রেরণা পেয়েছি। যদি কখনও হতাশার কথা বলি, তখনই স্বভাবসিদ্ধ স্নেহের সুরে বলেন:

তারার দীপ জ্বালেন যিনি গগনতলে,
চেয়ে থাকেন ধরার দীপ কখন জ্বলে।

এমনভাবে যে শিক্ষক তাঁর পূর্ণতাবোধ দিয়ে আমাদের চলার সঙ্গী হন, তাঁর জন্য রইল আমার প্রণাম। সবশেষে বলি, এঁদের স্নেহ-ভালোবাসা আমাদের চলার পথের সঞ্চয় হোক। নমস্কার।

প্রণত চিত্তে ঋণ স্বীকার

সুশান্ত নাগ

সমবেত গুণীজন, উপস্থিত ভদ্রমন্ডলী এবং আমার শিক্ষকেরা,

আজকে এই যে গুরুজন-সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে টেগোর রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউটের প্রাক্তন ছাত্ররা টেগোর রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউটের দুই স্বনামধন্য শিক্ষক - অধ্যাপক ড: অরুণকুমার বসু ও অধ্যাপিকা প্রণতি মুখোপাধ্যায়কে সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করতে চাইছে, এটা এতক্ষণে আপনাদের জানা হয়ে গেছে। সত্যি কথা বলতে কি, ইন্‌স্টিটিউটের যত ছাত্রছাত্রীকেই এখানে ডাকা হোক বলার জন্যে—প্রত্যেকে প্রায় একই কথা বলবে। সেইজন্যে এই কথাটা আপনাদের একটু মেনে নিতে হবে—বারবার একই কথা বলা হবে। কারণ, ইন্‌স্টিটিউটের ছাত্রছাত্রীরা তাদের শিক্ষকদের কাছে এতই স্নেহ-ভালবাসা পেয়ে থাকে এবং এতই কাছের মানুষ হয়ে ওঠে, বা শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের এত কাছের মানুষ হয়ে ওঠেন যে প্রত্যেকেরই ভাবনাটা প্রায় একই রকম হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের এই যে দুই প্রিয় শিক্ষক এ বছর নজরুল পুরস্কার ও রবীন্দ্র পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন তাতে ইন্‌স্টিটিউটের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত, উৎফুল্ল এবং বলতে কী—অত্যন্ত গৌরব বোধ করছি। তাই আমাদের এই দুই শ্রদ্ধেয় শিক্ষককে নিয়ে আজকে আমাদের গর্ব প্রকাশের অনুষ্ঠান।

আমি সাহিত্যের ছাত্র নই, শিক্ষকতার কাজেও যুক্ত নেই। এই দুই স্বনামধন্য শিক্ষকের সান্নিধ্যে আসতে পেরেছি টেগোর রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউটের রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠক্রমে যোগ দেওয়ার পর। আমাদের শ্রদ্ধেয় এই দুই প্রিয় শিক্ষকের যোগ্যতার পরিমাপ করার যোগ্যতা আমার নেই; সে চেষ্টাও করব না। এই শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের যেমন দেখেছি, যেমনভাবে পেয়েছি, সেই বিষয়ে দু'চার কথা আমার পূর্ববর্তী বক্তাদের মতই বলতে চাই।

এ সব কথা বলতে গিয়ে একটা সংকোচ মনে জাগছে, সেটা একটু বলে নেওয়া ভাল। রবীন্দ্রনাথ *কণিকা*-র একটা কবিতায় লিখেছেন যে চাঁদকে উঠতে দেখে কেরোসিন শিখা চাঁদকে দাদা বলে ডেকে উঠেছে। আমারও বুঝি সেই অবস্থা অনেকটা। অধ্যাপক ড: অরুণকুমার বসুকে আমি ইন্‌স্টিটিউটের অনেক ছাত্রছাত্রীর মতো 'দাদা' বলে সম্বোধন করে থাকি। তেমনি অধ্যাপিকা প্রণতি মুখোপাধ্যায়কে আমরা 'দিদি' বলে ডাকি। 'শিশু যেমন মাকে নামের নেশায় ডাকে', ঠিক তেমন না হলেও এই দাদা-দিদি ডাকে আমাদেরও প্রাণ ভরে ওঠে। চাঁদকে দাদা ডেকে কেরোসিন শিখা গর্ব বোধ করেছে। আমাদেরও সেই অবস্থা। এই সঙ্গে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদ্বয় অরুণকুমার বসু ও প্রণতি মুখোপাধ্যায় সহজ ঔদার্যবশেই আমাদের দাদা ও দিদি ডাকার সুযোগ দিয়েছেন ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে দূরত্বের ব্যবধান ঘুচিয়ে দিতে টেগোর রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউটের ধারা অনুযায়ী। ওনারা

কখনও *কণিকা*-র ওই কবিতার কেরোসিন শিখার মতো ভাবেননি—'ভাই বলে ডাকো যদি দেব গলা টিপে'।

এই দুই অধ্যাপকের বিদ্যাচর্চার সোপান প্রসঙ্গে সামান্য উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে মনে করি। অরুণদা বেলেঘাটা দেশবন্ধু স্কুল থেকে পাশ করে প্রেসিডেন্সি কলেজে আই.এ. পাশ করার পর বঙ্গবাসী কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ.তে বাংলায় প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় হন। তিনি প্রথমে বঙ্গবাসী কলেজে পড়ান, পরে ১৯৭০ সাল থেকে ১৯৯৫ পর্যন্ত দীর্ঘ পঁচিশ বছর প্রায় রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। মাঝে বছরখানেকের জন্য অরুণদা কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার ছিলেন। তিনি কলকাতা ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিথি অধ্যাপক হন। অরুণদা প্রথমে ড. শশিভূষণ দাশগুপ্তের অধীনে গবেষণা করতে শুরু করেন। পরে প্রমথনাথ বিশীর তত্ত্বাবধানে 'বাংলা কাব্যসংগীত ও রবীন্দ্রসংগীত' বিষয়ে গবেষণা করে ডক্টরেট হন। তাঁর লেখা প্রকাশিত গ্রন্থগুলি হল ঃ *বাংলা কাব্যসংগীত ও রবীন্দ্রসংগীত, শক্তিগীতি পদাবলী, রবীন্দ্রবিচিন্তা (প্রবন্ধ সংকলন), ক্ষণিকের বাণীশিল্পী রবীন্দ্রনাথ, সামান্য সুখ প্রামাণ্য দুঃখ (কবিতা সংকলন), তিন তাসের পালা (কবিতা সংকলন), কহত কবীর শুনো ভাই সাধু* এবং *নজরুল-জীবনী।* এই নজরুল-জীবনীর কথা তো এর আগে শুনেছেন—এর জন্য অরুণদা এবার নজরুল-পুরস্কার পেয়েছেন।

অধ্যাপিকা প্রণতি মুখোপাধ্যায়ের স্কুল-কলেজে পড়াশুনা বেথুন স্কুল ও কলেজে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিলজফির এম.এ. প্রণতিদি পরবর্তীকালে ইংরেজীতে এম.এ. করেন মূলত সোমেন্দ্রনাথ বসুর অনুপ্রেরণায়। প্রণতিদি পনের বছর রামমোহন কলেজে অধ্যাপনা করার পরে কলেজে পড়ানো ছেড়ে দিয়ে টেগোর রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউটে পড়ানো ও পরিচালনার দায়িত্বে মনোনিবেশ করেন। প্রণতিদির লেখা প্রকাশিত গ্রন্থগুলি হল: চার্লস ফ্রীয়ার এন্ডরুজের দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে লেখা *বড়দাদা*-র বাংলা অনুবাদ, যুগ্মভাবে সোমেন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে লেখা দুটি গ্রন্থ—*Andrews Papers - Gandhiji on Andrews* এবং *List of Writings by C.F Andrews, রবীন্দ্রগ্রন্থ—কালানুক্রমিক সূচী, শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম, উইলিয়াম উইনস্ট্যানলি পিয়র্সন* এবং N.B.T থেকে প্রকাশিত *পিয়র্সন,* এবং *ক্ষিতিমোহন সেন ও অর্ধশতাব্দীর শান্তিনিকেতন*—যে গ্রন্থটির জন্য প্রণতিদি রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছেন।

আমি ১৯৭১ থেকে ১৯৭৩-এ টেগোর রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউটের ছাত্র ছিলাম। ফলে অরুণদার কাছে ক্লাসের শিক্ষা পাওয়ার সুযোগ আমার তেমন হয় নি। কিন্তু যেটুকু সুযোগ হয়েছে তাতে অরুণদার স্পষ্ট বাচনভঙ্গী, শব্দচয়ন এবং সর্বোপরি বিষয়ের মূলকে সহজে গ্রহণযোগ্য করিয়ে দেওয়ার অনায়াস ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ হয়েছি। তা-ছাড়া আরও একটা জিনিস আমাকে মুগ্ধ করেছে—তা হল অরুণদার আগ্রহ ও বিচারের ব্যাপ্তি। রবীন্দ্রসাহিত্য, কবিতা তো আছেই, তার সঙ্গে রবীন্দ্রসঙ্গীত ও অন্যান্য বাংলা গানে অরুণদার অধিকার

আমাদের মনে সম্ভ্রম জাগাত। অনেক সুপরিচিত বহুশ্রুত আধুনিক বাংলা গানের লেখক 'ভাস্কর বসু' যে আমাদের অরুণদা, তা জেনে আমাদের গর্ববোধ হত। যে কথা আগে বলেছি—আমি অরুণদার পাণ্ডিত্যের মূল্যায়ন করতে চাইছি না; অরুণদাকে নিয়ে আমাদের মুগ্ধতার প্রকাশ করতে চাইছি। মনে আছে, অরুণদা একবার *করুণাসাগর বিদ্যাসাগর* এর লেখক ইন্দ্রমিত্র-কে ইন্‌স্টিটিউটে এনেছিলেন বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বক্তৃতা দেওয়ার জন্যে। ইন্দ্রমিত্রর বক্তৃতা দিতে প্রবল দ্বিধা ছিল, কারণ তিনি বক্তৃতা দিতে অভ্যস্ত ছিলেন না। অরুণদা সেদিন শ্রোতাদের স্বার্থে নানা প্রশ্নের মাধ্যমে ইন্দ্রমিত্র-কে দিয়ে যেভাবে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে নানা কথা ও বিদ্যাসাগর সম্পর্কে লেখার উপায় বিষয়ে বলিয়ে নিয়েছিলেন তাতে শ্রোতারা তো বটেই, মনে করি লেখকও তৃপ্ত হয়েছিলেন।

তবু মানতেই হয় যে তুলনায় অরুণদার সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের একটা সম্ভ্রমের দূরত্ব ছিলই। অরুণদার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে একটা গাম্ভীর্যের আবরণ থাকে। বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিত্বে এ রকম গাম্ভীর্য ছিল বলে শুনেছি।

প্রণতিদির কাছে পড়তে গিয়ে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছি প্রণতিদির পড়াবার ভাষায়। 'সহজ কথা যায় না বলা সহজে'—এ কথা রবীন্দ্রনাথ বললেও আমার মনে হয় কঠিন কথাও সহজে বলা যায় না, বিশেষ করে সহজ ভাষায়। প্রণতিদির ব্যক্তিত্ব, ব্যবহার ইত্যাদির মধ্যে যে সহজ ভাব আছে ওনার ভাষাতেও তা পরিস্ফুট। ফলে পড়ানো কথা সহজেই শিক্ষার্থীর অন্তরে পৌঁছে যায়। এই সহজ ভাষার সঙ্গে দেখেছি রবীন্দ্রনাথের কবিতা-গানের অংশ এত সাবলীলভাবে প্রণতিদি মিশিয়ে দেন যে ওই কবিতা-গানের অংশ এবং পড়ানো বিষয়—দুই-ই স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয় ছাত্রছাত্রীদের কাছে।

ছাত্রছাত্রী শিক্ষকের যত কাছে আসতে পারে ততই শিক্ষালাভ সহজ হয় — এমন কথা মনে করা হয়। প্রণতিদির কাছে ছাত্রছাত্রীরা সহজে পৌঁছতে পারতাম প্রণতিদির সহজ ব্যবহারের জন্যই নয়, তার চেয়েও বড় কারণ হল প্রণতিদির ব্যক্তিত্বে স্নেহ-লাবণ্যময়তার প্রাচুর্য। তার ফলে প্রণতিদি খুব সহজেই ইন্‌স্টিটিউটের ছাত্রছাত্রীদের কাছের মানুষ, প্রিয়জন হয়ে ওঠেন।

টেগোর রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউটের প্রথম কর্ণধার ছিলেন সোমেন্দ্রনাথ বসু। তিনি ছিলেন আমাদের সকলের অধিনায়ক। সোমেনদার সুযোগ্য এবং অন্যতম প্রধান সহকারী ছিলেন প্রণতিদি। আমরা প্রণতিদির স্নেহ-মমতার ধারায় সিক্ত হয়ে অচিরে তাঁর সৈনিক হয়ে উঠেছিলাম। এখন দূর থেকে সেই সময়ের দিকে তাকিয়ে মনে হয় প্রণতিদির সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের সম্পর্ক ছিল অনেকটা রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে উপন্যাসের বিমলার সঙ্গে অমূল্যের সম্পর্কের মত। এ সম্পর্কের মূলে ছিল স্নেহ ও ভালবাসা। আমরা, অন্তত আমি, প্রণতিদির স্নেহের কাঙাল ছিলাম, এখনও আছি। বাঁধনবিহীন যে স্নেহের বাঁধন তাতে

প্রণতিদির ছাত্রছাত্রীরা আবদ্ধ হয়ে আছে। ও সে স্নেহের টানে টেনে আনে, স্নেহের বাঁধন জানে না কে। আমরা মিলেছি আজ কিসের ডাকে?

শিক্ষক যখন ছাত্রছাত্রীদের মুগ্ধ করতে পারেন তখন শিক্ষা দেওয়া সহজ হয়। মুগ্ধ ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা দান প্রণতিদির কাছে কেবল ক্লাসের সময়ে সীমাবদ্ধ থাকত না। ছাত্রছাত্রীরা তাদের যে কোনও কাজ, লেখাপড়া, ভাবনাচিন্তার সঙ্গী করত প্রণতিদিকে। ইন্‌স্টিটিউটের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে রবীন্দ্রচর্চায় যে জোয়ার এসেছিল তাতে প্রণতিদির এই গুণ বিশেষ কার্যকরী হয়েছিল বলে আমার মনে হয়।

প্রণতিদিকে নিয়ে আমাদের মুগ্ধতার আর একটা কারণ দিদির হাতের লেখা। সোমেনদার হাতের লেখা খুব সুন্দর ছিল। প্রণতিদিরও তাই। আমাদের মনে হয়, প্রণতিদির কথায় মুক্তো ঝরে, হাতের লেখায় ফুল ফোটে। প্রণতিদির লেখা পড়লে প্রণতিদির কথা শোনা যায় — কথার ভাষা ও লেখায় এতই মিল। সবচেয়ে যা, প্রণতিদির লেখায় প্রণতিদির ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায়।

এইসঙ্গে আর একটা কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই। প্রণতিদির প্রতি আমার এবং অন্য ছাত্রছাত্রীদের মুগ্ধতা যেমন ছিল, তেমন ছিল ভয়। কোনও কাজ, তা সে লেখাপড়ার কাজই হোক বা অন্য কোনও কাজ, যদি ঠিকমত বা ঠিক সময়ে না করতে পারতাম তা হলে আমরা অত্যন্ত ভয় পেতাম এই ভেবে যে প্রণতিদি অসন্তুষ্ট হবেন। সোমেনদা ইন্‌স্টিটিউটের কর্ণধার, সর্বময় অধিনায়ক, আর প্রণতিদি সোমেনদার ভাবনার প্রতিফলন ঘটাতেন। তবু কাজে, লেখাপড়ায় ত্রুটি ঘটলে সোমেনদার কাছে মার্জনা চাইতে বা ত্রুটি স্বীকার করতে যেতাম কিন্তু প্রণতিদির কাছে যেতে ভয় পেতাম। এর কারণ বিশ্লেষণ করলে মনে হয় ছাত্রছাত্রীদের প্রতি প্রণতিদির স্নেহমমতার প্রাচুর্যে গিয়ে পৌঁছাব।

আজ আমাদের দুই প্রিয় শিক্ষকের কাছে আমাদের গুরু-ঋণ স্বীকার করার দিন। আমরা প্রণত চিত্তে আমাদের শিক্ষকদের কাছে ঋণ স্বীকার করি। আমাদের অরুণদা ও প্রণতিদিকে আমরা আবার প্রণাম জানাই। আপনারা যাঁরা আজ গুরুজন-সংবর্ধনায় আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন, আপনাদেরও নমস্কার জানাই।

আলোর মত, বাতাসের মত

কাবেরী রায়

প্রথমে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক শ্রী অরুণকুমার বসুকে এবং আমার শ্রদ্ধেয়া শিক্ষিকা শ্রীমতী প্রণতি মুখোপাধ্যায়কে। সেইসঙ্গে শ্রদ্ধেয় সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এখানে উপস্থিত শ্রদ্ধেয়-শ্রদ্ধেয়া শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অন্যান্য প্রণম্যপদে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটা দান-প্রতিদানের অপেক্ষা রাখে। কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের প্রতি শিক্ষক-শিক্ষিকার স্নেহ বাবা মায়ের স্নেহেরই অনুরূপ — তা দানপ্রতিদানের অতীত। ছাত্রছাত্রীদের সমস্ত অন্যায় ও অক্ষমতাকে তাঁরা ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখেন, স্নেহ ও শাসনের মাধ্যমে সঠিক পথ নির্দেশ করে দেন। তাই ছাত্রছাত্রীদের কাছে এ ঋণ নয় — এ যে দান, আলোর মত বাতাসের মত সমস্ত জীবন ভরে রাখে। দীর্ঘদিন্ বিচ্ছিন্ন ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা আজ তাই সম্মিলিত হয়েছি আমাদের অত্যন্ত আপনজন অরুণদা ও প্রণতিদির সম্মানলাভের গৌরবে গৌরবান্বিত হয়ে তাঁদের শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করার উদ্দেশ্যে।

পড়াশোনার ধরা বাঁধা গন্ডী অতিক্রম করে টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সম্পূর্ণ এক ভিন্ন অনাস্বাদিত পরিবেশে উপনীত হয়েছিলাম। পড়াশোনা যে দায় নয়, তা যে কতখানি আনন্দের হয়ে উঠতে পারে তা ওখানেই প্রথম উপলব্ধি করেছিলাম। অরুণদা আমাদের দুবছরে পাঠক্রমের জন্য নির্দিষ্ট *সঙ্গীতচিন্তা* ও *লিপিকা* পড়াতেন। কথার পর কথার মালা গেঁথে তিনি বলে চলতেন অবলীলায়। যেমন স্বচ্ছন্দ ছিল ওঁর প্রকাশভঙ্গী তেমনই সহজ সাবলীল হয়ে উঠত বিষয়বস্তু। মন্ত্রমুগ্ধের মত আমরা ক্লাসে বসে শুনতাম ওঁর পড়ানো। মনে আছে পরীক্ষার প্রস্তুতিপর্বে ক্লাসে শোনা পাঠই সাহায্য করেছিল বেশি, রেফারেন্সের প্রয়োজন হয়নি। ক্লাসের সেই নির্দিষ্ট সময়সীমার বাইরে অরুণদাকে জানার সুযোগ আমার আর হয়নি। আসলে বিরাট কর্মযজ্ঞের হোতা অরুণদা, সাহিত্যের রাজপথের সর্বত্র তাঁর অবাধ বিচরণ। তাই সম্ভ্রমপূর্ণ দুরত্বের থেকেই ওঁকে দেখেছি।

অন্যদিকে, আনন্দের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ পড়তে আর জীবনে ও আচরণে রবীন্দ্রনাথকে প্রেরণা হিসেবে গ্রহণ করতে শিখিয়েছেন প্রণতিদি। ওঁর সঙ্গে দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এটা লক্ষ্য করেছি কখনও জোর করে ওঁর মতামত আমাদের উপর চাপিয়ে দেননি বা কখনও

শাসন করে তাঁর অনুবর্তীও হতে বলেননি। শুধু পড়াশোনা না করে 'সুর ভুলে যেই ঘুরে বেড়াই' তখনই তিনি আহত হন, ভর্ৎসনা করেন জোর খাটান আর নির্দিষ্ট কোনও কর্মধারার সঙ্গে আমাদের যুক্ত করতে সচেষ্ট হন। ওঁর মধ্যে অনায়াসে আমরা একজন শিক্ষক বন্ধু অভিভাবক এবং আমাদের সমস্যাপূর্ণ জীবনের একান্ত নির্ভরযোগ্য আপনজনকে খুঁজে পেয়েছি। আজ আমি এখানে এ কথা বলার সুযোগ পেলেও আমার দৃঢ় বিশ্বাস এখানে উপস্থিত ওঁর ছাত্রছাত্রীর অধিকাংশেরই এটি মনের কথা। সেদিনকার কথা মনে পড়ছে, যেদিন আমাদের পরমপ্রিয় জায়গাটি আমাদের জীবন থেকে নড়ে গিয়েছিল। উদ্‌ভ্রান্ত দিশেহারা আমরা। প্রণতিদি ওঁর প্রসারিত দু'বাহুর মধ্যে টেনে নিয়েছিলেন আমাদের, ওঁর সংযত স্তব্ধভাব আমাদের শক্তি যুগিয়েছিল, ওঁর বিচারচালিত আবেগ আমাদের অন্ধ আবেগকে সংযত করে প্রত্যেককে নিজস্ব কর্মপথে চলতে সাহায্য করেছিল। দীর্ঘদিন তাঁকে কতভাবে পেয়েছি। এই স্বল্পনির্দিষ্ট সময়ে তার কতটুকুই বা বলতে পারি। শুধু এইটুকু বলে আমার বক্তব্য শেষ করি, ছাত্রছাত্রীদের শ্রদ্ধা আর ভালোবাসার শিশিরবিন্দুর মধ্যে বিপুল কিরণে ভুবন আলো করা তপন যেন ধরা দিয়েছে।

পথ দেখালেন সোমেনদা

ভক্তি দেবী

সুধীজন যাঁরা রয়েছেন তাঁদের এবং শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক অরুণ বসু মশাইকে, আরও যাঁরা রয়েছেন এখানে সকলকেই আমার বিনম্র নমস্কার জানাচ্ছি। আর আমার সন্তানতুল্য যে ছেলেমেয়েরা এই সভার আয়োজন করেছে তাদের অনেক ধন্যবাদ, আশীর্বাদ জানাচ্ছি।

যে দিদিটাকে তারা এত ভালবাসে, সে আমার ছোট বোন। তাই তার সম্বন্ধে অন্যরা যত প্রশংসাই করুক, আমি তো কিছু বলতে পারি না। আমি বলছি শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক অরুণ বসু মশাইয়ের কিছু কথা। তাঁকে আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব কমই চিনি। কিন্তু আমার একটি অতি প্রিয়জন রবীন্দ্রভারতী থেকে এসে তাঁর যা কথা বলত, তাতে আমার তাঁর কিছু পরিচয় জানা আছে।

আমার ছোট বোন নিতান্ত অল্প বয়সে বাবা-মা হারিয়ে সে যখন একান্তই অসহায় এবং রুগ্ন ছিল তখন তাকে অনেক যত্নে অনেক ভালবাসায় বড় করে তুলেছিল; সে-ও একটা দিদি — মা'র প্রতিনিধি। ক্লাস নাইনে পড়ার সময় থেকে ওর চোখে কমপ্লেইন অনেক; বেচারার স্বাস্থ্য একেবারেই খারাপ ছিল। শুধু দিদিই ওকে শেষ পর্যন্ত দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেছে।

তারপরে এলেন সোমেন্দ্রনাথ বসু — আমাদের সকলের 'সোমেনদা'। তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন, ওর হাতখানি ধরলেন, ওকে পথ দেখালেন। সেই পথে চলেই ও একদিন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথকে যথার্থভাবে খুঁজে পেল। বোধহয় তাঁরই আশীর্বাদে মা সরস্বতীর কৃপাবিন্দুটি ঝরে পড়ল ওর মাথায়। আর সেই সঙ্গে পেল তোমাদের সকলের এত প্রাণোচ্ছল, এত আন্তরিক ভালবাসা।

রবীন্দ্রপ্রভাব ও প্রেরণা পারিবারিক সূত্রে পাওয়া

দীপ্তিময় বসু

মাননীয় সভাপতি,

মঞ্চে উপবিষ্ট অরুণ বসু সম্পর্কে আমার দাদা হন। আর প্রণতি মুখোপাধ্যায়, উপস্থিত সুধীবৃন্দ — এই অনুষ্ঠানে যাঁরা বক্তৃতা দিলেন, মূল্যায়ন করলেন, আমি সেইভাবে বলার জন্য প্রস্তুত নই। পারিবারিক সূত্রে নিজের দাদা সম্পর্কে বলাটা আমার পক্ষে একটু অস্বস্তিকর বলে মনে হয়েছে। যাই হোক, তবু যখন আপনারা এই মঞ্চে আমাকে উপস্থিত হতে অনুরোধ করেছেন, তখন দু'একটা কথা বলতে হয়।

আমাদের পারিবারিক সম্পর্কে দাদা, তাঁর যে রবীন্দ্রপ্রভাব ও প্রেরণা, তা আমার মা, আমার বাবার সূত্রে পাওয়া, যেখানে আমাদের পরিবারে একটা সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল ও আবহাওয়া ছিল, যার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ছিল অপরিসীম। সেই পরিবেশ থেকেই আমার দাদা অণুপ্রাণিত হয়েছেন এবং আমরা পরিবারের সকলেই, সেই পরিমণ্ডলে আলাদাভাবে রবীন্দ্রনাথের প্রতি টান অনুভব করতাম। এই প্রসঙ্গে এটুকুই বলা যেতে পারে, আর বিশেষ কিছু বলার নেই। এখানে অন্যান্যরা তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, মূল্যায়ন করেছেন। আজ এই সভায় আমার দাদাকে এবং রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা প্রণতি মুখোপাধ্যায়কেও প্রণাম জানাই। আর যাঁরা এত সুন্দর সভার আয়োজন করেছেন — টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীবৃন্দ এবং উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন ও নমস্কার জানিয়ে শেষ করছি।

অন্তরের সম্পর্ক, অবিমিশ্র আনন্দ

সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়

শ্রদ্ধেয় সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রদ্ধেয় অরুণকুমার বসু,
শ্রদ্ধেয়া প্রণতি মুখোপাধ্যায়, সমবেত সুধীবৃন্দ,

আজকে যে উপলক্ষে এই অনুষ্ঠান সেই উপলক্ষ দুটির সঙ্গে বাংলা আকাদেমির সম্পর্ক খুব নিবিড়। নজরুল পুরস্কার পেয়েছেন অধ্যাপক অরুণকুমার বসু, সেই পুরস্কার বাংলা আকাদেমি থেকেই দেওয়া হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাংলা আকাদেমির মাধ্যমেই সেই পুরস্কারটি দিয়েছেন এবং যে গ্রন্থটির জন্যে সেই গ্রন্থটিও বাংলা আকাদেমি কর্তৃক প্রকাশিত। আর শ্রদ্ধেয়া প্রণতি মুখোপাধ্যায়, তিনি রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছেন যে গ্রন্থটির জন্যে সেই গ্রন্থটিও বাংলা আকাদেমি কর্তৃক প্রকাশিত। আমাদের বিশেষ আনন্দ এই জন্যে যে এই দুজন গবেষক-গবেষিকা, যাঁরা সারস্বত সমাজে বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত, সেই দুজন আমাদের সঙ্গে, আকাদেমির সঙ্গে যুক্ত — এটা আমার অন্তরের সম্পর্কের কথা। আর ব্যক্তিগতভাবে প্রণতিদেবীকে আমি খুব বেশি যে জানি তা নয়; তাঁর বই প্রকাশ উপলক্ষেই কয়েকবার আলোচনা হয়েছে। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়টা মূলত তাঁর লেখার মধ্য দিয়েই। তাঁর লেখার মধ্যে যে তথ্য-অনুসন্ধিৎসা আছে, যে বিজ্ঞানমনস্কতা আছে এবং সর্বোপরি একটা সারস্বত মানসিকতা আছে — যার জন্যে দূর থেকে, বিশেষ আলাপ না থাকলেও, একটা বিশেষ শ্রদ্ধার আসনে তিনি বরাবরই ছিলেন।

আর অরুণকুমার বসু, তিনি প্রত্যক্ষত আমার মাস্টারমশাই - তাঁর কাছে পড়েছি। যখন প্রথম বঙ্গবাসী কলেজে পড়তে আসি তখন উনিও নবীন অধ্যাপক হয়ে এসেছেন। সেই সময়ে তাঁর কাছে রবীন্দ্রনাথের পাঠ নিতে গিয়ে একটা অবিমিশ্র আনন্দ পেয়েছিলাম। সেই থেকে অরুণবাবু আমাদের সঙ্গে — আমার সঙ্গে, আমার পরিবারের সঙ্গে, বিশেষভাবে জড়িয়ে আছেন। আর, মাস্টারমশাই সম্পর্কে কী বলব! ছাত্রের পক্ষে মূল্যায়ন করা খুব কঠিন। আমি শুধু এইটুকু বলতে পারি যে আমার যখনই কোনও সমস্যা দেখা দেয়, সঙ্কট দেখা দেয় — সঙ্কট মানে ব্যক্তিজীবনের অন্য কোনও সমস্যা নয় — পড়াশুনার ক্ষেত্রে, জানবার ক্ষেত্রে — তখন আমি নিশ্চিতভাবে যাঁকে ফোন করলেই সমাধান পাই তিনি হচ্ছেন অরুণকুমার বসু। এবং এটা আমি গর্বের সঙ্গে সর্বসমক্ষে বলে থাকি, বলতে পারি। বহু সময়ে আমি অন্যের কাছ থেকে যে বাহাদুরিটুকু পাই সেটা বস্তুত মাস্টারমশাইয়ের সৌজন্যে। কেউ হয়ত বেশি রাত্রে আমাকে ফোন করেছেন - অমুক কবিতাটার অমুক লাইনটা কী করে পাব। আরও বিচিত্র সব ফোন আসে এমন বিশিষ্ট লোকেদের কাছ থেকে যে তাঁকে তখন 'না' বলা যায় না। ... .এটা কোথায় আছে? উত্তরে আমি বললাম - ঠিক

আছে, পাঁচ মিনিট সময় আমাকে দিন, আমি বলে দিচ্ছি। স্যারকে ফোন করলাম। স্যার বলে দিলেন অমুক পাতার অমুক জায়গায় আছে, তুমি লিখে নাও। সঙ্গে সঙ্গে আমি জানিয়ে দিলাম এবং বাহাদুরিটুকু আমিই পেলাম। সাক্ষাৎ হলে তখন বলেছি - এই সাহায্যটা আমার মাস্টারমশাইয়ের; কিন্তু ফোনে তাৎক্ষণিকভাবে এই সুযোগটা ছাড়ি কেন! প্রায় মাসেই একবার-দুবার এই ধরনের ঘটনা ঘটে। স্যার যখন রবীন্দ্রভারতী থেকে অবসর নেন, আমি তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলাম অনুরোধ নিয়ে — 'স্যার, আপনি বাংলা আকাদেমিতে আসুন। আপনার জন্য একটা চেয়ার-টেবিল আমরা রেখে দেব। আপনি আমাদের কাজ করে দিন।' সেই থেকে আজ কয়েকবছর নিয়ম করে সপ্তাহে চার-পাঁচদিন উনি আসেন এবং আমি মাস্টারমশাইয়ের অতি ঘনিষ্ঠজন হয়ে গেছি। অন্য কোনও ব্যাপারে সাহায্য করতে পারি না, কিন্তু তিনি কী করবেন, কী করবেন না, বিশেষ করে লেখাপড়ার ক্ষেত্রে, আমাদের কীভাবে সাহায্য করবেন — আমি অনেক সময় শাসনও করি। আর উনি ছেলেমানুষের মত সেই শাসন মেনে নেন। এত লোকের সামনে বলছি বলে, আমি আশা করব, স্যার কাল থেকে অন্যরকম ব্যবহার করবেন না — একই রকম প্রশ্রয় তাঁর কাছে পাব। এটা অকপটে বলছি যে কোথাও হয়ত কিছু একটা বক্তৃতা করতে হবে, কোথায় তথ্য পাব, সময় নেই। স্যারকে বললাম। স্যার সঙ্গে সঙ্গে দশটা পয়েন্ট করে দিলেন, আমি গিয়ে সেটা ব্যবহার করে এলাম। এই যে একজন মানুষ, যাঁকে সবসময় বিশেষভাবে নির্ভর করা যায় — এ খুব সচরাচর ঘটে না। বিরল দুয়েকজন এমন মানুষ আছেন। রবীন্দ্রসাহিত্য অরুণ বসুর নখদর্পণে। বাংলা গানেরও তিনি একজন ভাণ্ডারি। এত বহুমুখী বিদ্যার আধার খুব কমই আছেন। ভাষাটাষা আটকে গেলে পবিত্রদাকে ফোন করি অথবা জ্যোতিভূষণ চাকীকে। এই রকম মানুষ আজকালকার দিনে ক্রমশ ফুরিয়ে আসছে। আমাদের সৌভাগ্য যে আমরা এখনও তাঁদের মধ্যে আছি, তাঁদের পেয়েছি, এবং যদি তাঁদের থেকে কিছু গ্রহণ করতে পারি তা হলে নিজেদের ধন্য মনে করব।

উদ্যোক্তাদের আমি আমার নমস্কার জানাচ্ছি।

আমি শ্রদ্ধাশীল

পবিত্র সরকার

শ্রদ্ধেয় সভাপতি শ্রীসোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক অরুণকুমার বসু, শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী প্রণতি মুখোপাধ্যায় এবং সমবেত সুধীবৃন্দ,

আমি বিশেষ করে উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই যে, সমস্ত বাঙালি সংস্কৃতি-ভাবুকদের হয়ে তাঁরা এই দুজন গুণী মানুষকে সংবর্ধনা দেওয়ার কথা ভেবেছেন। আমিও, সনতের মতোই, শ্রীমতী প্রণতি মুখোপাধ্যায়ের কাজের সঙ্গে যতটা পরিচিত, ব্যক্তি মানুষটির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ততটা সুযোগ হয়নি। কিন্তু তাঁর কাজের প্রতি আমি বরাবরই শ্রদ্ধাশীল। তাঁর অ্যান্ডরুজের উপর কাজ আমি দেখেছি। অত্যন্ত নিষ্ঠা নিয়ে, বিজ্ঞানমনস্কতা নিয়ে, কোনও রকম ভাষার পল্লবিত অভিযানের মধ্যে না গিয়ে, যে বিষয়গুলোকে ধরেন — এটা মনে রাখবেন, এই বিষয়গুলো নিয়ে সচরাচর সাধারণ গবেষকেরা কাজ করেন না। অ্যান্ডরুজের মতো একজন মানুষ, ক্ষিতিমোহন সেনের মতো একজন মানুষ, স্বতন্ত্র গোত্রের ভাবুক ও মনস্বীর জীবন ও কর্ম বড়ো রাজপথের গবেষণার বিষয় নয়। আমরা যারা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে চাই তারা হয়তো প্রথমে রবীন্দ্রনাথকে ধরি, না হয় বঙ্কিমচন্দ্রকে ধরি, না হয় শরৎচন্দ্রকে ধরি — অর্থাৎ বহু পাঠকের কাছে জনপ্রিয় মানুষদের ধরি। কিন্তু উনি প্রথম থেকেই একটু অন্য ধরনের মানুষদের বেছে নিয়েছেন। সত্যিকারের রবীন্দ্র-পরিমণ্ডলে যাঁদের কথা সবাই খুব নজর করে না, উনি তাঁদের বেছে নিয়েছেন এবং আমি সেই জন্যে আলাদা করে তাঁর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল। দ্বিজেন্দ্রনাথের বিষয়ে তাঁর বইটিও (অ্যান্ডরুজ রচিত গ্রন্থের অনুবাদ : *বড়দাদা*) আমাকে নানাভাবে শিক্ষিত করেছে। তাঁর এ সব কাজ শুধু রবীন্দ্রনাথের চালচিত্রটিকে স্পষ্ট করে তা নয়, আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসেরও অনেক শূন্য পূরণ করে। আমি তাঁকে অভিনন্দন জানাই, তাঁর সম্বন্ধে, তাঁর কাজের সম্বন্ধে আমার উচ্ছ্বাস এবং মুগ্ধতা প্রকাশ করি। কিন্তু সত্যিসত্যিই তাঁর সম্বন্ধে বেশি বলা আমার পক্ষে কঠিন।

আমার মাস্টারমশায়ের সম্বন্ধে কম বলা আবার আমার পক্ষে কঠিন। কারণ, আমি কত দিক দিয়ে বলব? তাঁর একটা পরিচয় হচ্ছে বাঙালির কাছে, গবেষকের কাছে ছাত্রছাত্রীদের কাছে একটা পরিচয়। আর একটা পরিচয় আমাদের বয়েস থেকে যাঁরা গানটান শুনছে, গণনাট্যের গান শুনছে তাঁদের কাছে। আমি তো সত্যিসত্যিই তাঁর ছাত্র হওয়ার অনেক আগে থেকে 'ভাস্কর বসু'কে চিনি। এবং ছেলেবেলার সব গান — 'অহল্যা কন্যার ঘুমঘুম কি ভাঙবে না', 'ভাঙা তরীর শুধু এ গান' — এই সমস্ত গান, বা 'সোনার হাতে সোনার কাঁকন কে আর অলংকার'। এই যে গানগুলো — আমরা

আগে শুনেছি 'ভাস্কর বসু'র — তখন চিনতাম না ভাস্কর বসুকে। তারপর বঙ্গবাসী কলেজে ছাত্র হয়ে এলাম। কলেজের ছাত্র আমি আগে হয়েছি, তার পরে অরুণদার। বোধহয় আমাদের পরীক্ষার মাস তিন-চার আগে অধ্যাপক হয়ে এলেন এবং অধ্যাপনা ও মমতার গুণে বশীকরণ করলেন। এসেই আমাদের, মন জয় করে নেওয়া যাকে বলে, সম্পূর্ণভাবে জয় করে নিলেন। আমরা তাঁর একেবারে নেওটা হয়ে গেলাম। ক্লাসে এবং ক্লাসের বাইরেও তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ তৈরি হল। যখন পড়া শেষ হয়ে গেল বঙ্গবাসী কলেজে তখন তাঁর বাড়িতে যেতাম। তখন আমি থাকতাম খড়গপুরে। খড়গপুর থেকে রোববার রোববার চলে আসতাম তাঁর কাছে পড়া বুঝে নিতে। তখন প্লেটে করে গরম শিঙাড়া চলে আসত। আর সিগারেটও খেতে বলতেন, সিগারেট ধরিয়ে দিতেন হাতে। খারাপ অভ্যেস — আমি ছেড়ে দিয়েছি অনেক দিন, আশা করি অরুণদাও ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু এই ঘটনা আমার জীবনটাকে এত ভাবে সমৃদ্ধ করেছে, তা বলা হয়তো একটু আত্মপ্রচারের মতো হয়ে যাবে। কিন্তু অরুণদার দান এত বেশি......। আমি বি.এ. পরীক্ষায় যা হোক একটা — ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে যাকে বলে 'প্রথম' হই। এমন কিছু নয়। কিন্তু এটা হতো না যদি অরুণদা আমাকে না শেখাতেন, একেবারে হাতে ধরে, যে পরীক্ষা কীভাবে ভালভাবে দেওয়া যায়, কীভাবে বুদ্ধি খাটাতে হয়, কীভাবে পরীক্ষককে না-বুঝতে দিতে হয় যে আমি কিছুই জানি না। কিন্তু আমি অনেক জানি — উত্তরে এটা বুঝিয়ে দিতে হয়। এই ব্যাপারটা অরুণদা আমাকে এত ভালভাবে শিখিয়েছিলেন, তার পর থেকে আমাকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয় নি। তাঁর নিজের তৈরি উত্তরগুলি আমি দেখতাম, তাতে ভাষার তির্যক ব্যবহারে, শব্দের অর্থপূর্ণ সংঘর্ষে — কীভাবে অনেক কথা অল্প কথায় বলা সম্ভব তা লক্ষ করে সচকিত হতাম। ওই ভাষা অনুকরণ করা অন্যদের পক্ষে সম্ভব না, ফলে আমি সে পথে যাইনি। কিন্তু দু একটি মন্তব্যে কীভাবে বিষয়ের অন্তর্দেশ আলোকিত করা যায় তা অরুণদার উত্তর থেকে শেখার চেষ্টা করেছি।

আমি একটা ঝুঁকি নিয়েছিলাম — স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে ইকনমিক্সে অনার্স ছেড়ে দিয়ে আমি বঙ্গবাসীতে এসে বাংলায় অনার্স নিয়েছিলাম। এই ঝুঁকি নেওয়ার জন্যে আমাকে যে পরে পরিতাপ করতে হয়নি এবং আত্মীয়স্বজনের কাছে গালাগাল খেতে হয়নি, এর মূলে অরুণদাই। তারপরে, খুব মজার মজার ঘটনা — সব বলা যাবে না। সেই রবীন্দ্র-শতবার্ষিকীর বছরে আমরা দুজনে মিলে একটা প্রোগ্রাম করলাম। এটা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের কথা আর গান দিয়ে তৈরি একটা অনুষ্ঠান — তাতে অরুণদা হারমোনিয়াম বাজাতেন, তার সঙ্গে আমি গান গাইতাম। পুরোটা অরুণদারই তৈরি। তাতেও ছিল তাঁর ভাষার সেই আশ্চর্য জাদু, যা শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে শুনত। নানা জায়গায় গিয়ে, একবার চন্দননগরে গিয়ে, আমাদের খড়গপুরে গিয়ে, তা ছাড়া কলকাতার নানা জায়গায় কতবার যে সে অনুষ্ঠান করেছি তার হিসেব নেই। সেটা খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। ভালো হত কি না আমি জানি না, কিন্তু অনুষ্ঠান হত।

তারপর কত চিঠি লিখেছি পরস্পরকে। অরুণদা যেখানেই বেড়াতে যেতেন সেখান থেকেই ইনল্যাণ্ড ভর্তি করে লিখতেন, তাতে আষ্টেপৃষ্ঠে ছড়িয়ে থাকত রবীন্দ্রনাথের গান আর কবিতার ছত্র। তা কি আমার দিনরাত্রিকে কম সমৃদ্ধ করেছে! মানুষটির আমার জীবনে খুব বড়ো একটা প্রভাব। আমার জীবনের প্রায় শতকরা পঁচাত্তর ভাগ উনিই গড়ে দিয়েছেন। না হলে এই জীবনটা — আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারতাম না। সব মানুষ সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় না। কিন্তু অরুণদা আলাদা। বঙ্গবাসী কলেজে অসাধারণ সব শিক্ষকরা ছিলেন, তবুও আমার জীবনে অরুণদার একটা খুব বড়ো ভূমিকা আছে। পরে যখন রবীন্দ্রভারতীতে অরুণদাকে পেলাম — শিক্ষক আমার সহকর্মী। আবার রবীন্দ্রভারতী থেকে চলে এলেন। এখন বাংলা আকাদেমিতে পেয়েছি। সেই স্নেহ, সেই পারিবারিক সম্পর্ক — বৌদি, অরুণদার সন্তানেরা — তারা কত বড়ো হয়ে গেছে যাদের এইটুকু দেখেছি। আমার বেশ লাগে। আমি কখনো কখনো ভাবি যে নিজের জীবনের কথা লিখব পরে। এতে আপনাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই, আমার অনেক সংকল্পের মতই এটা না-ও হতে পারে। কিন্তু অরুণদার মতো কতগুলো মানুষের কথা আমাকে বেশি করে লিখতে হবে।

দুজনেই সারস্বত সাধনায় নিবেদিতচিত্ত

মঞ্জুলা বসু

আজকে, প্রণতি মুখোপাধ্যায় ও অরুণ বসু - এই দুজন গুণী মানুষকে সংবর্ধনা জানাবার জন্যে যে সভার আয়োজন করা হয়েছে সেই সভাতে যোগদান করতে পেরে আমি বিশেষ আনন্দিত। এটা সত্যিই একটা coincidence যে টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের দুজন অধ্যাপক-অধ্যাপিকা একই বছরে দুটি মুখ্য পুরস্কার পেলেন যেটা বাংলার সাহিত্যসেবীদের মধ্যে প্রধান পুরস্কার বলা যেতে পারে - একটা রবীন্দ্র পুরস্কার এবং একটা নজরুল পুরস্কার। আমার আনন্দ আরও এইজন্যে যে আমরা এই দুজনকে টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটে এই আমাদের গত সমাবর্তনেই বিশেষভাবে সম্মানিত করার সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়েছি। আমরা অধ্যাপক অরুণ বসুকে *রবীন্দ্রতত্ত্বাচার্য* উপাধি প্রদান করেছি যেটা আমাদের ইনস্টিটিউটের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান এবং প্রণতি মুখোপাধ্যায়কে আমরা *দেবজ্যোতি দত্তমজুমদার পুরস্কার* প্রদান করেছি যেটা আমাদের পুরস্কারগুলির মধ্যে একটা মুখ্য পুরস্কার বা যেটা সর্বপ্রধান পুরস্কার। সুতরাং আবার তাঁদের এর চেয়েও বড় পুরস্কার পাওয়ার উপলক্ষ নিয়ে যে এইখানে সকলে সমবেত হয়েছেন এবং এর জন্যে একটা আয়োজন করা হয়েছে তাতে আমিও যে উপস্থিত থাকতে পেরেছি — এর জন্যে আমার আনন্দের শেষ নেই। আমার আনন্দের আরও শেষ নেই এইজন্যে যে এঁদের দুজনকেই আমি বহুদিন ধরে জানি। বস্তুত, আমি এঁদের যতদিন ধরে জানি, ততদিন ধরে এখানে বোধহয় অনেকেই জানেন না। এঁদের মধ্যে বেশি ব্যক্তিগত যোগাযোগ আমার প্রণতির সঙ্গেই, আর অরুণবাবুকে আমি ব্যক্তিগতভাবে ঠিক অত ঘনিষ্ঠভাবে পাইনি, কিন্তু ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক তিনি বহুদিনের। যখন প্রণতি ইনস্টিটিউটে ছাত্রী হিসেবে যোগ দিয়েছিল তখনও অরুণবাবু সেখানে অধ্যাপক ছিলেন। আমার মনে আছে, ইনস্টিটিউটের প্রথম দিকে, যখন এই প্রতিষ্ঠানটির ভবিষ্যৎ কী হবে, সত্যিসত্যি রবীন্দ্রনাথ লোকে পড়বে কিনা, পড়িয়েই বা কী হবে, ক'জন ছাত্রছাত্রী আসবে এই নিয়ে নানা সংশয় ছিল এবং প্রতিষ্ঠানটি আদৌ দাঁড়াতে পারবে কিনা — তার অর্থসম্বল নেই এবং শুধুই রবীন্দ্রনাথ পড়ার জন্যে যে একটা পাঠক্রম চালু করা — এটা অনেকের কাছেই একটা অসম্ভব ব্যাপার বলে মনে হয়েছিল। সেই সংশয়ের দিনগুলোতে যাঁরা এগিয়ে এসে এই প্রতিষ্ঠানে পাঠক্রম চালু রাখবার কাজে তাঁদের স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে একে গড়ে তুলেছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রথম সারিতে আছেন অরুণবাবু। এবং অরুণবাবু যে প্রথম থেকেই আছেন তার একটা প্রমাণ হচ্ছে যে — সকলেই জানেন টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট এক সময় এলগিন রোডে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মশায়ের গৃহে স্থাপিত হয়েছিল। সেখানে, সেই এলগিন রোডের সময় থেকেই অরুণবাবু সেখেন পড়াচ্ছেন।

একবার এরকম একটি ঘটনা ঘটেছিল যে — ইনস্টিটিউটের ক্লাসে যে ছেলেমেয়েরা পড়ত তাদের সৌম্যেনবাবু ডেকে ডেকে জিজ্ঞেস করতেন — কে পড়াচ্ছেন, কিরকম পড়াচ্ছেন। তা, একদিন জিজ্ঞেস করেছেন একটি মেয়েকে যে কে কে পড়াচ্ছেন। তাতে সেই মেয়েটি বলেছে যে অরুণ বসু পড়াচ্ছেন — এঁরা-এঁরা পড়াচ্ছেন, তার মধ্যে অরুণ বসুও পড়াচ্ছেন।

সৌম্যেনবাবু শুনে বললেন, 'অরুণ বসু! সে আবার কে?'

তা, তাইতে সেই মেয়েটি তখন খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছিল, কারণ তারা সবাই অরুণবাবুর মুগ্ধ ছাত্রী ছিল। আর আজকে রবীন্দ্রচর্চার ক্ষেত্রে 'অরুণকুমার বসু, সে আবার কে' — এ কথা বলার ধৃষ্টতা বোধহয় আর কারও হবে না। কারণ, অরুণবাবু নিজের যোগ্যতার যথেষ্ট প্রমাণ দিয়েছেন এবং সেই তখন থেকে এই এখনও, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের এই সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ বছর হয়ে গেল — এখনও অরুণবাবুর পড়ানোর জন্যে ছাত্রছাত্রীরা সমান উৎকণ্ঠ আগ্রহে প্রতীক্ষা করে।

আর, প্রণতিকে আমি দেখেছি যখন প্রণতির বয়স অনেক কম, যখন প্রণতি আজকের প্রণতি মুখোপাধ্যায় হয়নি। প্রণতি এসছিল ইনস্টিটিউটের ছাত্রী হিসেবে, খুবই সকুণ্ঠ সলজ্জ ছিল তার আচরণ। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই প্রণতি শিক্ষকদের সকলের মন জয় করে নিয়েছিল তার নিষ্ঠা তার একাগ্রতা ও তার সাহিত্যানুরাগ এবং ক্রমশ যেটা প্রকাশ পেয়েছে — তার ভাষার উপরে দখল, তার লেখা ইত্যাদি দিয়ে। সত্যি কথা বলতে কি, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটে যত ছাত্রছাত্রী এ যাবৎ এসেছে সকলে একই শিক্ষক-শিক্ষিকার কাছে পড়াশুনো করেছে। কিন্তু প্রণতির মত দু'হাত ভরে এই শিক্ষার দান আর দ্বিতীয় কোনও ছাত্রছাত্রী নিতে পারে নি — এ কথা আমি অকুণ্ঠভাবে বলতে পারি। এই যে নেওয়া এটা সম্পূর্ণ প্রণতির নিজের গুণে। সেইজন্যে আজকে প্রণতি যে জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে, সেই জায়গা প্রণতিই নিতে পারে; টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের অন্য কোনও ছাত্রছাত্রী আজ পর্যন্ত নিতে পারল না। প্রণতিকে আমি এই জন্য অভিনন্দন জানাই এবং এ-কারণেও যে সে সোমেন্দ্রনাথ বসুর শিক্ষা সমস্ত হৃদয় দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে গ্রহণ করেছে সেইজন্যে সে নিজেও সমৃদ্ধ হয়েছে এবং সোমেন্দ্রনাথের শিক্ষার যথার্থ মূল্য দিয়েছে।

আমি আশা করি, অরুণবাবু এবং প্রণতি মুখোপাধ্যায় — এঁরা দুজনেই সাহিত্য এবং সারস্বত সাধনায় আগের মতই নিবেদিতচিত্ত হয়ে নিযুক্ত থাকবেন এবং তাঁরা বাংলা সাহিত্য, বাংলা সংস্কৃতি এবং রবীন্দ্রচর্চাকে উত্তরোত্তর আরও সমৃদ্ধ করবেন। তাঁদের শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

আমরা একই তরণীর যাত্রী

প্রফুল্ল চক্রবর্তী

শ্রদ্ধেয় সভাপতি, শ্রদ্ধেয় শ্রী অরুণকুমার বসু, শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী প্রণতি মুখোপাধ্যায় এবং উপস্থিত সাহিত্যরসিকবৃন্দ,

আমাকে যখন বলা হয়েছিল যে অরুণকুমার বসু ও প্রণতি মুখোপাধ্যায়কে সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে, তাঁদের ছাত্রছাত্রীরা দিচ্ছেন, তখন আমি বলেছিলাম — হ্যাঁ, নিশ্চয়ই যাব। তবে কিছু বলার ব্যাপারে মনস্থির করে উঠতে পারিনি। যাই হোক, আমি অরুণকুমার বসু এবং প্রণতি মুখোপাধ্যায়ের জন্যে যে ছোট্ট দুটি ফুলের স্তবক নিয়ে এসেছি — প্রথমে তা তাঁদের দিয়ে, পরে কিছু বলার চেষ্টা করছি।........

সংস্কৃতির জগতে বাস করছি, সুতরাং, এঁরা দুজন আমার পরম বন্ধু। বন্ধু এই অর্থে বলছি যে উপনিষদের কাছে একটা শিক্ষা পেয়েছিলাম : ওঁ সহ নাববতু সহ নৌ ভুনক্তু.....ইত্যাদি। অর্থাৎ ব্রহ্ম আমাদের উভয়কে সমভাবে রক্ষা করুন ও উভয়কে তুল্যভাবে বিদ্যাফল দান করুন .... ইত্যাদি। অর্থাৎ গুরুশিষ্য বা সতীর্থরা সবাই একই পথের যাত্রী, একই গন্তব্যের অভিমুখী, সেই অর্থে বন্ধু। একটি নৌকোয় করে আমরা কোথাও যাচ্ছি। একজন মাঝি, বাকি সবাই যাত্রী। কিন্তু সকলে আমরা একই গন্তব্যে যাচ্ছি। অরুণকুমার বসু এবং প্রণতি মুখোপাধ্যায় চালক হিসেবে বা সহযাত্রী হিসেবে অপেক্ষাকৃত অগ্রসর, সংস্কৃতিক্ষেত্রে উভয়েরই অনেক বেশি অবদান আছে। সেই ক্ষেত্রে আমিও এঁদের সঙ্গে অনুগামী বা সহযাত্রী হিসেবে কিছু দিতে চেষ্টা করে থাকি। এবং সেদিক থেকে আমি একটা সতীর্থসুলভ আত্মীয়তা অনুভব করে থাকি। যেন একই নৌকোয় আমরা সবাই যাচ্ছি, একই গন্তব্যে। ব্রহ্ম আমাদের তুল্যভাবে বিদ্যাফল দান করুন।

আমি যখন বঙ্গবাসী কলেজে পড়ছিলাম তখন প্রথম অরুণবাবুকে দেখি। উনি তখন তরুণ অধ্যাপক। অবশ্য আমি তাঁর প্রত্যক্ষ ছাত্র ছিলাম না। জগদীশ ভট্টাচার্য মশাই আমাদের অধ্যাপক ছিলেন। পরে জগদীশবাবুর একটি গ্রন্থের ভূমিকায় দেখলাম যে, 'রবীন্দ্রসংগীতের ব্যাপারে অরুণ আমার চোখের মণি'। এই কথাটির সূত্র ধরে আমি মাঝে মাঝে গর্বিতভাবে বলি — আমরা দুজন একই গুরুর চেলা, সেই আমাদের একটিমাত্র সুখ। অরুণবাবু জগদীশবাবুর প্রিয়তম ছাত্র ছিলেন।

বঙ্গবাসীতে যখন পড়তাম তখন আমি রবীন্দ্রসংগীতের জগতে গভীরভাবে প্রবেশ করি নি। তখন গণনাট্যের গান এবং আধুনিক বাংলা গানই গাইতাম। সুতরাং 'ভাস্কর বসু'

নামটা খুবই পরিচিত ছিল। তাই এই তরুণ অধ্যাপক আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন। আজ প্রবীণ বয়সে যখন বেলেঘাটায় বসত করেছি তখন একটা কথা মাঝেমধ্যেই বলি — আমরা দুজন একই পাড়ার লোক, সেই আমাদের একটিমাত্র সুখ। অবশ্য আমি আসবার আগেই উনি বেলেঘাটা ছেড়ে চলে এসেছেন। তবু যোগাযোগের ক্ষেত্র একটা আছে। সেটা স্থানগত না হলেও মানসিক নৈকট্যে নিবিড়।

আমার সব গুরুদেরই আমি দাদা বলে সম্বোধন করেছি। তিনি আমার প্রত্যক্ষ গুরু না হলেও জ্ঞানের কল্পতরু হিসেবে অনেক কিছুই দান করেন বলে ওঁকে আমরা গুরু বলেই মনে হয়। তাই অরুণদা বলেই সম্বোধন করে থাকি।

অরুণদার সঙ্গে আমার পেশাগতভাবে প্রথম পরিচয় হয় আমার রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা কালে। তারপরে কলকাতায়। ইতিপূর্বে টেগোর রিসার্চ ইনস্টিট্যুট থেকে আমাকে একটা পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। পরে জানলাম এঁর পিছনে ওঁরও 'ষড়যন্ত্র' ছিল। আমি রাঁচিতে বসে কী রবীন্দ্রচর্চা করেছি সেই খবর তিনি রাখতেন। অতি বড় সংস্কৃতিসন্ধানী না হলে এই জিনিসটি হয় না।

দীর্ঘদিন পরবাসী ছিলাম। কলকাতায় ফিরে প্রায় অপরিচিত আগন্তুক। এখানে এসে অনেক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও যে সামান্য পরিচিতি আমার হয়েছে তার মূলে অরুণদার স্নেহনিষেক কম নয়। কলকাতায় এসে ওঁর সঙ্গে আমার যে গভীর সম্পর্ক তার কারণ, এক তো আমরা দুজন একই সংঘে আছি — সে সংঘটি টেগোর রিসার্চ ইনস্টিট্যুট। দ্বিতীয়ত, সংগীত সম্পর্কিত অন্বেষণে তিনি আমার অগ্রজ। আমি গান করি। গানের কথা ও সুর সম্পর্কে অনেক সংশয়ের মুহূর্তে অরুণদা আলো দেখান। আমি গান শেখাই। ছাত্রদের নানা জিজ্ঞাসার উত্তর দেবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। এক ছাত্রের জিজ্ঞাসা ছিল 'নীলাঞ্জন' কেন? অঞ্জন যদি কাজল হয় তবে সে তো কালো — নীল কেন বলা হয়েছে? আমি আমার জ্ঞান ও অভিধান মত উত্তর দিয়েছি। শিক্ষক হলেও সব ব্যাপারে একেবারে চরম উত্তর হাতের কাছে সর্বদা থাকে না। পরে আমি অরুণদাকে জিজ্ঞাসা করে আরও কিছু জ্ঞান পেলাম এবং খুব খুশি হলাম। কিন্তু তার পরদিন অরুণদাই আমাকে টেলিফোন করলেন। বললেন — 'সে দিন হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস হাতের কাছে ছিলেন না। আয়ুর্বেদে ছ'রকমের কাজল আছে' — বলে সব বৃত্তান্ত বললেন। আমি তো অবাক! এ কারণে নয় যে কথাটি নতুন শুনলাম। অবাক এ কারণে যে জানার জন্য আমার যত আগ্রহ, জানানোর জন্য আগ্রহ অরুণদার ততোধিক। এ না হলে আর শিক্ষক! আমি জীবনে বহু গুণীর কাছে গান শিখেছি। শৈলজারঞ্জন মজুমদারের কাছেও কিছুদিন গান শিখেছি। এ রকম গুরু আমি জীবনে আর পাইনি। পড়াশুনা, গান, ব্যায়াম প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের গুরুদেরই আমি পেয়েছি। কিন্তু এরকম কেউ ছিলেন না যে শিখবার জন্যে আমার যে আগ্রহ

শেখাবার জন্যে তাঁর আগ্রহ তার চেয়ে বেশি। পিছনে পিছনে যেন ছুটতেন — 'এই তোমাকে যে ওই কলিটা শিখিয়েছিলাম, ওটা আবার একটু শুনাও তো'।' না শিখিয়ে ছাড়তেন না। অরুণদাও এরকমই। যারা গবেষণা করে তাদের তিনি উৎসাহিত করেন। তাদের উৎসাহে কোনো ফাঁকি থাকলে তিনি নতুন উদ্যমে প্রণোদিত করেন। তখন মনে হয় — না, আমি ফাঁকি দেবো না। এখানে ছাত্ররা তাঁদের শিক্ষককে সংবর্ধনা দিচ্ছেন। আমি তাঁর ছাত্র হতে পারলাম না — এটা আমার দুঃখ। পরজন্মে বিশ্বাস নেই। যদি পরজন্ম বলে কিছু থাকে তবে অরুণদাকে বলে রাখছি — রেজিস্টারে আমার নামটা লিখে রাখবেন।

এবার প্রণতি মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে কিছু বলার চেষ্টা করছি। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ পরিচয় আমার বিশেষ নেই। উনি যখন টেগোর রিসার্চ ইনস্টিট্যুট-এর সম্পাদক ছিলেন তখন ওখানে আমার একটা বক্তৃতা হয়েছিল — সংগীতবিষয়ক। সেই প্রথম আলাপ। তারপর জামশেদপুরে। আমি জামশেদপুরে আসতাম রাঁচি থেকে। এই টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটুটের একটা সাহিত্যের পাঠক্রম ছিল ওখানে। তাতে একটা বই পড়াতে আসতাম — *সংগীতচিন্তা*। আর কলকাতা থেকে প্রণতি মুখোপাধ্যায় যেতেন অন্যান্য বই পড়াতে। ওঁর সঙ্গে সেখানে বোধ হয় একদিনই আলাপ হয়েছিল। সেদিন একটা জিনিস দেখেছিলাম ওঁর চরিত্রে — যেটা কলকাতার রবীন্দ্রচর্চাভবনে দেখেছিলাম — 'রবীন্দ্রচর্চা আমাদের জীবনচর্চা' — এই জিনিসটি। উনি যে সব ছাত্রদের পড়াতেন তারা আমারও ছাত্র ছিল — দুদিক থেকে। অনেকে ছিল আমার গানের ছাত্র, অনেকে আবার ছিল সাহিত্যের ছাত্র। ওদের সঙ্গে আমার আজও যোগাযোগ আছে। ওদের মুখেই প্রণতি মুখোপাধ্যায়ের অনর্গল প্রশংসা শুনতাম। এই শান্তশিষ্ট মানুষটিকে দেখে আমার সত্যই মনে হচ্ছে রবীন্দ্রচর্চা জীবনের সঙ্গে মিশিয়ে নেওয়া — যেটা আমি ততটা পারিনি, উনি কিন্তু সে কাজে সম্পূর্ণত সফল। আজ কিছুক্ষণ আগেই তাঁকে বলছিলাম — আপনি একটু এগিয়ে আসুন, বড়ই আড়ালে থাকেন। আড়ালে গিয়ে কাজ করছেন নিশ্চয়ই, কিন্তু আর একটু সামনাসামনি এলে ছাত্ররা উপকৃত হত।

আমরা জানি, চৈতন্যদেব সম্বন্ধে যেমন অনেক গ্রন্থ রচনা হয়েছে, তাঁর পরিকরদের সম্পর্কেও তেমনি হয়েছে। অন্যথায় চৈতন্যদেব সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অপূর্ণ থাকত। রবীন্দ্রনাথকে তাঁর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে, তাঁর বিরাট কর্মকাণ্ডে এবং আরও নানা ভাবে আমরা দেখতে পাই। তাঁর সঙ্গে যাঁরা এই সব ক্ষেত্রে জড়িত ছিলেন তাঁদের জীবন ও কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা না করলে রবীন্দ্রনাথকে দেখা অপূর্ণ থাকবে। এন্ডরুজ, পিয়র্সন, ক্ষিতিমোহন সেন প্রমুখের আবেদনকে তাই অবজ্ঞা করা চলে না। এই সব নিবেদিতপ্রাণ রবীন্দ্র-পরিকরেরা না থাকলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিরাট পরিধি নিয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে পারতেন না বলে মনে করি। সমগ্র সম্পূর্ণ রবীন্দ্রনাথ এঁদের বাদ দিয়ে অকল্পনীয়। তাই এঁদের জীবন ও সাধনা গবেষণার বিষয় হওয়া উচিত। সমগ্র রবীন্দ্র-প্রভাবিত যুগকে জানতে হলে এ সব আলোকস্তম্ভগুলিকেও জানা দরকার।

এই সব রবীন্দ্র-পরিকরদের নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন তাঁদের কাজ তাৎক্ষণিক পুরস্কার হয়তো পায় না। রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রের সাহিত্য কাব্য উপন্যাস নিয়ে যে সব গ্রন্থ রচিত হয় সে সব রচনার বিষয় স্বতঃই পাঠকদের আকৃষ্ট করে। *রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ-র* লেখক প্রমথনাথ বিশী গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন,'.......পাঠক বিষয়ের গৌরবে বইখানা একবার দেখিবেন বলিয়া মনে হয়। ....মাঝে মাঝে সুদীর্ঘ উদ্ধৃতি আছে, আর কিছু না হোক রবীন্দ্রসাহিত্যের নমুনা তো পড়া হইবে।' কিন্তু পিয়র্সন বা এন্ডরুজ সম্পর্কিত গবেষণাগ্রন্থের মধ্যে সে ধরণের আকর্ষণ না থাকাই স্বাভাবিক। তবু সে ঝুঁকি নিয়েও কেউ কেউ কাজ করে যাচ্ছেন। প্রণতি মুখোপাধ্যায় তাঁদের অন্যতম। তাই তিনি আমাদের কাছে নমস্য। তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ কম। তবে, We are on the same boat — আশা করি যোগাযোগ বাড়বে এবং নানা ভাবেই উপকৃত হব।

অরুণদা এবং প্রণতি মুখোপাধ্যায় — উভয়েই আমার কাছে এবং তাঁদের ছাত্রদের কাছে অনুকরণযোগ্য আদর্শ হয়ে আছেন। ছাত্রজীবনে ডিবেট করতাম — Art for Art's sake না Art for Life's sake? এঁদের দুজনের সংস্পর্শে এসে Oscar Wilde-এর ভাষায় বলতে ইচ্ছে করে — Life for Art's sake।

ধন্যবাদ।

প্রণতি মুখোপাধ্যায়

তপোব্রত ঘোষ

একাদশ শতাব্দীর রসবাদী আচার্য মম্মটভট্ট দেবতা সম্পর্কে রতিভাবকে বলেছিলেন 'ভাবরতি'। ষোড়শ শতাব্দীতে কবিকর্ণপূর পরমানন্দ সেন দেবতার সঙ্গে গুরুজনকেও সংযুক্ত করে ভাবরতির সীমাকে স্বর্গ থেকে সম্প্রসারিত করলেন মর্তে। আমরা যেমন দেবতাকে ভালোবাসি তেমনি গুরুকেও ভালোবাসি। এই গুরুজনবিষয়া রতিই 'ভাবরতি'। গুরুকে এই ভালোবাসার সঙ্গে মিশে থাকে গুরুর প্রতি সমীহ, সম্ভ্রম আর ভয় — যাকে বলে reverential fear। কিন্তু ভয়টা থাকলেও ভয়ের সঙ্গে এই ভালোবাসাটাও থাকে বলেই গুরুর সান্নিধ্যে এসে কখন যেন নিজের অগোচরেই নিজেকে অতিক্রম করে যাওয়া, আর তারপর নিজের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে বলা :

আমি যে হয়েছি আমি / এ বড়ো বিস্ময়।

১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রণতি মুখোপাধ্যায়ের *উইলিয়ম উইনস্ট্যানলি পিয়র্সন* বইটি প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণে পিয়র্সনের আত্মসমর্পণের মহত্ত্ব বোঝাতে গিয়ে রবীন্দ্রবিদ্যায় প্রণতির শিক্ষক সোমেন্দ্রনাথ বসু এই বইয়ের ভূমিকায় লেখেন,

> রামমোহনের পুণ্যজীবনে আকৃষ্ট হয়েছিলেন অ্যাডাম, মিস্ কলেট ও মেরী কার্পেন্টার, বিবেকানন্দের আহ্বানে অগ্নিশিখা হয়ে জ্বলে উঠেছিলেন নিবেদিতা, গান্ধীজীর আত্মদহনের মন্ত্রে নিজেকে শুদ্ধ করেছিলেন মীরা বেন, অরবিন্দের লোকোত্তর সাধনা মীরা রিশারকে জননীর পূর্ণতায় উত্তীর্ণ করল।

প্রণতি জন্মেছিলেন *বসুমতী* পরিবারে। তাঁর পিতামহ উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সাপ্তাহিক ও দৈনিক *বসুমতী* পত্রিকার প্রবর্তক এবং *বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরের* প্রতিষ্ঠাতা। মতাদর্শের দিক দিয়ে *বসুমতী* আদৌ রবীন্দ্রানুরাগী পত্রিকা ছিল না, বরং রবীন্দ্রবিরোধী সাহিত্য পত্রিকার সঙ্গে এর যোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। সেদিক দিয়ে দেখলে টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের প্রথম বছরের ঈষৎ-বিলম্বিত ছাত্রী হিসেবে ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে প্রণতির রবীন্দ্রনাথ পড়তে আসাটা আকস্মিক, কিন্তু দু'বছরের কোর্স করতে এসে একেবারে ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দের গোড়া পর্যন্ত প্রায় চব্বিশ বছর ধরে ইনস্টিটিউটের কাজে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিলিয়ে দেওয়াটা অভাবিত। 'সম্পূর্ণভাবে বিলিয়ে দেওয়া' — কথাটা ভাষার একটা অলঙ্কারমাত্র নয়। রামমোহন কলেজে প্রণতি দর্শনের অধ্যাপনা করতেন; নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিলিয়ে দেবেন বলেই ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দে চাকরিতে ইস্তফা দেন।

'শিক্ষক সোমেন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে প্রণতি লিখেছেন :

> দর্শনের ছাত্রী ছিলুম। কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাল শিক্ষক যে পাইনি এমন নয়, কিন্তু এমন কোনো শিক্ষক পাইনি যিনি স্থায়ী প্রভাব রেখে গেছেন মনে।...... সোমেনদাকে শিক্ষক পেয়ে কী হলে জীবনে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক পাওয়ার গৌরব করা যায় তা বুঝতে পেরেছিলুম। একটানা উনিশ বছর (১৯৬৬-১৯৮৫) এই অসামান্য শিক্ষকের নিত্যসাহচর্য পেয়ে ধন্য

মনে করেছি নিজেকে এবং সেই দুর্লভ সৌভাগ্য সম্বন্ধে অচেতনও ছিলুম না। — তাঁর দান দুই হাতের অঞ্জলিপুটে কতটুকু বা ধরতে পেরেছি, উপচে পড়ে গেল কত। কিন্তু তবু বলব, শুধু পাইনি, দিয়েছিও। রবীন্দ্রনাথ পড়ার আনন্দকে তিনি ছাত্রছাত্রীর মনে সঞ্চারিত করে দিতে পেরেছিলেন এই তাঁর সবচেয়ে বড় পাওয়া।

এই প্রসঙ্গে সোমেন্দ্রনাথের মুখে কতবার শোনা *বলাকা*-র একটি কবিতাকে প্রণতি স্মরণ করেছেন। *সবুজপত্রে* কবিতাটির নাম ছিল 'তুমি-আমি':

যেদিন তুমি আপনি ছিলে একা
আপনাকে তো হয় নি তোমার দেখা
সেদিন কোথাও কারো লাগি ছিল না পথ-চাওয়া,
এ পার হতে ও পার বেয়ে
বয় নি ধেয়ে
কাঁদন-ভরা বাঁধনছেঁড়া হাওয়া।
আমি এলেম ভাঙল তোমার ঘুম,
শূন্যে শূন্যে ফুলটা আলোর আনন্দকুসুম।

এই কবিতাটি উদ্ধৃত করবার পর প্রণতি একটি আশ্চর্য বাক্য রচনা করেছেন। বলেছেন:

যে কথাটা অনেক বড়ো পটভূমিতে স্থাপন করে বুঝতে হয়, সোমেনদার মনের পটভূমিতে স্থাপন করে সে কথাটা নিজের মনেই দেখছি বারবার।

সোমেন্দ্রনাথই যে তাঁকে দিয়েছেন — এ কথাটা আধখানা কথা। সোমেন্দ্রনাথকে নিজের মধ্যে প্রতিফলিত করে সেই প্রতিফলনের মধ্যে সোমেন্দ্রনাথের আত্ম-সাক্ষাৎকার ঘটিয়েছেন — এই কথাটা হল বাকি আধখানা। নিশ্চয় এই পুরো কথাটাই শিক্ষকের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীর সম্পর্কের একটি নির্বিশেষ সাধারণ সত্য। কিন্তু সেই নির্বিশেষকেই প্রণতি তুমি-আমির বিশেষত্বের মধ্যে একান্তভাবে উপলব্ধি করেছেন। আর সেইজন্যই আমি এই উপলব্ধিকে বলেছি 'ভাবরতি'।

১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে চার্লস ফ্রিয়ার অ্যান্ডরুজের একটি রচনার অনুবাদ, ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে *রবীন্দ্রগ্রন্থ কালানুক্রমিক সূচী* এবং ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দে ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের ছোট *পিয়র্সন* বইটি বাদ দিলে এখনও পর্যন্ত প্রণতির প্রধান কাজ তিনটি : ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে *শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম*, ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে *উইলিয়াম উইনস্ট্যানলি পিয়র্সন* এবং ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে *ক্ষিতিমোহন সেন ও অর্ধশতাব্দীর শান্তিনিকেতন*। লক্ষ করবার বিষয়, এই তিনটি প্রধান বইয়ের শুধু প্রথমটিতেই নয়, বাকি দুটিতেও শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয় আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিন্ন ভিন্ন যুগ ধরা পড়েছে। প্রথমটি ১৯০১ থেকে ১৯০৩, দ্বিতীয়টি ১৯১৪ থেকে ১৯১৫ আর ১৯২১ থেকে ১৯২২, আর তৃতীয়টি একেবারে ১৯০৮ থেকে ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। প্রথমটিতে রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে যাঁরা শান্তিনিকেতনে পড়াতে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে যেমন ব্রহ্মবান্ধব কিংবা জগদানন্দের মতো বাঙালিরা রয়েছেন তেমনি রেবাচাঁদের মতো অবাঙালিও আছেন; দ্বিতীয়টিতে এসেছেন পাশ্চাত্যের পিয়র্সন,

আর তৃতীয়টিতে এসেছেন অত্যন্ত প্রাচ্য ক্ষিতিমোহন। টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের মুক্তসত্রে প্রণতি নিঃস্বার্থভাবে আত্মনিবেদন করতে পেরেছিলেন বলেই শান্তিনিকেতনের মুক্তসত্রে ওইসব শিক্ষকদের নিঃস্বার্থ আত্মনিবেদনকে তিনি এত বড়ো করে বারবার দেখতে চেয়েছেন কি না তা বলা শক্ত। তবে যে-সোমেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের মানুষের ধর্ম আর আন্তর্জাতিকতাবাদে দীক্ষিত, কিন্তু যিনি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে স্টাইলিস্টিক্‌সের বাড়াবাড়ি পছন্দ করেন না, যিনি রবীন্দ্রচর্চায় লালিত্যের আতিশয্যকে বর্জন করে সূর্যসনাথ রবীন্দ্রনাথকে পুনরুদ্ধার করতে চান — তাঁর প্রভাব যে প্রত্যক্ষভাবে ও পরোক্ষভাবে প্রণতির এই বিষয়-নির্বাচনকে নিয়ন্ত্রিত করেছে সে বিষয় সন্দেহের অবকাশ কম।

১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ জুলাই সোমেন্দ্রনাথ প্রয়াত হলেন। ওই বছরেরই বর্ষারম্ভদিনে টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট থেকে প্রণতির সম্পাদিত শেষ বই *দিনেন্দ্র শতবার্ষিকী গ্রন্থ* প্রকাশিত হল। এই বইয়ের অন্তিম প্রবন্ধটির নাম 'দিনেন্দ্রনাথের শেষ কটি দিন'। অমিতা ঠাকুর লিখলেন, কোন্ অভিমানে দিনেন্দ্রনাথকে শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল। ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দে টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের মাসিক মুখপত্র *রবীন্দ্রভাবনা*-র যুগ্ম জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি সংখ্যাটি প্রণতি শেষবারের মত সম্পাদনা করলেন। এই সংখ্যাটির প্রথমেই রয়েছে টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের পঁচিশ বছরের খতিয়ান! প্রণতি লিখলেন, সোমেন্দ্রনাথহীন ইনস্টিটিউটে 'বোধ করি আর একটা নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছে।' এর বছরখানেক পরে, ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দের গোড়ার দিকে প্রণতি ইনস্টিটিউট থেকে সরে গেলেন।

সরে গেলেন, কিন্তু ফুরিয়ে গেলেন না। ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে প্রণতি লিখতে শুরু করলেন ক্ষিতিমোহন সেন ও অর্ধশতাব্দীর শান্তিনিকেতন। ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে এই বইটি প্রকাশিত হল আর রবীন্দ্রপুরস্কারে সম্মানিত হল এ বছর। আমি জানি, প্রণতিদি পুরস্কারকে বিশেষ পাত্তা দেন না। সমস্ত পুরস্কারেই পলিটিক্‌স্ থাকে — ভালোর দিকেও থাকে, মন্দের দিকেও থাকে। বিশেযত অমর্ত্য সেনের মাতামহ বলেই যে ক্ষিতিমোহনের দিকে ইদানীং অনেকের নজর পড়েছে — এ কথাও উড়িয়ে দেবার নয়। তবে কি না এই পুরস্কারপ্রাপ্তি উপলক্ষ করেই তো আমরা প্রণতিদিকে ঘিরে একটু জড়ো হতে পারলাম — এইটেই যথালাভ। কিন্তু যে-কথাটা বলে আমি শেষ করব তা হচ্ছে, প্রণতিদির এই বই যে এখনও পর্যন্ত প্রণতিদির সেরা বই সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। শুধু তাই নয়, এই বই যদি স্বয়ং সোমেন্দ্রনাথ পড়তেন তাহলে তিনি নিশ্চয় বলতেন যে, এ বই তাঁর ইনস্টিটিউটেরও সেরা বই বটে।

ইনস্টিটিউটেরও সেরা বই? কিন্তু প্রণতিদির সঙ্গে কি ইনস্টিটিউটের কোনো সম্পর্ক আছে আর? নিশ্চয় আছে! দিনেন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, বিধুশেখর শাস্ত্রীও থাকতে পারেন নি। কিন্তু ক্ষিতিমোহন? ক্ষিতিমোহন কি শান্তিনিকেতন ছাড়তে পেরেছিলেন? অথচ ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে রবীন্দ্রহীন শান্তিনিকেতনের প্রশাসনিক সভায় ক্ষিতিমোহনও কি দুই গোষ্ঠীর দলাদলিতে ধিকৃত হন নি? তবুও কি ক্ষিতিমোহন শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথেরই শান্তিনিকেতনে চিরকালের ক্ষিতিমোহন নন?

প্রত্যভিভাষণ

আমার কথা

প্রণতি মুখোপাধ্যায়

আজকের এই সভায় শ্রদ্ধেয় ও সম্মাননীয় যাঁরা উপস্থিত আছেন সকলকে আমার বিনীত নমস্কার জানাই। অভিনন্দন জানাই ড. অরুণকুমার বসুকে। সাহিত্য ও সংগীতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে তাঁর অনুসন্ধান ও চর্চার ক্ষেত্র প্রসারিত। বহুবিধ কাজকে একই সঙ্গে যাঁরা সার্থক করে তুলতে পারেন সেই বিরল ব্যক্তিত্বদের অন্যতম তিনি। শ্রদ্ধেয় সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম।

এই সভায় যাঁরা আছেন আমার স্নেহভাজন, যাঁরা আছেন আমার ছাত্রছাত্রী এবং তদ্‌প্রতীম, তাঁদের সকলের কল্যাণকামনা করি। ছোট শিক্ষকজীবনে আমার ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা খুব বেশি নয়। তার মধ্যে অনেকের সঙ্গে আমার সুখে-দুঃখে সম্বন্ধটা বেশি নিবিড়। এঁদের মধ্যে অনেকেই আমার সতীর্থ। প্রয়াত সোমেন্দ্রনাথ বসুর কাছে আমরা সকলেই চিরঋণী। তাঁর কাছে রবীন্দ্রনাথ পড়ার ঋণ আর তাঁর ভালোবাসার ঋণ মিশে একাকার হয়ে গেছে, সে ঋণ অপরিশোধ্য। তাঁকে আমাদের প্রণাম। প্রণাম আমার অন্যান্য সকল শিক্ষককে।

যাঁরা আজকের সভার আয়োজক, তাঁরা ভালোই জানেন যে আমি নিতান্ত নেপথ্যের মানুষ — আমাকে হঠাৎ এমন করে সভার উপলক্ষ করে তুললে সেটা আমাকে বেশ একটু অস্বস্তিতে ফেলবে। অনুযোগ করছি না, ভালোবাসা জিনিসটার প্রকাশ সব সময় খুব মধুর বা পেলব হয় না তো — সে কখনও অবুঝ, মাঝে মাঝে অত্যাচারীও। কিন্তু তাই বা ভাবছি কেন, আজকের সত্যি অন্যতম উপলক্ষ তো আমি নই, অথবা উপলক্ষই মাত্র। লক্ষ্য রবীন্দ্রনাথ, ক্ষিতিমোহন সেন। একদিন পন্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনের জীবনী লেখার আহ্বান পেয়ে সাড়া দিয়েছিলাম। আমার যদি কোনো কৃতিত্বের দাবি থাকে, সে এইটুকুই। 'পথ আমারে সেই দেখাবে যে আমারে চায়, আমি অভয় মনে ছাড়ব তরী এই শুধু মোর দায়।' সত্যের অনুরোধে স্বীকার করতে হয় খুব যে অভয় মনে নৌকা ভাসিয়েছিলাম তা নয়। ভয় প্রাণে যথেষ্ট ছিল। তারপরে কখন যেন ক্ষিতিমোহনের 'গুরুদেব' আর রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষিতিবাবু'র ছোঁওয়ায় ফুটো-ফাটা নৌকাটা আমার গতি পেয়েছে। আমি তো আমার শতেক সীমাবদ্ধতার মধ্যে আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের জীবনকথা বলতে গিয়ে আমার হাতের নাগাল যতদূর পৌঁছায় তারই সীমানায় তাঁকে ধরতে চেয়েছি, আমার দৃষ্টির সীমা যে বৃত্ত রচনা করে তারই মধ্যে তাঁকে বাঁধতে চেয়েছি। এর মাঝে যে-টুকু দেখা গেল সেই বিশাল মাপের মানুষটার জীবন, দেখছি দেশের মানুষকে তা আকৃষ্ট করল, ভালো লাগল তাঁদের। তাই পুরস্কারের নামে এই খুশির প্রকাশ।

এক পথিক ক্ষিতিমোহন। স্বদেশ তাঁর তীর্থভূমি, এ দেশের মানুষ তাঁর তীর্থদেবতা। এই

দেশকে, এই দেশের মানুষকে ঘিরে তাঁর যে মন পাখা মেলেছে চিরন্তন ভারতের আকাশে, সেই মনই শান্তিনিকেতন ও রবীন্দ্রনাথের টানে বন্দী। সে তো তাঁকে শুধু বাঁধে নি, মুক্তিও দিয়েছে। 'একাধারে তুমিই আকাশ তুমি নীড়।' দুইয়ে মিলে আশ্চর্য এক সমন্বয়ের সুর ক্ষিতিমোহনের জীবন জুড়ে। রবীন্দ্রসন্নিধানে যখন এসে পড়লেন, বয়স আঠাশ। প্রবীণ বয়সেও তাঁর প্রতি নিঃসর্ত আনুগত্যে কখনও বলেছেন 'আমরা ছিলাম মাটির তাল, গুরুদেব আমাদের হাতে ধরে গড়ে-পিটে তৈরি করে নিয়েছেন।' চেতন-স্যাকরা রবীন্দ্রনাথের কষ্টিপাথর মন প্রথম থেকেই জেনেছিল ক্ষিতিমোহন সোনার তাল। তার যথাযথ রূপায়ণে সে মন প্রেরণা জুগিয়েছে যেমন, তেমনই নিজেও তার সঙ্গলাভে উজ্জীবিত হতে চেয়েছে। অসীম প্রত্যাশায় তাঁকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

> আপনি মনে করিতেছেন আপনি কেবল আপনার ছাত্রদের লইয়াই কাজ করিবেন সেটা আপনার ভুল। আমরাও আছি। রসের অভাব হয়, পাথেয় কম পড়িয়া যায় - পরস্পরের কাছে ধার না লইলে মাঝে মাঝে পথের ধারে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িতে হয়। ছাত্রদিগকে পাইয়া আমাদিগকে অবহেলা করিবেন না।

আর একবার লিখেছিলেন :

> আমার অন্তরের প্রীতি জানিবেন। আপনার প্রেম যে আমার কিরূপ পথ্য ও পাথেয় তাহাও মনে রাখিবেন।

যাই বলুন, যাই লিখুন রবীন্দ্রনাথ, ক্ষিতিমোহন কিন্তু সারা জীবনই রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর ঋণের কথাই বলে এলেন। ১৯৫২ সালে, তাঁর বয়স যখন বাহাত্তর ছুঁয়েছে, শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ এই প্রবীণ আশ্রম-আচার্যকে সংবর্ধনা জানালো। ক্ষিতিমোহন তদুত্তরে বললেন :

> এখানে সম্মানের আসল পাত্র গুরুদেব। তাঁরই একটি কবিতা আজ মনে আসছে —
>
> রথযাত্রা, লোকারণ্য, মহা ধুমধাম
> ভক্তেরা লুটায়ে পথে করিছে প্রণাম।
> পথ ভাবে আমি দেব রথ ভাবে আমি,
> মূর্তি ভাবে আমি দেব-হাসে অন্তর্যামী।
>
> এখানে আমার আবার সম্মানের কথা কি। আমরা তাঁর সাধনা নিয়েই অগ্রসর হয়েছিলাম।

এই বলে সেদিন ক্ষিতিমোহন তাঁর ভাষণে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সাধনার প্রসঙ্গে নানা কথা বললেন। ওরই মধ্যে একথাও জানা গেল যে, রবীন্দ্রনাথের আহ্বান স্বীকার করে তিনি যখন শান্তিনিকেতনে আসেন, কেবল ভরসা দিয়েছিলেন তাঁর মা। আত্মীয়-বন্ধুরা সকলেই প্রতিকূল। উন্নতির চেষ্টা না করে এখানেই পড়ে রইলেন বলে পরেও অনেকে বকাবকি করতেন। এই ভাষণে ক্ষিতিমোহন বলেছেন :

> তাঁর কাছে যে বেতন পেয়েছি তার তুলনা কোথাও নেই। অনেক আর্থিক সম্ভাবনাও তার কাছে তুচ্ছ। আত্মীয়েরা আমাদের তিরস্কার করতেন কিন্তু তাঁরা কি জানতেন যে আমরা কোথাও একটুকুও ত্যাগ স্বীকার করি নি। আমরা তাঁর কাছে যা পেয়েছি কোথাও তা মিলত না। — 'যা দেখেছি যা পেয়েছি তুলনা তার নাই।'

এ কি শুধু আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের কথা? তাঁর মতো সংবেদী চিত্ত যে ঐশ্বর্য লাভ করল, আমাদের মতো সাধারণ স্তরের মানুষের পাওয়া-না-পাওয়ার সঙ্গে তার তুলনা চলে না, জানি। তবু বিংশ শতাব্দীর মানুষ হয়ে রবীন্দ্রনাথকে যেটুকু পেলাম, পেলাম মাতৃভাষায়, যেটুকু ধরল আমার আধারে — তাই কি কিছু কম? আজ জীবন-সায়াহ্নে পৌঁছে আমারও তো মন বলে 'যা দেখেছি যা পেয়েছি তুলনা তুলনা তার নাই'। মাটির এই কলস আমার ছাপিয়েই গেল তো।

ছোটবেলায় মধুমাঝির নৌকায় অনাহুত আমিও সওয়ার হয়েছি। ঝরে-পড়া শিউলি ফুলে সাজিয়ে কাগজের নৌকা ভাসিয়ে দিয়েছি মনে মনে।

তবে আমি যাই গো তবে যাই।
ভোরের বেলা শূন্য কোলে
ডাকবি যখন খোকা বলে,
বলব আমি, 'নাই সে খোকা নাই।'
মা গো যাই।

কী না-বোঝা ব্যথায় চোখের পাতা ভিজিয়ে দিত এ-সব কবিতা। ভারি অবাক লেগেছিল যখন বহুকাল পরে জানা হল আমার এই একান্ত চেনা কবিতাটা বিদেশে রবীন্দ্রনাথ অনেকবার অনেক সভায় পড়তেন, সেই-সব দূর দেশের শ্রোতাদেরও সবার এত ভালো লাগত এ কবিতা।

শিশুর মত *কথা ও কাহিনীর* কত কবিতাও তখন মুখে মুখেই শেখা হয়ে যেত আমাদের। একটা ছোট খাতার কথাও মনে পড়ে। দিদি যখন শ্বশুরবাড়িতে থাকত, দিনগুলো ওর তেমন সুখে কাটত না। আহত মন আশ্রয় খুঁজত রবীন্দ্রনাথের কবিতায়। যখন আসত আমাদের কাছে, ছোট নোটখাতায় অনেক কবিতা নকল করে আনত। কোনো কবিতায় মাথায় লেখা থাকত ফুলদির নাম, কোনোটার মাথায় আমার নাম, কোনোটার মাথায় বা দুজনেরই নাম। ছোটবেলা বড় নিঃসঙ্গ ছিলাম। পর পর অকালমৃত্যুর জেরে বাড়িটা যেন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। তার মধ্যেই আবার আমার কাছাকাছি বয়সের রাঙাদি আর ফুলদির বিয়ে হয়ে গেল। আমি পড়ে গেলাম একা। আমাদের কালে ছোটদের জীবনে কোনো ব্যস্ততা ছিল না, দিন কাটত রয়ে-বসে। অনূর্ধ্ব তেরো বছরের ফুলদি শ্বশুরবাড়ি চলে যেতে সেই যুগ্মস্বত্বের খাতাখানা আমার একার অধিকারে এসে পড়ল। পরে কোথায় হারিয়ে গেল কে জানে, যত্ন করে রাখতে পারি নি, কিন্তু তখন সে আমাকে অনেকটাই সঙ্গ দিয়েছিল। অজান্তেই সে আমার মনের জমিতে পলিমাটির আস্তরণ বিছিয়েছে।

সুদাস মালীকে দেখতে পেতাম — অসময়ে ফোটা পদ্মফুলটি নিয়ে সে বেশি দাম পাবার আশায় রাজদ্বারে এসেছিল। রাজা ও বণিকে সে ফুল অধিকারে পাওয়ার প্রতিযোগে তার মূল্য ক্রমে বেড়ে উঠছে দেখে সে দৌড়ে গেছে স্বয়ং ভগবান বুদ্ধের কাছে। ভেবেছিল তাঁকে দিলে না জানি আরও কত দাম পাবে। স্বচক্ষে তাঁকে দেখার পরে তাঁর চরণপ্রান্তে সপ্রণাম ফুলটি নিবেদন করে ফুলের চরম মূল্য তার আপনিই পাওয়া হয়ে গেছে। শৈশবের

সেই অতি প্রিয় কবিতাগুলির কথা যখন ভাবি, মনে হয় এ-কবিতা পড়ে কোনো শিশুও তার মতো করে বুঝে নেবে প্রকৃত মূল্য পাওয়া কাকে বলে। বুঝে নেবে মানুষের যা শ্রেষ্ঠ দান তা-ও সে যখন-তখন অনায়াসে দিয়ে ফেলতে নারে না। একটি বিশেষ ক্ষণের চরম আহ্বান তার মনকে যখন জাগিয়ে তোলে তখনই তার শ্রেষ্ঠ দানটি পেয়ে গ্রহীতা ধন্য হন। বুদ্ধশিষ্য অনাথপিন্ডিত একদিন শ্রাবস্তী নগরীর ঘুম ভাঙিয়ে মানুষকে আহ্বান জানিয়েছিলেন ভিক্ষা দেবার জন্য। কত জনে কত দিল, ধনদৌলত স্তূপাকার হয়ে উঠল। সন্ন্যাসীর ভিক্ষাপাত্র শূন্যই রইল তবু। অবশেষে নগরপ্রান্তে বনের আড়ালে কোনোমতে লুকিয়ে থেকে এক নগণ্যা নারী তার জীর্ণ চীরখানি খুলে ফেলে দিল যেই, অমনি সর্বশ্রেষ্ঠ দানটি পাওয়া হল মহাভিক্ষুকের, তাঁর সাধ পূর্ণ হল। সেই দীনা কন্যার নির্বাক কণ্ঠে কবি হুইটম্যান সেদিন কথা বলেছেন :

Behold, I do not give a little charity
When I give, I give myself.

এমন করে নিজেকে দেবার কথা জীবন কিন্তু ভাবে নি — সেই যে 'স্পর্শমণি' কবিতার জীবন, পাবার জন্যেই ওর আসা। কিন্তু কী মন্ত্রে যে মানুষের দেওয়া আর নেওয়া এক হয়ে যায়। বৃন্দাবনের সনাতন গোস্বামীর কাছে বহুদূর থেকে ধনী হবার কৌশল জানতে এসেছিল জীবন। তাঁর নির্দেশে পরশমণির সন্ধান পেয়ে তার আশার পালে তো হাওয়া লাগবারই কথা। কেন না, স্পর্শমণি ছুঁতে না ছুঁতে তার হাতের লোহার মাদুলি যে সোনা হয়ে গেল। কিন্তু বিচিত্র মানুষের মন। কোথায় লোভটা আরও চেপে বসবে, তা নয়, জীবনের মনটাই পাল্টে গেল। সোনা পেতে তখন সে আর চায় নি, সোনা হতে চেয়ে সাধক সনাতনের শরণ নিয়েছে। পরশমণি তুচ্ছ তখন, ফেলে দিতে দ্বিধা নেই। জীবন্ত স্পর্শমণির সন্ধান পেয়েছে তার মন।

ওই পরশপাথরটাই তো জীবনভর খুঁজে ফিরেছিল এক খ্যাপা মানুষ, সে-ও তো এক জীবন। তার সেই পরম কাঙ্খিত ধনটি যে অপ্রাপণীয়ের প্রতীক, কখনও বা কারো কাছে সে-জিনিসটি অতর্কিতে ধরা দেয়ও, আবার অপরিচয়ের, অমনোযোগের বাধায় ঠেকে হয়তো হারিয়েও যায় চিরকালের মতো। সেই পাগলের ট্র্যাজেডিটা আমরা সকলেই জানি:

কেবল অভ্যাসমত, নুড়ি কুড়াইত কত
ঠন করে ঠেকাইত শিকলের পর,
চেয়ে দেখিত না নুড়ি দূরে ফেলে দিত ছুঁড়ি
কখন ফেলেছে ছুঁড়ে পরশপাথর।

সেই পরম প্রার্থিতের স্পর্শটুকু যে পলকের জন্য ছুঁয়ে গিয়েছিল তাকে, কোমরে জড়ানো শিকলটায় চিহ্ন রয়ে গেয়ে তার — 'লোহা যে হয়েছে সোনা জানে না কখন' — আশ্চর্য

এই, লোহা সোনা হল এটা কোনো প্রাপ্তিই হল না। কঠিনতর সত্য হল, জীবনের অর্ধেকটাই যার সন্ধানে কেটে গেছে এখন বাকি দিনগুলোও তারই সন্ধানে ফেলে-আসা পথ ধরে চলা ছাড়া আর কোনো গতি নেই মানুষটার। সে শক্তি আর নেই, আসন্ন রাত্রির ম্লান ছায়া পড়েছে সর্বত্র। তবু ন্যুব্জ দেহে ভগ্ন প্রাণে অপ্রাপ্তির নিঃশব্দ হাহাকার বুকে নিয়ে সেই প্রার্থিতের সন্ধানে সে মানুষ চলেছে, চলেছে, চলেছে।

এই মানুষটাও আর এক মৃত্যুঞ্জয়। আমাদের মৃত্যুঞ্জয় মৃত্যুকে জয় করে বেরিয়ে এসেছিল। তার গুপ্তধনলাভের সংকেত-ছড়াটা কৈশোরে আমাদের কার না মুখস্থ ছিল। শেষে সে বললে, আমি আর কিছুই চাই না — এই সুড়ঙ্গ থেকে, অন্ধকার থেকে, সোনার গারদ থেকে বেরোতে চাই। 'আমি আলোক চাই, আকাশ চাই, মুক্তি চাই।' গোধুলির সোনা-গলা আকাশের কল্পনাছবি তাকে ডাকছিল, ডাকছিল প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার মধ্যে দীনতম তুচ্ছতম হয়ে বেঁচে থাকবার স্বাদ। মানুষ কখনও বা মর্তপ্রীতিরসের প্রবল টানে চিরবন্দী, কখনও বা অনির্বচনীয়ের মর্তসীমা-ছাড়ানো অনির্দেশ্যের অমোঘ আকর্ষণে অনাগারিক। সে কখনও বলছে 'ফুরায় নি ভাই কাছের সুধা' এই যে এ-সব ছোটোখাটো পাই নি এদের এদের কূল-কিনারা'। কখনও বলছে 'প্রেয়সী নারীর নয়নে অধরে আর-একটু মধু দিয়ে যাব ভরে .....'। আবার কখনও সে বলে 'যাত্রী আমি' — আমাকে ধরে রাখতে কেউ পারবে না — 'দুঃখ সুখের বাঁধন সবই মিছে, বাঁধা এ ঘর রইবে কোথায় পিছে'। বারে বারে মৃত্যু তাকে স্পর্শ করে যায়, তবু সে মৃত্যুঞ্জয়ী। বন্দরের কাল শেষ হল বলে যে বেরিয়ে পড়ে, সে আর ফেরে না। তেমনি আবার ঘরের সীমাও সংকীর্ণ হয়ে তার শ্বাসরোধ করতে যায়। পথে চলতেও আলো নিভে যায়, আত্মহননের রক্তাক্ত পিচ্ছিল রাস্তায় দিশা হারায়। দিনের পর দিন যে মানুষ তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছিল, অন্ধ আক্রোশে তাকেই সে হত্যা করে। তবু যাত্রা থামে না। ঘর ভাঙে, সর্বস্ব লুণ্ঠিত হয়। তবু তার ঘর বাঁধার বিরাম নেই। মানুষের এই অনিঃশেষ প্রাণসত্তার অধিকার আমাদের সবারই।

আজকের এই অনুষ্ঠানের উদ্যোগ যাদের, আমার সতীর্থরা, তোমাদের বলি, তোমাদের দেওয়া এই অভিনন্দনের অর্ঘ্য স্পর্শ করল আমার মনকে। স্নেহে তা গ্রহণ করি, শ্রদ্ধায় তা উৎসর্গ করি সেই ভালোবাসার কাছে, যে ভালোবাসার বাঁধনে আজ অনেক বছর থেকে তোমাদের সঙ্গে আমার মন বাঁধা পড়ে আছে। সকালবেলার আলোর মতো কোমল উত্তাপে জড়িয়ে আছে আমায়। কী যে তার মূল্য — ভাষা নেই যে প্রকাশ করি — 'সেই ভালোবাসা মোরে তুলেছে স্বর্গের কাছাকাছি'। জীবনের অনেকটা পথ তো চলে এলাম — 'দিয়েছি যত নিয়েছি তার বেঁশি'। আজকে, মানুষ যখন বড় ভয় পেয়েছে, অন্ধকারের ভয়, পাশবিকতার নাগপাশে আবদ্ধ হওয়ার ভয়, আজ কি আশীর্বাদ জানাব বলো তো তোমাদের, দেবতার কাছে কি বর প্রার্থনা করব তোমাদের জন্যে? রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

Life should be like a lamp where the potentiality of light is far greater in quantity than what appears as the flame.

জানি, সেই সম্ভাবনাঋদ্ধ আলোর অধিকার আমাদের ভিতরে অনির্বাণ হতে বাধা পায়। 'সেই আলোটি নেভে জ্বলে', ক্ষীণ হাতে জ্বালা ম্লান দীপের থালাখানা বারবার ভেঙে যায়। ঝড়ের রাত্রি গর্জন করে আসে। তবু সেই দীপের আলোটুকু দেখবে বলে সন্ধ্যাতারাটি যে চেয়ে থাকে — সেই কথাটি ভুলো না কোনোদিন। আজ সেই পুরোনো কথাটাই বলি, আত্মদীপো ভব — 'আপনারে দীপ করি জ্বালো'।

আমার ঠাকুমা থাকতেন কাশীতে। ছোটবেলা থেকে বড় বয়স পর্যন্ত বার বার কাশী গেছি। কার্তিক-অঘ্রাণ মাসে সন্ধেবেলা দশাশ্বমেধ ঘাটে গেলে দেখতাম ছোট ছোট মেয়েরা খড়ের তৈরি শক্ত আসনের মতো পাত্রে ছোট ছোট দীপ নিয়ে ফেরি করত - মলিন বাস, রুক্ষ চুল, মিষ্টি কচি গলায় বলত 'মাঈজী, দীয়া জ্বালাও'। কি জানি এখনও গেলে তেমন দৃশ্য দেখা যায় কি না। সামান্য পয়সার বিনিময়ে সেই প্রদীপ জ্বেলে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিতাম। কোনোটা বা এক পলকেই টুপ করে ডুবে যেত, কোনোটা বা ঢেউয়ের দোলায় একটু এগোত। উৎসুক চোখে তাকিয়ে থাকতাম আমরা। তখনও ঘাটে ঘাটে এত আলোর আবিলতা ছিল না। অন্ধকারে কাছে-দূরে নৌকায় নৌকায় জ্বালা টিমটিমে আলোগুলো ভারি মায়াময় দেখাত, দূর আকাশপটে মুঠো মুঠো তারা ছড়ানো। এখানে-ওখানে বাঁশের মাথায় আকাশ-প্রদীপ জ্বলত শূন্যপানে চেয়ে। সেই দৃশ্যপট, সেই অনুনয়-মাখা বালিকা-কণ্ঠ আমার মনে যেন চিরকালের মতো গাঁথা হয়ে গেছে — 'মাঈজী, দীয়া জ্বালাও'। সে মেয়ে বুঝি আজও আঁচল দিয়ে তার আলোটুকু আড়াল করে সাবধানে পথ চলেছে। মর্তের কাছে তার একটাই প্রার্থনা —

'দীপালিকায় জ্বালাও আলো', 'জয় করো এই তামসীরে'।

১১ জুলাই, ২০০২।

‘আমি তো তার ভেলা’

অরুণকুমার বসু

আমার অগ্রজপ্রতিম সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় — আজ যিনি সভাপতি, আমার প্রীতিভাজন প্রণতি মুখোপাধ্যায়, আমার প্রাক্তন ছাত্র অধ্যাপক পবিত্র সরকার ও বাংলা আকাদেমির সচিব সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়, আমার সেইসব ছাত্র যাঁরা আজকের এই সমাবেশের উদ্যোক্তা এবং আমার অন্য অন্য প্রিয়জন ও শ্রদ্ধেয় জন, যাঁরা উপস্থিত আছেন — তাঁদের সকলের কাছে আজ আমার কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি।

এতক্ষণ অনেকে অনেক কথা বলেছেন। বক্তা ও আলোচকদের মধ্যে আমি সবশেষে বলতে চেয়েছি শুধু একটি কারণে যে, দুটো-চারটে বাক্য দিয়েই আমার কথা শেষ করব। আর সভা শেষ হল বলে সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবেন। যেহেতু একটু রাত হয়ে গেছে, তাই সভা শেষ করে সবাইকে খুশি করবার সুযোগটাই আমি নিতে চাইছি। আমার বিশেষ কী বলার আছে? কোনো সংবর্ধনা সভার রীতি এই হওয়া উচিত, যাঁকে সম্মান জানানো হচ্ছে তাঁর দিক থেকে : ‘অন্যে কথা কবে, কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর’। সবাই যা বলার বলেছেন। আমার নতুন কথা কিছু নেই। ‘স্তব্ধ হৃদয় বিছায়ে চাহিতে শুধু জানি’।

আমি অধ্যাপনা-জীবনে প্রবেশ করেছিলাম পঁচিশ বছর বয়সে। তারপর প্রায় চুয়াল্লিশ বছর ধরে শিক্ষকতা করেছি। আজ মাঝে মাঝে মনে হয়, যা দিয়েছি কখনও কোনো ছাত্রকে, তা আমার সামান্য সঞ্চয়ের এক-একটি কণা। তা যে এমন করে ফিরে আসবে তা যদি জানতাম, তা হলে তো সেই কথাই বলতে ইচ্ছে হয়, ‘তোমায় কেন দিইনি আমার সকল শূন্য করে!’

আমাদের ব্যবহারিক জীবনের শব্দভাণ্ডারে কিছু ব্যক্তিবাচক জোড়-শব্দ আছে যেগুলি পরস্পর-সাপেক্ষ। যেমন ডাক্তার-রোগী, উকিল-মক্কেল, দোকানদার-খরিদ্দার বাড়িওয়ালা-ভাড়াটে ইত্যাদি। তবে এই জাতীয় শব্দের দ্বারা সম্পর্কগুলোর চিরস্থায়িত্ব দাবি করা যায় না। রোগ মুক্ত হলে সেই রোগী আর ডাক্তারের দ্বারস্থ হবেন না। ভাড়াটে উঠে নিজের বাড়ি চলে গেলে আর বাড়িওয়ালা বলে তার জীবনে কেউ থাকছে না। দোকান থেকে জিনিস কিনে আনার পর তার ব্যবহার হয়ে গেল, দোকানদারের সঙ্গেও সম্পর্ক ফুরলো। তেমনি মামলা শেষ হলে তো উকিলবাবুকেও গুড বাই।

কিন্তু ছাত্র আর অধ্যাপকের সম্পর্ক এদের তুলনায় নিশ্চয় আলাদা। অন্য সব সম্পর্কের মধ্যে বাতাস নেই; হয়তো আলো আছে, গন্ধও থাকতে পারে; কিন্তু নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সেই অবকাশটুকু নেই যা প্রাণ, যা বাঁচিয়ে রাখে। তুলনাটা ঠিক হল কি না বলতে পারি না। তবে

আমরা যারা মাস্টারি করি, বিশ্ববিদ্যালয়ের গন্ডিতে বা স্কুলে-কলেজে, আমাদের ছাত্ররা পড়াশোনা শেষ হলে চলে যায়। কিন্তু তবু সম্পর্ক শেষ হয় না। তাদের সকলের জীবনেই শিক্ষকদের সম্পর্কে কিছু-না-কিছু স্মৃতি থাকে। সে স্মৃতি কতখানি গভীর, 'আঁধারের গায়ে গায়ে পরশ তব' কী রকম তা জানার সুযোগ হয় না। তবে, আজকের এই সভার মতো অথবা সভার নেপথ্যবর্তী দু-একটি পুরস্কারপ্রাপ্তির ঘটনার মতো কোনো উপলক্ষে হয়তো শিক্ষক-ছাত্রের আপাতবিচ্ছিন্ন সম্পর্কে নতুন গ্রন্থি লাগে। দূরের জন হঠাৎ কাছে চলে আসে। শুধু মুখটাই আসে না, মুখের সঙ্গে আসে অনেক দিনের ঝাপসা-হয়ে-আসা স্মৃতি। তখন 'কত দিনের কত কথা হাওয়ায় ছড়ায় ব্যাকুলতা'। টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট তো বড়ো কোনো প্রতিষ্ঠান নয় — তার সে রমরমা নেই। এখানে যাঁরা আসেন, শুধু রবীন্দ্রনাথকে জানার আগ্রহ নিয়ে আসেন। ক্লাস তো সপ্তাহে মাত্র দুদিন, তাও কয়েক ঘন্টার জন্যে। আমার মতো যাঁরা পড়াতে আসেন, তাঁরাও পড়ানোর আনন্দে আসেন, কোনো স্বার্থসিদ্ধির জন্যে অথবা বাণিজ্যবুদ্ধির জন্যে নয়। তবু সেই সামান্য সংযোগ বছর-বছর ছোটো-ছোটো এক-একটা ইতিহাস গড়ে তোলে। যত ক্ষুদ্র যত অপাংক্তেয় হোক, তবু তা ইতিহাসই।। সেই ইতিহাসের হৃদয় আছে, আবেগ আছে, অনুভূতি আছে। সেই আবেগই আজ চোখের পাতা ভিজিয়ে দেয়। অবশ্যই দুঃখে নয়। 'আনন্দ আজ কিসের ছলে কাঁদিতে চায় নয়নজলে'।

আমি নজরুলের জীবনী রচনা করে কোনও-না-কোনোভাবে একটা সম্মান পেয়েছি। প্রণতি ক্ষিতিমোহন সেনের জীবনী রচনা করে সম্মানিত হয়েছেন। এক দিক থেকে আমাদের দুজনেরই কাজের উপরে রয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। আমি নজরুল সম্পর্কে গবেষণা করতে গিয়ে দেখেছি তিনি যে সময়ের যে অঞ্চলের ইতিহাস জুড়ে আছেন, সে সময়, সে অঞ্চল আচ্ছন্ন করে বিরাট গরূড়ের মতো পক্ষবিস্তার করে আছেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনিরপেক্ষভাবে নজরুলের কোনো জীবন হতেই পারে না।

নজরুল যখন সতেরো-আঠেরো বছর বয়সে করাচিতে সেনা-ছাউনিতে চাকরি করতে গেছেন, সেই সময়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। কোথাও অতর্কিত হানার আশঙ্কা নেই, তাই সেনা ছাউনিতে টেনশনও নেই। তাঁই ছাউনির সৈনিকরা, শিক্ষানবিস যত অস্ত্রধারীরা সবাই মিলে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত নিয়মতান্ত্রিক শৃঙ্খলায়, সেনাসুলভ কাজকর্মের অভ্যাস করতেন, কিন্তু তার বেশি কিছু ভয়ভাবনা ছিল না। সুতরাং সেনা-ছাউনিতে সবই চলত — গানবাজনাও চলত, সাহিত্যের আলোচনাও চলত। নজরুলের সেই আঠেরো-উনিশ বছর বয়সে লেখা প্রথম উপন্যাস *বাঁধনহারা* যাঁরা পড়েছেন তাঁরা দেখবেন যে নানান জায়গা থেকে আসা সৈনিকদের মধ্যে অনেকেই বেশ ভাল গানবাজনা করতেন। মাঝে মাঝে করাচিতে যখন খুব বৃষ্টি হচ্ছে, সেনা-ছাউনির সকলেই যখন প্রায় ঘরে বন্দী হয়ে সেই শিবিরে, কর্মহীন অবস্থায় বসে আছেন, তখন গানের আসর বসেছে। কেউ ক্লাসিকাল গান গাইছেন, রাগরাগিনী আশ্রিত গান গাইছেন, কেউ তাঁদের নিজস্ব আঞ্চলিক ভাষার গান

গাইছেন। তাঁদেরই মধ্যে কোনও একজন সৈনিক, নজরুলের সেই উপন্যাসের দৃশ্য থেকে আমি বলছি, কোনও একজন সৈনিক হঠাৎ তার মধ্যেই — 'হেরিয়া সজল ঘন মেঘ গগনে, কাহার কাজল-আঁখি পড়িল মনে' — রবীন্দ্রনাথের এই গানটি গাইছেন। উপন্যাস, যার কণ্ঠে যার গলায় বলা হচ্ছে, যার লেখায় আত্মপ্রকাশ করছে, সেই চরিত্রটি এই গান শুনতে শুনতে ভাবছে, সে কেমন কবি যে এমন একটি অসাধারণ গান রচনা করে! আঠেরো বছর বয়সে সেনা ছাউনির নজরুল রবীন্দ্রনাথের গানে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় তখন থেকেই ছিলেন অভিভূত। আর, সকলেই জানেন উনিশশো একচল্লিশ সালে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণে শোকাভিভূত কবি নজরুল ইসলাম সেই উপলক্ষে লিখিত কবিতা আবৃত্তি করতে করতে, বেতারে, অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেই অসুস্থতাই তাঁর সাহিত্যিক জীবনের উপরে শেষ যবনিকাপাত ঘটিয়ে দিয়েছিল। তার এক বছরের মধ্যেই নজরুল স্বাভাবিক অবস্থা হারিয়ে ফেলেন। নজরুলের জীবন রবীন্দ্রনাথ দিয়েই শুরু, রবীন্দ্রনাথ দিয়েই শেষ। আর যে অবশিষ্ট জীবন তিনি বেঁচে ছিলেন, সে জীবন তো সৃজনশীল জীবন নয় — সে জীবন একটা ভারবাহী জীবন। সেই নজরুলের জীবনী লিখতে গিয়ে আমার কাছে কোনও রকম দুর্ভাবনার বিষয় ঘটে নি, কারণ রবীন্দ্র-পরিচয় লাভ করতে করতে যে সময়কে, যে কালকে, যে যুগকে এবং যে দেশকে বারেবারেই চিনতে হয়েছে তারই একটি খন্ডের নামই নজরুল ইসলাম। সেই নজরুল ইসলামের জীবনী লেখবার জন্যে আমাকে অনুরোধ করেছিলেন — পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সচিব প্রীতিভাজন সনৎ চট্টোপাধ্যায়। তবে আপনারা সবাই লক্ষ্য করেছেন—কী নজরুল, কী ক্ষিতিমোহন সেন—আমরা যা-ই করি না কেন, যাঁরা টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ছাত্র তাঁদের সকলের মনে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত জিজ্ঞাসার আলো-কে আমরা জ্বালিয়ে দিয়েছি, এইটাই আমাদের সবচেয়ে বড় আনন্দ। তাই আজকের অনুষ্ঠানের শুরুতে যে গানটি হচ্ছিল — 'আমার মাঝে তোমারি মায়া জাগালে তুমি কবি' — তারই একটি চরণ —

তোমার সোনা বোঝাই হল, আমি তো তার ভেলা।

সেই গানটির ভাষাই ফিরে ফিরে বাজছে আমার কানে, আমার মনে। সত্যিই তো, তাঁরই সোনা বোঝাই হল; আমরা তাঁরই ভেলা মাত্র — এই কথা স্মরণ করে আপনাদের সকলের প্রতি আমার এই সিক্ত চোখের করুণ নিবেদন প্রকাশ করে আমি বিদায় নিচ্ছি। নমস্কার।

১১ জুলাই, ২০০২

সভাপতির ভাষণ

সারস্বত সমাজের দুই গুণী, আমার পরম প্রীতিভাজন

সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সারস্বত সমাজের দুই গুণীর সংবর্ধনা উপলক্ষে আজ আমরা এখানে মিলেছি। ব্যক্তিগতভাবে আমার বিশেষ একটু আনন্দ আর তৃপ্তি আছে এই কারণে যে এই দু'জনেই আমার পরম প্রীতিভাজন।

শ্রীমতী প্রণতি মুখোপাধ্যায়, যিনি এ বছর রবীন্দ্র পুরস্কার পেলেন, এঁর সঙ্গে আমার দীর্ঘ দিনের পরিচয়। টেগোর রিসার্চ ইনস্টিট্যুট এ পরিচয়ের সূত্র। এই প্রতিষ্ঠানটির প্রাণপুরুষ বন্ধুবর প্রয়াত সোমেন্দ্রনাথ বসুর অধিনায়কত্বে প্রায় প্রতি বছরই একটি দল শান্তিনিকেতনে যেতেন। যথারীতি আমার আবাসেও আসতেন তাঁরা। মনে হয় শ্রীমতী প্রণতির সঙ্গে সেখানেই প্রথম পরিচয়। তারপর দেখেছি কী গভীর অনুরাগে এই প্রতিষ্ঠানটির জন্য তিনি নিবেদন করে দিয়েছেন নিজেকে। শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্র-গবেষণায় ঋদ্ধ হয়েছে ইনস্টিট্যুটের প্রকাশনা বিভাগ। এ কথা সকলেরই জানা।

বাংলা একাডেমির আহ্বানে আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের জীবনী লেখার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন প্রণতি। যথাসময়েই সে সংবাদ আমি পেয়েছিলাম। এই উপলক্ষেই গবেষণার উপকরণ সংগ্রহের কাজে নিয়মিত শান্তিনিকেতনে আসা শুরু প্রণতির। বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগার, রবীন্দ্রভবন অভিলেখাগার তো আছেই আকর হিসাবে। এ ছাড়া আছেন আচার্য-কন্যা শ্রদ্ধেয়া অমিতা সেন এবং এমন কিছু মানুষ যাঁরা আচার্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত। দৌহিত্র অমর্ত্য সেনের সঙ্গে সাক্ষাতেরও সুযোগ ঘটে বছরের একটি সময়ে। অতএব গবেষিকার প্রধান কর্মক্ষেত্র হয়ে উঠল শান্তিনিকেতন। এই সূত্রেই তাঁর কাজের অগ্রগতি, সমস্যা ইত্যাদির সঙ্গে পরিচিত হয়েছি, অবহিত থেকেছি গোড়া থেকেই। প্রকাশিত গ্রন্থ ছাড়াও অনেক অপ্রকাশিত চিঠির সন্ধান পেলেন প্রণতি এবং উপকরণবহুলতায়, বিশেষত আচার্য ক্ষিতিমোহনের সাধনা ও কর্মজগতের বহু বৈচিত্র্যে এক সময় খানিকটা বিভ্রান্ত বোধ করলেন প্রণতি কেননা একাডেমি-নির্দিষ্ট পথে জীবনী রচনার অতি স্বল্প পরিসরে আচার্যের বিচিত্রমুখী সারস্বত সাধনাকে ধরাই অসম্ভব। এই সমস্যার কথা আমাকেও জানিয়েছিলেন, জানিয়েছিলেন জীবনী-গ্রন্থের কলেবরবৃদ্ধির সম্ভাবনার কথা। আমার পরামর্শ ছিল যে কলেবরের আয়তন নিয়ে ভাবার প্রয়োজন নেই। যখন এই সুযোগ পাওয়া গেছে এবং প্রভূত উপকরণ হস্তগত হচ্ছে তখন তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করাই বাঞ্ছনীয়। তাতে যদি আয়তন বিপুলও হয় ক্ষতি নেই। প্রকাশের ব্যাপার একাডেমিই বিবেচনা করবেন। বলা বাহুল্য, আমার বক্তব্যে শ্রীমতী মুখোপাধ্যায় আপন অভিপ্রায়েরই সমর্থন খুঁজে পেলেন। বাংলা একাডেমির গুণী কর্ণধারেরা শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়ের বৃহদায়তন গ্রন্থটিকেই প্রকাশ করেছেন জীবনী-গ্রন্থের পূর্বনির্দিষ্ট কাঠামোকে গুরুত্ব না দিয়ে। গ্রন্থের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আচার্য ক্ষিতিমোহনের দৌহিত্র অমর্ত্য সেনের মূল্যবান ভূমিকা।

শ্রীমতী মুখোপাধ্যায় বহু পরিশ্রমে, অসামান্য নিষ্ঠায় যে জীবনীগ্রন্থটি লিখেছেন তাতে আচার্যের নানামুখী সারস্বত সাধনা আর কর্মযোগের এক পূর্ণাঙ্গ চিত্র আমরা পেয়েছি। গ্রন্থে এমন বহু প্রসঙ্গ আছে যা আগে কখনো লিপিবদ্ধ হয় নি, ভবিষ্যতেও হবার সম্ভাবনা ছিল না। এ গ্রন্থে রবীন্দ্রসান্নিধ্য-সমৃদ্ধ জীবনকথা বিশদভাবে বিবৃত হয়েছে। এবং এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, গ্রন্থটি শুধু আচার্যের জীবনকথা নয়, শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতীর মূল্যবান খণ্ড ইতিহাস।

শ্রীমতী মুখোপাধ্যায় দুরূহ একটি কর্তব্য অতি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেছেন। রবীন্দ্র পুরস্কার তারই উপযুক্ত স্বীকৃতি। শ্রীমতী প্রণতি মুখোপাধ্যায়কে সস্নেহ অভিনন্দন জানাই। সারস্বত সাধনার পথে তাঁর জয়যাত্রা অব্যাহত থাক, আন্তরিকভাবে এই কামনা করি।

বাংলার সারস্বত সমাজে শ্রীযুক্ত অরুণকুমার বসু এক বহু পরিচিত নাম। অধ্যাপক, গবেষক শ্রীযুক্ত বসুর বিচরণ সাহিত্যের নানা শাখায়। কিন্তু বিশুদ্ধ সাহিত্যের বাইরেও তাঁর আর একটি অনুধ্যান এবং চর্চার ক্ষেত্র হল সংগীত। বাংলাব সাহিত্য আর সংগীতের যাত্রা শুরু একই সঙ্গে, এ কথা সকলেরই জানা। প্রায় হাজার বছর আগে এই মিলিত যাত্রা শুরু হয়েছিল বৌদ্ধ সাধকদের সৃষ্টির মধ্য দিয়ে। তারপর বৈষ্ণব, শক্তি সাধনার ধারা একে সমৃদ্ধ করেছে অভাবিতভাবে। এরই সঙ্গে প্রবহমান থেকেছে লৌকিক গীতির বিচিত্র ধারা। আর সেই ঋদ্ধ ঐতিহ্যের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে এ কালের সংগীতজগৎ বাংলার নিজস্ব সম্পদের বাইরেও হিন্দুস্তানী মার্গসংগীতের মহার্ঘ সম্পদ আহরণ করে।

প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত বসুকে আমি জানি তাঁর ছাত্রজীবন থেকেই। আমিও তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক-ছাত্র। অনুরাগ আর অনুসন্ধিৎসা শ্রীযুক্ত বসুর সাহিত্যসাধনা বা গবেষণাকর্মের ভিত্তি। তার সঙ্গে যুক্ত হয় অসামান্য নিষ্ঠা আর উদ্যম। সংগীতের জগতে তাঁর যে উৎসাহ তার মূলে তাঁর অসাধারণ সংগীতানুরাগ। এ শুধু বৌদ্ধিক বিচারের আগ্রহ নয়। অধ্যাপনা, সাহিত্যচর্চার সঙ্গে সংগীতচর্চাও তাই তাঁর জীবনে পাশাপাশি বয়ে এসেছে। বাংলা গানের বিচিত্র জগতে তাঁর অনায়াস গতায়াত। আর এই সূত্রেও কবি ও গীতিকার নজরুলের সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহও দীর্ঘদিনের। তাঁর পূর্ণাঙ্গ নজরুলজীবনী গ্রন্থটি এ বছর নজরুল পুরস্কারে ভূষিত হল, এ আমাদের কাছে গভীর তৃপ্তি আর আনন্দের সংবাদ। বস্তুত কবি ও গীতিকার নজরুলের যথার্থ জীবনীগ্রন্থের খুবই প্রয়োজন ছিল। মনে আছে, নজরুল শতবর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনাচক্রে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ও প্রতিষ্ঠানে কখনো কখনো নানা বিষয়ে অবাঞ্ছিত বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে যথার্থ জীবনীগ্রন্থের অভাবেই। উপযুক্ত গুণী ব্যক্তির হাতেই সে অভাব দূর হল। সাহিত্য আর সংগীত — সৃষ্টির এ দুই শাখার সঙ্গে সমানভাবে যুক্ত বলেই শ্রী বসুর এই অধিকার অবিসংবাদিত।

নজরুল পুরস্কার শ্রীযুক্ত বসুকে নূতন করে পরিচিত করল, এমন নয়। কিন্তু উপযুক্ত ব্যক্তিকেই যে এই পুরস্কারে সম্মানিত করা হল, এ বড়ো আনন্দের কথা।

প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত অরুণ বসুকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন আর শুভেচ্ছা জানাই। তাঁর সারস্বত সাধনা অব্যাহত থাক, এই কামনা করি।

বিশেষ প্রবন্ধ

আমার বন্ধুভাগ্য

দিলীপকুমার বিশ্বাস

আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু শ্রীমতী প্রণতি মুখোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক অরুণকুমার বসু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রদত্ত যথাক্রমে রবীন্দ্র পুরস্কার ও নজরুল পুরস্কারে সম্মানিতহয়েছেন — এটা আমাদের পক্ষে আনন্দ ও গর্বের বিষয়। আমার সঙ্গে এঁদের দীর্ঘদিনের ব্যক্তিগত পরিচয়। রবীন্দ্রচর্চাকে আমাদের জীবনচর্যায় পরিণত করার উদ্দেশ্যে কলকাতায় যে রবীন্দ্রচর্চাভবন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তারই মাধ্যমে এঁদের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। এর মধ্যে প্রণতিকে আমি আরো আগে থেকে চিনি যখন উনি রামমোহন কলেজের অধ্যাপিকা ছিলেন। রবীন্দ্রচর্চাভবনের একদিকে আদর্শ যেমন ছিল সুনির্দিষ্ট ও সুনির্বাচিত পাঠক্রমের মাধ্যমে রবীন্দ্রসাহিত্য ও ভাবধারাকে দেশের যুবসমাজের মধ্যে সুপরিচিত করে তোলা তেমনই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের আদর্শ ও ভাবধারাকে সমগ্র দেশে তথা বিশ্বে সাধ্যমতন সম্প্রসারিত করা। শ্রীমতী প্রণতি তাঁর কলেজের চাকুরি ছেড়ে দিয়ে এই প্রতিষ্ঠানের সেবা ও আদর্শ প্রচারের কাজে নিজেকে সম্পূর্ণ নিবেদন করে দিয়েছিলেন। তিনি এখানকার ছাত্রী ও পরে অধ্যাপিকা। কী গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে অধ্যাপিকারূপে তাঁর কর্তব্য দীর্ঘদিন ধরে পালন করেছেন তার আমি অনেকাংশে প্রত্যক্ষদর্শী। আবার এর সম্পাদিকা হিসেবে তাঁকে যে-পরিমাণ পরিশ্রম করতে দেখেছি তা এক কথায় বলতে পারি বিস্ময়কর। সমস্ত সময় ও সকল কর্মশক্তি নিয়োগ করে প্রতিষ্ঠানকে একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান বিবেচনা করে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে এই প্রতিষ্ঠান পরিচালনার গুরুদায়িত্ব তিনি দীর্ঘকাল বহন করেছেন, তারও আমি প্রত্যক্ষদর্শী। আবার অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর আদর্শ সম্পর্কিত বিষয়ে যে রকম বহুমুখী গভীর অধ্যয়নে তাঁকে ডুবে যেতে দেখেছি তাতে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা অনুভব না করে পারিনি। রবীন্দ্রচর্চাভবনের একটি আদর্শ ছিল রবীন্দ্রনাথের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে যাঁরা এসেছেন এমন সব শ্রদ্ধেয় মানুষের জীবন ও কীর্তি যতদূর সম্ভব আলোচনা ও মূল্যায়ন করা। এই পর্যায়ে শ্রীমতী প্রণতি যে কাজ করেছেন এক কথায় তা তুলনাবিহীন। তাঁর ছোট কাজের মধ্যে উল্লেখ করতে পারি *শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম* বইখানির। এখনকার বিরাট বিশ্বভারতীর একেবারে শুরুতে যে-ভাবে পত্তন হয়েছিল তার একটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য বিবরণ এই গ্রন্থটিতে পাওয়া যায়। আর রবীন্দ্রপরিকরদের মধ্যে যে দুজনের জীবনী আলোচনার জন্য বেছে নিয়েছেন বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অমরত্ব অর্জন করেছেন তাঁরা; এঁদের মধ্যে একজন হলেন উইলিয়াম উইনস্ট্যানলি পিয়র্সন আর অপরজন স্বনামধন্য আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন। রবীন্দ্রপরিকর হিসেবে পিয়র্সন সি.এফ. এণ্ডরুজের মতনই বহুপরিচিত নাম। তিনি যে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠাসহকারে এক ক্ষুদ্রতর পরিধির মধ্যে কবির আদর্শকে স্বীয় জীবনে ও কর্মক্ষেত্রে রূপায়িত করেছিলেন তা আমাদের মুগ্ধ করে। এখন পর্যন্ত এই নীরব আত্মপ্রচারবিমুখ মানুষটি সম্পর্কে কিছু জানতে হলে শ্রীমতী প্রণতির সুবৃহৎ গ্রন্থটি আমাদের একমাত্র অবলম্বন। আচার্য ক্ষিতিমোহনের কর্মকেন্দ্র শান্তিনিকেতন হলেও ওঁর প্রসার সর্বভারতীয় এবং ভারতবর্ষে মধ্যযুগীয় লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর প্রামাণিক গ্রন্থগুলি

নিজগুণেই অমরত্ব অর্জন করেছে। ভারতীয় সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল কাশীতে তাঁর বাল্য কৈশোর যৌবন অতিবাহিত হয়েছিল। পরে কবির আহ্বানে শান্তিনিকেতনে তাঁর কর্মক্ষেত্র স্থানান্তরিত করেন। অক্লান্ত দেশ পরিক্রমার মাধ্যমে সমগ্র ভারতবর্ষীয় ধর্মসাধনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হবার সুযোগ লাভ করেন। ফলে তাঁর লেখনী থেকে আমরা পেয়েছি ভারতবর্ষের মধ্যযুগের সন্তদের সাধনার মর্মবাণী, বাংলাদেশের যাঁরা লোক পর্যায়ের সাধক সেই মরমী বাউলদের সাধনার মূলতত্ত্বের অমৃতোপম ব্যাখ্যা। এ বিষয়ে ইনি সবচেয়ে বেশী উৎসাহ লাভ করেছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কাছে। শ্রীমতী প্রণতির *ক্ষিতিমোহন সেন ও অর্ধশতাব্দীর শান্তিনিকেতন* গ্রন্থখানি এই মনীষীর কীর্তিকে আমাদের কাছে সুপরিচিত করেছে। এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার পরে ইনি এই সংক্রান্ত আরো একটি মহামূল্যবান কাজে হাত দিয়েছেন ; তা হল বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে থাকা ক্ষিতিমোহনের অগণিত প্রবন্ধের সম্পাদনা ও প্রকাশনা। এই পর্যায়ের প্রথম খণ্ডটি ইনি প্রকাশ করেছেন *সাধক ও সাধনা* নামে। আশা করছি পরবর্তী খণ্ডগুলিও শীঘ্রই প্রকাশিত হয়ে আচার্য ক্ষিতিমোহনের আজীবন সাধনার একটি সম্পূর্ণ চিত্র আমাদের কাছে তুলে ধরবে। সৌভাগ্যক্রমে ক্ষিতিমোহন দীর্ঘজীবন লাভ করেছিলেন এবং তাঁর গবেষণার পরিমাণও বিপুল। শ্রীমতী প্রণতি অক্লান্ত নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের দ্বারা রবীন্দ্রনাথের এই অন্যতম ঘনিষ্ঠ পরিকরদের সম্পূর্ণ চিত্র আমাদের কাছে তুলে ধরলেন। আচার্য ক্ষিতিমোহনের গবেষণার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরও এই কীর্তি অতি বিস্ময়কর। এ-ও তাঁর এক নিজস্ব সাধনা, এবং এ-বিষয়ে তাঁর যে নিষ্ঠা দীর্ঘদিন ধরে লক্ষ্য করে আসছি তাও বিরল বলেই মনে হয়েছে। সাংসারিক বাধাবিপত্তি এবং শারীরিক রোগ-ব্যাধি সত্ত্বেও তিনি এই কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছেন। তাই সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি তাঁর এই সাধনা সফল হোক এবং আচার্য ক্ষিতিমোহনের পূর্ণ পরিচয়-জ্ঞাপক প্রবন্ধাবলীর সবগুলি খণ্ড নির্বিঘ্নে প্রকাশিত হোক্।

অধ্যাপক অরুণ বসুর বিস্তারিত পরিচয় প্রদান নিষ্প্রয়োজন। আপন বিদ্যাবত্তা ও গবেষণার বলে তিনি বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। এমন গুণিজনের অকৃত্রিম বন্ধুত্ব লাভ সুনিশ্চিতভাবে আমার জীবনের একটি সৌভাগ্য। অপরাপর বিষয়ের মধ্যে একালের বাংলা গান সম্পর্কে তিনি দীর্ঘকাল গবেষণা করে এসেছেন। নজরুল শতবর্ষে তাঁর সদ্যপ্রকাশিত এবং সম্মানভূষিত *নজরুল-জীবনী* বাংলা সাহিত্যে একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হয়ে রইল। বাংলা সাহিত্যে কবি নজরুলের উত্থান ও প্রতিষ্ঠা আধুনিক যুগের একটি সর্বাংশে স্মরণীয় ঘটনা। একে বলা যায় এক পরম আবির্ভাব। তাঁর অল্পকাল স্থায়ী সাহিত্যিক জীবনে কবিতা, অগণিত সংগীত, অল্প পরিমাণ গল্পোপন্যাসের দ্বারা তিনি আমাদের চিত্তে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে জীবনের শেষপ্রান্তে এসে সম্পূর্ণ নীরব হয়ে গেলেন। তিনি শুধু গীতিকার নন, আধুনিক বাংলা সংগীতের অন্যতম প্রধান সুরকার হিসেবেও বাঙালীর সংস্কৃতিতে এক বিশেষ স্থানের অধিকারী। অকৃত্রিম রবীন্দ্রভক্ত হলেও তাঁর সংগীতসৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের প্রভাব থেকে আশ্চর্যভাবে মুক্ত।

নজরুল বিদ্রোহী কবি এবং সেই সঙ্গে প্রেমিক কবিও। তাঁর নিজের জীবনের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে তাঁর নিজেরই সিদ্ধান্ত এই যে, প্রেম দিতেই তাঁর আগমন এবং তাঁর বিদ্রোহী সত্তা সেই হিসেবে গৌণ। নজরুল-জীবনের কালানুক্রম কঠোরভাবে রক্ষা করা ও নজরুল-জীবনকে তাঁর সৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন করে না দেখা — এই দুটি আদর্শকে অনুসরণ করেই অধ্যাপক বসু *নজরুল-জীবনী* রচনা

করেছেন। জীবনবৃত্তান্তের সঙ্গে সৃষ্টির মূল্যায়নের সাযুজ্য ঘটিয়ে তিনি যে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনীগ্রন্থ রচনা করেছেন তা বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে চিরস্মরণীয় হয়ে রইল এবং এই গ্রন্থ পাঠ করে আমার বন্ধুভাগ্যকে আবার ধন্যবাদ দিচ্ছি। তাঁর কাছে এইটিই প্রত্যাশা ছিল এবং মুক্তকণ্ঠে বলব তিনি সর্বাংশে আমাদের প্রত্যাশা পূর্ণ করেছেন। সর্বান্তঃকরণে এই আশা প্রকাশ করছি যে এইভাবে তাঁর গবেষণার দ্বারা বাংলা সাহিত্যকে তিনি আরো দীর্ঘকাল ধরে সমৃদ্ধ করে তুলবেন।

অনুলেখকের কথা

কাবেরী রায়

শ্রদ্ধেয় দিলীপকুমার বিশ্বাস আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। গত ২৩ নভেম্বর তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। এই প্রবন্ধ এবং বই ছাপার কাজ তখন চলছে। তিনি আমার শিক্ষক, সেই সূত্রেই তাঁর সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের যোগাযোগ। 'গুরুজন সংবর্ধনা' অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্রটি যখন দিতে গিয়েছিলাম তখন তিনি অসুস্থ ছিলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে না পারার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন, আর সেইসঙ্গে বলেছিলেন যে এসব অনুষ্ঠানের খুব প্রয়োজন আছে, আজকাল গুণিজন সমাদর বড়ো কমে গেছে। প্রণতিদির ও অরুণদার পুরস্কারপ্রাপ্তিজনিত ওঁর প্রতিক্রিয়ার কথা জানতে চেয়েছিলাম, আর এই উপলক্ষেই ক'দিন ওঁর কাছে যাবার সুযোগ পেয়েছিলাম। উনি বলেছেন আর আমি লিখে নিয়েছি। তারই মধ্যে কতবার টেলিফোন এসেছে, অতিথি সমাগম ঘটেছে, কিন্তু পরম বিস্ময়ে লক্ষ্য করেছি ওঁর কথার খেই তাতে একটুও হারিয়ে যায়নি, সূত্র ধরে ঠিক প্রসঙ্গে ফিরে এসেছেন। কখনও বা বলতে বলতে থেমে গিয়েছেন, আমার মনে হয়েছে স্যারের মন যেন কোন্ গভীরে ডুবে রয়েছে। পরিষ্কার করে লিখে আর একদিন স্যারের কাছে গেলাম ওঁরই নির্দেশমত লেখাটির শেষে সই করিয়ে নিতে। সেদিন বুঝিনি যে সেই-ই আমার ওঁর সঙ্গে শেষ দেখা। লেখাটা শুনলে মন দিয়ে, তারপর অনেক কষ্টে সই করলেন। শুয়ে শুয়ে সই করতে কষ্ট হচ্ছিল, বললেন, '....'বিশ্বাস' লেখাটা যে এত কঠিন হয়ে উঠবে আগে কখনও ভাবিনি।' আবার বললেন, 'মাথাটা ঠিক আছে এখনও, মনও ভালো আছে, চোখের অবস্থাও যা তাতে কাজ চালিয়ে নেওয়া যায়, শুধু যা হাতটাই চলে না — এত কাঁপে!' তবু তারই মধ্যে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা প্রবন্ধ সংকলনের কাজ করেছেন, প্রুফ সবটাই দেখে প্রস্তুত করে রেখেছেন জানালেন। আরো কত কথাই যে হল — ওঁর স্কুল-জীবনের কথা, আমার পারিবারিক কুশলাদি, রবীন্দ্রচর্চাভবনের প্রসঙ্গ। কত সাধারণ আমি, কিন্তু কখনও নিরুত্তাপ ঔদাসীন্য দেখিনি তাঁর। স্মিত হেসে বলতেন, 'খুব ভালো লাগল তুমি এসেছ।' সেদিনও এর ব্যত্যয় হয়নি। বইটি প্রকাশিত হলে ওঁকে দেখিয়ে আসব বলে এসেছিলাম। কিন্তু সে সুযোগ আর রইল না। মৃত্যু অমোঘ, অকালবিয়োগও নয়, তবুও কেন জানি না 'জলে নয়ন আপনি ভেসে যায়'।

৩০ নভেম্বর, ২০০৩

দ্বিতীয় পর্ব

প্রসঙ্গ অরুণকুমার বসু



অরুণ বরণ কিরণমালা

বিশ্বনাথ রায়

রমণীয় ঋণের অরুণালোকিত কোলাজ

অনেকদিন আগে কোনো বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকার চিঠিপত্র বিভাগে প্রবোধচন্দ্র সেন অহেতুকভাবে আক্রান্ত। সংযত সুশৃঙ্খল যুক্তি ও নিরপেক্ষ বিচারে তা খণ্ডন করলেন একজন। প্রবোধচন্দ্র একটি ব্যক্তিগত চিঠিতে তাঁকে লিখলেন :

> নীহার-বিষয়ক আমার স্মৃতিকথা সম্পর্কে তুমি যে চিঠি লিখেছ তা পড়ে আমি অভিভূত হয়েছি। তোমার কাছে আমার ঋণের অন্ত নেই। সে ঋণ অপরিশোধ্য। কিন্তু সানন্দে স্বীকার্য ও বহনীয়। আমার জীবনের শেষ পর্যন্ত এই রমণীয় ঋণের কথা মনে থাকবে।

— এই রমণীয় ঋণের উৎসটি কে?

১৯৭৫ সালে প্রবাদ-প্রতিম কবি-অধ্যাপক তাঁর এক প্রিয়তম ছাত্রকে লিখছেন :

> প্রথমে একবার তোর লেখার ওপর চোখ বুলিয়েছিলাম। দ্বিতীয়বার শুনলাম তোর মুখে। দুবারই বুকটা দুরু দুরু করেছে, গুরুর প্রতি কর্তব্য করতে গিয়ে নিজের ক্ষতি করলি কিনা এই আশঙ্কায়। .... লেখাটির মধ্যে আমার শিক্ষক জীবনের একটি সার্থকতা দেখলাম। আমি আমার গুরুদেব সম্পর্কে ওভাবে লিখতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করতাম। তুই তোর শ্রদ্ধাকে এক আশ্চর্য সারস্বত প্রকাশে সার্থক করে তুলেছিস। .... আমার সাহিত্যসাধনাই শুধু নয়, শিক্ষকতাও কৃতার্থ হয়েছে। অমন ছাত্র পাওয়া শিক্ষকের সৌভাগ্য।

জগদীশ ভট্টাচার্যের এই শিষ্যটি কে, যাঁকে ছাত্র হিসাবে পেয়ে তিনি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করে কৃতার্থ হয়েছেন?

জীবনের প্রান্তসীমায় ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তি নিয়ে একজন শিক্ষাব্রতী-কবি ব্যগ্রভাবে চিঠি লিখছেন তাঁর চেয়ে নবীন বয়সী একজন 'sincere এবং serious শিক্ষাব্রতী'কে :

> কথা ছিল একদিন আসবে। কিন্তু সময় করতে পারছ না। যেদিন আসবে সেদিন বেশ একটু সময় হাতে রেখে আসবে। Next-বই-এর পাণ্ডুলিপিটা দেখতে হবে।

কবি কালিদাস রায়ের এই উদ্দিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে একটু কি অনুমান করা যায়? একটু চেনা যাচ্ছে কি! সাহিত্যিক ও সুসমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় কাকে লিখতে পারেন এমন কথা :

> মেধা, পাণ্ডিত্য ও নিজবোধ — এই ত্রিবেণী সংগমে আপনার বিচার — তার সঙ্গে যুক্ত আপনার রসদিগ্ধশ্রম। সে ক্ষেত্রে আমার কোনো লেখা যদি আপনাকে এতটুকুও স্পর্শ করে থাকে — তবে সে আমার পুরস্কার। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনার দেয় বক্তৃতার নোট্‌স যোগাড় করা আমার পক্ষে অসম্ভব হবে না।

এই চারটি ছিন্নপত্রের প্রাপক মানুষটির পরিচয় সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতে প্রত্যেকেরই জানা, — সম্প্রতি নজরুল পুরস্কারপ্রাপ্ত অধ্যাপক অরুণকুমার বসুর আড়ালে প্রখ্যাত গীতিকার ভাস্কর বসু (জন্ম ১৯৩৩)। উদ্ধৃত চারটি চিঠির প্রাচীনতমের তারিখ ১৯৬৫;

তখন তাঁর বয়স বত্রিশ। আর শেষতম পত্রাংশে কালের হিসাব পাই ১৯৮৭; তখন তিনি পঞ্চান্নর কোঠায়।

অরুণকুমার বসু বিশ শতকীয় প্রজন্মের বুধসমাজে শেষবেলাকার অন্যতম শিক্ষাব্রতী, পূর্ণ সাংস্কৃতিক মানুষ। জানা এবং জানানোয়, শেখা এবং শেখানোয় এই সত্তর পার করা বয়সেও তিনি অক্লান্ত। তাঁর প্রিয় ছাত্র পবিত্র সরকারের লেখা থেকে উদ্ধার করি সে পরিচয়:

> অরুণ বসুকে দেখার আগে থেকেই ভাস্কর বসু নামটা আমাদের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। .... কিন্তু আমি যখন তাঁর কাছে আসি, তখন গীতিকার ভাস্কর বসুর কাছে আসিনি। বঙ্গ বাসী কলেজে বাংলা অনার্স পড়বার দ্বিতীয় বছরের শেষদিকে, ১৯৫৯ সালে, পরীক্ষার মাস চার-পাঁচ আগে মাত্র, এসে পৌঁছোলেন এক তরুণ উজ্জ্বল অধ্যাপক। এসেই আমাদের মুগ্ধ করে দিলেন তাঁর মুখের ভাষার জাদুময় শিল্পে, তাঁর অতি সহজ বন্ধুত্বপূর্ণ স্নেহ, তাঁর ছাত্রদের কাছে টেনে নেওয়ার প্রবল আন্তরিকতায়। .... এমন চৌখস, এমন দীপ্র, এমন চতুর্দিকে ঠিকরে-পড়া আলো ছড়াতে থাকা অধ্যাপক আমাদের কপালে আর জোটেনি। ... আর একটা পরিচয়ও পেলাম তাঁর — গণনাট্য সংঘের এক সময়কার নিষ্ঠাবান কর্মী, সন্দীপ সান্যালের বন্ধু, বেলেঘাটা অঞ্চলে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-আন্দোলনের নেতা। .... ভাস্করদাই সেই শিক্ষক আমার জীবনে, যিনি দেবদূতের মতো এসে শিখিয়েছিলেন পরীক্ষায় প্রশ্নের উত্তর লেখা একটা আলাদা ব্যাপার। .... মাত্র তিন-চার মাসের হাতে-কলমে শিক্ষা, কিন্তু তাতেই অঘটন ঘটল। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স পরীক্ষায় এই বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ল, কী করে যেন প্রথম স্থানটা এই ছাত্রের দখলে চলে এল।...... এই ঘটনার পিছনে সবচেয়ে বেশি দান অরুণদার — এ কথা গলা ফাটিয়ে বলবার জন্য আমি সবসময় তৈরি। .... এম.এ. পাশ করার পর কলেজে আমার প্রথম চাকরির ব্যাপারেও ভাস্করদার জবরদস্ত হাত ছিল।.... এখন পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির কাজে তাঁকে মগ্ন থাকতে দেখি, কী অসম্ভব কাজ করেন, কাজ করতে ভালোবাসেন, প্রতিটি মুহূর্তকে এখনও কীভাবে ব্যবহার করেন, সেইটে দেখি আর অবাক হই।

আমরা অরুণকুমার বসুর যারা ছাত্র বা ছাত্রপ্রতিম গুণগ্রাহী তাঁরা প্রত্যেকেই কম-বেশি তাঁর কাছে ঋণগ্রস্ত। সে ঋণ শিক্ষার, সে ঋণ বহুমাত্রিক অবদানের বৈচিত্র্যময় উজ্জ্বল সাংস্কৃতিক বর্ণচ্ছটার। দক্ষিণীতে গান শিখেছিলেন বলে কিংবা চমৎকার হারমোনিয়াম বাজাতে পারেন বলেই শুধু নয়, পারিবারিক ঐতিহ্যসূত্রেই তাঁর ধমনিতে প্রবাহিত সংগীত ও চারুকলার যুক্তবেণি। যেমন বাক্‌শিল্পী তেমনি অসাধারণ পত্রশিল্পী। বিচিত্র ধরনের কত যে কাজ করেছেন!

কর্মজীবনে বহু অন্যায়-অবিচার ষড়যন্ত্র ও যন্ত্রণার শিকার হয়েও কোনো ক্ষেত্রেই আপোস করেননি তিনি। দৃঢ়চেতা আদর্শবান নীতিনিষ্ঠ শিক্ষক হিসাবে পঠন-পাঠনের জগতে একালেও 'রোল মডেল' হিসাবে গৃহীত হতে পারেন। সহস্রাব্দের প্রারম্ভে অরুণাদর্শে ব্রতী জ্ঞানপিপাসু সুস্থ সংস্কৃতিমনস্ক মানুষ নির্দ্বিধ ঘোষণা করতে পারেন 'অরুণ চরণে চল'!

আরুণির পরের কথা

১৯৯৯ সালের ৮ অক্টোবর শিশির মঞ্চে অরুণকুমার বসুকে তাঁর ছাত্র-ছাত্রী ও প্রীতিমুগ্ধ অনুরাগীরা বেশ বড়ো-সড়ো একটা সংবর্ধনা দানের আয়োজন করেছিলেন। আমন্ত্রণপত্রে তাঁরা লিখেছিলেন :

> অধ্যাপক অরুণকুমার বসু একালের এক শ্রদ্ধেয় শিক্ষক। কেবল শিক্ষক নন অরুণ বসু, তাঁর আছে অন্য এক সত্তা — ভাস্কর বসু, যিনি কবি, গীতিকার, গীতিনাট্য রচয়িতা। স্বনামে নিহিত আছে এক নিরলস গবেষকের পরিচয়, যাঁর ধ্যানের কেন্দ্রে আছেন রবীন্দ্রনাথ, এই মানুষটি নিঃশব্দে অবসর নিয়েছেন, কিন্তু তাঁর জ্ঞানচর্চার উৎসাহ ম্লান হয়নি, নিঃশেষ হয়নি তাঁর ছাত্রবাৎসল্য।

সেদিন তাঁর বহু-বর্ণে উজ্জ্বল কর্মজীবনকে স্বীকৃতি জানাতে প্রকাশিত হয়েছিল সাড়ে তিন শতাধিক পৃষ্ঠার *আরুণি*। *আরুণি* তার কর্মনিষ্ঠায় উদ্দালক হয়েছিল। আর সেই বিচিত্র কর্মের পরিচয় দানে গ্রন্থটি সম্পাদনার গুরুদায়িত্ব পালন করেছিলেন অরুণকুমারের প্রিয়-শিষ্য পবিত্র সরকার। পঁয়ষট্টি অতিক্রান্ত জীবনছোঁয়া সময়ের অনুপুঙ্খ হিসাব-নিকাশে *আরুণি* অরুণ-রাগ রঞ্জিত। শিশির মঞ্চে সেদিন অনেক বিদগ্ধ বক্তাই কামনা করেছিলেন তাঁর সক্রিয় আনন্দময় দীর্ঘজীবন।

গত ২৩ মার্চ ২০০৩ সালে অরুণকুমার জীবনের সত্তরটি বসন্ত পার করলেন নিঃশব্দে। শেষের এই ক'বছরে শারীরিক বাধাবিপত্তি যত বেশি তীব্র হয়ে উঠেছে ঠিক ততটাই কঠিন কর্মময় হয়ে উঠেছে তাঁর প্রাত্যহিকতা। মুখ্য সম্পাদক হিসাবে কেবল মানিক বা নজরুল রচনাবলীর মহাযজ্ঞ নয়, তাঁর নিভৃত স্বক্ষেত্র রবীন্দ্রচর্চায় মগ্ন থেকেও উপহার দিয়েছেন মননসমৃদ্ধ বেশ কিছু লেখা ও ভাষণ। এ ক্ষেত্রে যে ধারাবাহিক অভিনব কর্মটি করে চলেছেন তা হল রবীন্দ্র-অনুরাগী মনীষীদের রবীন্দ্রভাবনার মূল্যায়ন। অজিতকুমার চক্রবর্তী চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমথনাথ বিশী জগদীশ ভট্টাচার্য থেকে শুরু করে সুকুমার সেন ভূদেব চৌধুরী পর্যন্ত যার বিস্তার। আর প্রতিনিয়ত অজস্র বক্তৃতার মধ্যে তাঁর শ্রেষ্ঠ ভাষণটিও প্রদত্ত হল সম্প্রতি। বিশ্বভারতীর আহ্বানে শান্তিনিকেতনের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যময় প্রার্থনামন্দিরে বর্ষশেষ (১৪০৯) সন্ধ্যায় আচার্যের অভিভাষণ। গুরুত্ব দিয়ে সংবাদটি পরিবেশিত হয়েছিল আনন্দবাজার পত্রিকায়। পার্থ বসু চমৎকারভাবে লিখলেন সারকথাটি :

> 'নববর্ষ এল আজি দুর্যোগের ঘন অন্ধকারে'। শান্তিনিকেতনে বর্ষশেষের সন্ধ্যায় উপাসনা-মন্দিরে অরুণকুমার বসু সেই দুর্দিনের নান্দীপাঠ করলেন। শঙ্কার যে কৃষ্ণাতপ সারা বিশ্বকে আচ্ছন্ন করেছে, সেই সময়ে এক মহাযুদ্ধ, এবং আসন্ন আর-এক মহাসমরের অভিজ্ঞতায় ক্লিষ্ট কবির বচন আজও যে কত প্রাসঙ্গিক সে কথা মনে পড়ে গেল।

টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের মুখপত্র রবীন্দ্রভাবনায় (এপ্রিল-জুন ২০০৩) ভাষণটির মুদ্রিত রূপ আগ্রহীদের চোখে পড়েছে নিশ্চয়।

আরুণি-র একটি লেখায় জগদীশ ভট্টাচার্য তাঁর প্রিয় শিষ্য সম্পর্কে আফসোস করেছিলেন, তথাকথিত অবসরপ্রাপ্ত জীবনে 'তার কাছে একটা বড়ো গ্রন্থের প্রত্যাশা কি ব্যর্থ

হবে?' গুরুর এই প্রত্যাশা পূরণ করলেন তিনি পরিণত বয়সেই। শতবর্ষে অরুণালোকিত হল নজরুল জীবন ও সাহিত্যের অখণ্ডিতরূপ।

কয়েক বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রম ও ধীমান আয়াসের তন্নিষ্ঠতার ফলস্বরূপ ২০০০ সালে আমরা পেলাম অরুণকুমার বসু প্রণীত সুবৃহৎ *নজরুল-জীবনী*। সুসমালোচক অভিনন্দন জানালেন এই বলে :

> শ্রীবসুকে নজরুলের বস্‌ওয়েল বা বাণভট্ট বলা যাবে কিনা বাংলার পাঠক ও গবেষকবৃন্দ তার বিচার করবেন। তবে তিনি বলতেই পারেন 'বর্ত্ম কর্ষতি পুরঃপরমেক/ স্তদ্‌গতানুগতিকো ন মহার্ঘ্যঃ'। শ্রীবসু এ পথের একলা পথিক না হলেও অন্যতম প্রধান প্রদর্শক সে বিষয়ে সন্দেহ করার কোনো কারণ নেই। মুজফ্‌ফর আহমেদ সাহেবের অসাধারণ রচনা *কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা* (১৯৬৫) শেখ দরবার আলমের *অজানা নজরুল* বা রফিকুল ইসলামের *কাজী নজরুল ইসলাম জীবন ও সৃষ্টি* এবং নজরুল সম্পর্কে একাধিক অনুরাগ ও বীতরাগ মূলক লেখার কথা মাথায় রেখেই এমন মন্তব্য করলাম। নজরুল জন্মশতবর্ষে উভয়বঙ্গের অনেক উদ্দীপিত অনুষ্ঠানের অন্তরালে থেকে একাগ্র অভিনিবেশ ও গবেষণায় অরুণকুমার বসু শতবর্ষের কঠিনতম দায়িত্ব পালন করে শ্রেষ্ঠতম উপহার নজরুলপ্রেমী পাঠকদের হাতে তুলে দিয়েছেন। তৃপ্ত বাঙালি পাঠক তাঁকে অনন্তকাল ধরে সাধুবাদ জানাবে।

আসলে অরুণকুমার তাঁর গুণমুগ্ধদের চোখে কৌতুকের ধুলো দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথে নিবেদিত যে 'অরুণনয়ন' আমাদের 'মরম সঙে' ছিল তা শেষ পর্যন্ত 'নয়নভুলানো' হয়ে এলো নজরুলজীবনীতে। সকলের প্রত্যাশা ছিল, এমনকি অপেক্ষা ছিল জগদীশ ভট্টাচার্যেরও যে বিশেষজ্ঞ হিসাবে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত চমৎকার সুবৃহৎ কোনো গ্রন্থ তাঁর কাছ থেকে পাওয়া যাবে। পরিবর্তে আমরা পেলাম জীবনী সাহিত্যের এক মহাগ্রন্থ। মধুসূদন যেমন অল্পবয়সে বাইরে কাব্যচর্চা ও গোপনে অঙ্কের মকশো করতেন, অরুণ বসুর রবীন্দ্রচর্চা ও নজরুল অনুসন্ধিৎসা কতকটা সেইরূপ। প্রথম জীবন থেকেই পারিবারিক ঐতিহ্য সূত্রে নজরুল-এ্যাসোসিয়েসনের সঙ্গে যে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল একথা পূর্বে জানা ছিল না অনেকের। *নজরুল-জীবনী*-র উৎসর্গপত্রে যে ইঙ্গিত আছে। পরবর্তীকালে নিজে প্রসিদ্ধ গীতিকার ও সংগীত বিশেষজ্ঞরূপে নজরুল-গীতির বিশুদ্ধতা রক্ষায় ও যাথার্থ বিচারে আপোসহীন মনোভাব ব্যক্ত করতেন নানা প্রসঙ্গে। দীর্ঘদিন ধরে নজরুল সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ অনুসন্ধান পড়াশোনা ছিল অনেকটা গোপনচারী। বিষয়টা ফাঁস করে দিলেন তাঁর যৌবনের বন্ধু প্রবীণ কবি বিতোষ আচার্য একটি কবিতায় :

> হালকা চালে বলে যেতে অতলান্ত অভীপ্সার কথা
> রবীন্দ্র-নজরুল থেকে সলিলের গানের ভুবনে
> অনায়াস যাতায়াত সে বয়সে সতেজ মননে
> সেই চল্লিশের শেষে। তখন অবাক ব্যাকুলতা
> সংশয় এনেছে স্বপ্নে : গোধুলির কাছে যত ঋণ
> না শুধে কি পলাতক? —

(অনুজ অরুণ)

অরুণ বসু অন্তত 'রবীন্দ্র-নজরুল' থেকে যে পলাতক হননি তার প্রমাণ তাঁর নজরুল পুরস্কার প্রাপ্তি এবং কবিতীর্থ শান্তিনিকেতনের উপাসনাগৃহে আচার্যপদে বৃত হয়ে ভাষণদানের অধিকার লাভ।

অরুণ বসুর নজরুলচর্চা প্রকাশ্যে এল কবির জন্মশতবর্ষে যখন তাঁর কাছ থেকে পাওয়া গেল 'বিভ্রান্তি-বিলাস' মুক্ত নজরুল-জীবনের প্রামাণ্য দলিল। ২০০০ সালের জানুয়ারী মাসে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি থেকে *নজরুল-জীবনী* প্রকাশিত হলে অধ্যাপক গীতিকার রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ প্রভৃতি পরিচয়ের সঙ্গে তাঁর আর একটি পরিচয় ক্রমশ বড়ো হয়ে উঠেছে, তিনি কাজী নজরুল ইসলামের জীবনীকার — নজরুল বিশারদ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ এবং পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি ২০০২ সালে অরুণকুমার বসুকে নজরুল পুরস্কারে ভূষিত করে শুধু তাঁর মহৎ কর্মকেই স্বীকৃতি দেননি, তাঁর লেখা *নজরুল-জীবনী*-র মত যথোপযুক্ত গ্রন্থকে সম্মানিত করে কবি নজরুল ইসলামের অগণিত পাঠক ও ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ করেছেন। শ্রীবসুর এই পুরস্কার প্রাপ্তিতে সকলেই যে খুশি হয়েছেন এবং তাঁর লেখা গ্রন্থটি যে সকলের কাছে সাদরে গৃহীত হয়েছে তার বড়ো প্রমাণ এই উপলক্ষে তাঁকে প্রদত্ত সংবর্ধনার বহর। ২০০০ সালে *নজরুল-জীবনী* প্রকাশিতহওয়ার অব্যবহিত পরেই 'নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন'-এ জীবনীকারকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। ২০০১ সালে 'আবৃত্তি আকাদেমি'র স্মারক অভিনন্দন ছাড়াও 'দি পি. ই. এন. প শ্চিমবঙ্গ'-এর অভিনন্দন স্মারক(৩০ মার্চ ২০০১)। পরবর্তী স্মারক সংবর্ধনাগুলি যথাক্রমে হল :

১. ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটি
২. পাবলিশার্স অ্যাণ্ড বুক সেলার্স গিল্ড্ (বিশ্ব বই দিবস উপলক্ষে বিশেষ এই সম্মান স্মারকটি পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য অরুণ বসুর হাতে তুলে দেন ২৩ এপ্রিল ২০০২ তারিখে।)
৩. ২৬ মে ২০০২ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ কর্তৃক নজরুল ইসলামের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে নজরুল পুরস্কার প্রদান। নজরুল মঞ্চে উচ্চশিক্ষামন্ত্রী শ্রীসত্যসাধন চক্রবর্তী শ্রীবসুর হাতে পুরস্কার তুলে দেন।
৪. ঢাকুরিয়া পরিতোষ মেমোরিয়াল ভেটারেন্স ক্লাব, ৮ জুন ২০০২।
৫. টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের তরফে স্মারক অভিনন্দন — 'গুরুজন সংবর্ধনা'। ১১ জুলাই ২০০২। স্থান : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি সভাগৃহ।
৬. সুকান্ত জন্মোৎসব কমিটির পক্ষে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় শ্রীজ্যোতি বসু অরুণকুমার বসুর হাতে স্মারক উপহার প্রদান করেন ৮ অক্টোবর ২০০২।
৭. ঢাকুরিয়া বইমেলার (৩য় বর্ষ) স্মারক উপহার (২০০২)।
৮. মহাদিগন্ত পত্রিকা পুরস্কার ২০০৩।

এইসব সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে কিংবা দূরদর্শনের সাক্ষাৎকার থেকে শুরু করে নানা প্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই যে প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছে অরুণ বসুকে, তা হল *নজরুল-জীবনী* কেন লিখলেন? এ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য ছিল খুবই স্পষ্ট। কেবল নজরুল চর্চার নান্দনিক উপভোগ্যতাতে

সন্তুষ্ট থাকার কোনো কারণ নেই; দেশকাল ইতিহাসের প্রেক্ষিতে নজরুলের সাহিত্য-কর্ম ও অবদান যথাযথভাবে নির্ণিত হয়েছিল না বলেই তাঁর বিশ্বাস। অরুণ বসু জানিয়েছেন :

> রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সৃষ্টি উনিশ ও বিশশতকের ঔপনিবেশিক ভারতের জনজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা-ব্যর্থতা-বঞ্চনার ইতিহাসের সঙ্গে কত ওতপ্রোতভাবে সংসক্ত ছিল, তা তাঁর জীবনী পাঠকের অজানা নেই। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অসমতুল হলেও, নজরুলের সাহিত্যসৃষ্টি ও তাঁর অগ্নিক্ষরা অতলাতচক্র অসহযোগ আন্দোলন ও ভারত ছাড়ো আন্দোলনের মধ্যবর্তী বঙ্গেতিহাসের ঘটনা-সংঘাত থেকে স্ফুলিঙ্গ সংগ্রহ করেছিল। .... আবার সংশ্লিষ্ট কবি সাহিত্যিকের জীবনাবসানে দেশের পরিবর্তিত রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রেক্ষিতে তাঁদের সৃষ্টিসম্ভার লাভ করেছে অভিনব মাত্রা।.... নজরুলের সাহিত্য-জীবনের ইতিহাস অবিভক্ত বঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তুলনায় ভিন্ন পথ ধরেছিল। তিরিশের দশকে নজরুল তাঁর সৃষ্টিতরঙ্গের উপর সংগীতের বাঁধ নির্মাণ করে দিলেন। বন্দী নদী শুধু গীতরসিকদের সেচের পক্ষেই অপরিহার্য হল। অন্য ধারাটি অনাবৃষ্টিতে শুষ্ক ক্ষীণস্রোতা হয়ে যেতে লাগল। তারপর প্রতিবেশী রাষ্ট্র পূর্ব-পাকিস্তানের ভাষা আন্দোলনে নজরুলের পুনরুত্থান ঘটল। সেই আন্দোলনের পরিণামেই জন্ম নিল নতুন এক গণপ্রজাতন্ত্রী দেশ। সেই দেশ গড়ে ওঠার রক্তক্ষর সংগ্রামের স্তরে-স্তরান্তরে রবীন্দ্রনাথ-নজরুল উভয়ের রচনা ছিল তার দুর্মর প্রেরণা। তদুপরি স্বাধীন দেশ গঠনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসী পেয়ে গেল শরীরী কবিকেও, যদিও তখন তিনি দেহেই জীবিত মাত্র, বোধে-মননে জড়পদার্থের মতোই। তবু কবি জীবিত আছেন, এই উত্তেজনায় কবি হয়ে উঠলেন প্রতিবেশী রাষ্ট্রের জীবন্ত বিগ্রহ : দেহাবসানের পর চর্চা ও অনুশীলনের নিরন্তর প্রেরণা, কৃতজ্ঞতার অফুরান পরিশোধ।
>
> এপার বঙ্গে প্রথমাবধি নজরুল চর্চা তুলনামূলকভাবে স্তিমিতই ছিল। এমনকী, অবিভক্ত বঙ্গে সুপরিচিত কিছু পণ্ডিতম্মন্য বুদ্ধিজীবী দীর্ঘকাল নজরুলকে অশিক্ষিতপটু স্বভাবকবি, বৈদগ্ধ্যহীন প্রৌঢ় বালক, মাত্রাজ্ঞানহীন পরিমার্জনাহীন আবেগসর্বস্ব কবি বলে অবজ্ঞা উপহার দিয়েছেন।......তবু বিশ শতকের শেষ দশকে নজরুল জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে শুরু হয়েছে আমাদের নিদ্রাভঙ্গ প্রায়শ্চিত্ত, সংঘটিত ঔদাসীন্যের প্রতি ক্রিয়ায় সংগঠিত নজরুলচর্চা, বিস্মরণের ভগ্নস্তূপ সরিয়ে নতুন গৃহভিত্তি নির্মাণ।

সমকালীন আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক ও সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে কালানুক্রমিক ধারাবাহিকতায় কবি নজরুল ইসলামের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনীর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অরুণকুমার বসু আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। কিন্তু আসল কথা হল নজরুলচর্চায় 'নতুন গৃহভিত্তি নির্মাণ'। *নজরুল-জীবনী* লিখে তিনি নিজেই সেই মহৎ কর্মটি করে দিয়েছেন।

অরুণ রাঙা চরণ ফেলে

অরুণকুমার বসুর একটা পরিচয় গীতিকার, কবি ভাস্কর বসু; যেখানে তিনি স্যার সেখানে ছাত্রবৎসল প্রথিতযশা অধ্যাপক; আবার যেখানে অরুণদা সেখানে অস্তিত্বের গভীরে নৈরাজ্য নিয়ে এক বিষণ্ণ বাউল; গবেষকের কাছে রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ, নিভৃতে রবীন্দ্রচর্চায় মগ্ন; সংগীতের জগতে একই সঙ্গে তাত্ত্বিক আবার নিত্যনূতন পরিকল্পনা ও উদ্ভাবনার সংবেদী শিল্পী, গীতিকারিগর। তাঁর পাণ্ডিত্য, লেখনীর সৌকর্য, অসাধারণ বাগ্মিতা বাঙালি

বুধসমাজে তাঁকে স্থায়ী আসন করে দিয়েছে।

অরুণ বসু কাউকেও ফেরান না। যাঁরা তাঁর শ্রেণীকক্ষের ছাত্রছাত্রী নন এমন অজস্র শিক্ষাপিপাসুর বিচিত্র তৃষ্ণা আজও নিবারণ করে চলেছেন প্রবীণ মানুষটি। এই সেদিনও হঠাৎ গিয়ে দেখেছি পঞ্চাশোর্ধ্ব আবৃত্তিকারকে শেখাচ্ছেন রবীন্দ্রকবিতার এইসব ছত্র যথাযথ উচ্চারণ ও স্বরনিক্ষেপে কিভাবে শ্রোতার হৃদয়ে গেঁথে দিতে হবে :

....শক্তি দাও, শক্তি দাও মোরে,
কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী, শিশুঘাতী নারীঘাতী
কুৎসিৎ বীভৎসা-'পরে ধিক্কার হানিতে পারি যেন-

আমেরিকার লোলুপ শক্তিদম্ভের মারণ-লীলা চলছিল তখন ইরাকে। মনুষ্যত্বের নিপীড়নে বেদনার্ত ওই সব রবীন্দ্রকবিতার ছত্র অবলম্বনে অরুণ-কণ্ঠ প্রতিবাদ যেন ঝরে পড়ছে। অবলীলায় বসে যেতে দেখেছি তাঁকে শিশুদের মধ্যে হারমোনিয়মের সামনে। রবীন্দ্রসংগীতের সুর বাজিয়ে গলা মেলান কচি-কাঁচাদের কণ্ঠে। কর্মপ্রাণ মানুষটির বাড়িতে মুহুর্মুহু ফোন আসে, বেশিরভাগটাই নানা প্রশ্নের। -'অরুণদা, রবীন্দ্রনাথের অমুক বিষয়টা কোথায় পাব'। সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর পেয়ে যায় ফোনের অপর প্রান্ত। কিংবা বলেন, 'একটু ধর, দেখে বলছি।' কিংবা 'দু' একদিন পরে খোঁজ নিয়ে জানাব। আর কিছু?' — অর্থাৎ আর কোনো প্রশ্ন আছে কিনা!

এরই মাঝে শারীরিক অসুস্থতাকে উপেক্ষা করে পড়াতে যাচ্ছেন এমন কোনো বিষয় নিয়ে যার অধিকারী একমাত্র তিনিই। কখনও দূরে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে, কখনও ঘরের কাছে রবীন্দ্রভারতীর সংগীত বিভাগে। সকালের ট্রেনে বিশ্বভারতীর আহ্বানে ছুটে যাচ্ছেন শান্তিনিকেতনে। দুপুর গড়ানো বিকালে ছাতিমতলায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ স্মরণে আচার্যের ভাষণ দান করে সন্ধ্যার গাড়িতে ফিরে আসছেন কলকাতায়। কেননা আগামীকাল সকালে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ সেখানে। এমনকি ট্রেনের কম্পার্টমেন্টেই বিশ্বভারতীর উপাচার্যের সঙ্গে নিভৃতে সেরে নিচ্ছেন জরুরি কথাবার্তা।

এইসব ব্যস্ততার মধ্যেও তৈরি হয়ে ওঠে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য 'জলসাঘর' বক্তৃতা : 'রবীন্দ্রসৃষ্টিতে কুমারসম্ভবের শিল্পরূপ'। 'জলসাঘর' সাধারণ কোনো বক্তৃতা নয়, — নাচ গান পাঠ বক্তৃতায় শ্রোতার মন ভরিয়ে দেবার পরিকল্পনা। তার একটি মহড়াও হয়ে যায় টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের একটি অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে। বক্তৃতার স্থান নির্ণয়ে বার বার ছুটে যান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ঠিক হয় আশুতোষ ভবনের ১০নং কক্ষে সে বক্তৃতা হবে। সেখানে টেনে আনেন রবীন্দ্রভারতীর সংগীত-বিদ্যার বিভাগীয় প্রধানকে। বুঝিয়ে দেন নিজের পরিকল্পনা। আবার একই সঙ্গে বেদনায় ক্ষোভে ধিক্কার দিয়েছেন — সমকালের দায়িত্ববোধ হীনতায় শেষ মুহূর্তে নির্দিষ্ট দিনে বক্তৃতাটি না হতে পারায়।

এই হচ্ছে এখনকার অরুণ বসু। অসুস্থ হয়ে ভর্তি আছেন এস.এস.কে.এম. হাসপাতালের উড্‌বার্ন ওয়ার্ডে। শোয়া অবস্থায় সেখানেই দেখছেন প্রকাশিতব্য কোনো লেখার প্রুফ। স্নেহভাজন ডাক্তার-কথাসাহিত্যিক তরুণ অভিজিৎ তরফদারের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বললেন। বিষয় অবশ্যই চিকিৎসা সংক্রান্ত নয় ততটা, যতটা সাহিত্য-সংস্কৃতির। হাসপাতালেই ডেকে

পাঠাচ্ছেন তরুণ কোনো গবেষককে পরবর্তী কর্মপরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করতে। চমৎকার বলেছেন অভিজিৎ জীবন সম্বন্ধে তাঁর সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গি প্রসঙ্গে :

> আমরা তাঁর অসুস্থতা, অসুস্থতাজনিত বিধিনিষেধ সম্বন্ধে ভাবনা করেছি। তিনিস কখনোই অসুখকে তাঁর আরদ্ধ কাজের ওপরে জায়গা দিতে চান নি।.........হাত পা ছড়িয়ে অসুখ অসুখ করে মাথা কপাল চাপড়ান নি।

অনুজ প্রিয়জনের ভাষণ শরৎ সমিতিতে। সেটাও শুনতে যেতে হবে।

— কাল টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটে স্মরণ সভা। না গেলেই নয়। তা ছাড়া *রবীন্দ্রভাবনা*-র পরবর্তী সংখ্যাটি নিয়ে পিনাকীর সঙ্গে জরুরি কিছু কাজও সেরে নিতে চাই।

—পরশু রবিবার, সন্ধ্যায় কি একটু সময় হবে?

—না গো, ওই সময়ে তো আমি ঢাকুরিয়া ক্রিকেট এ্যাসোসিয়েসনের বাৎসরিক সভায় থাকবো। অনেকদিন থেকে যে জুড়ে আছি ওদের সঙ্গে।

—তা হলে?

—ওখানেই চলে এসো। তোমার বাড়ির কাছেই তো।

হ্যাঁ, এইভাবেই স্নেহভাজন কোনো অধ্যাপককে সরবরাহ করছেন রবীন্দ্রনাথের *লিপিকা* সম্পর্কে দুর্লভ সব উপাদান। খোঁজ নিচ্ছেন, গবেষকের থিসিস বাঁধাই হয়ে যথাসময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা পড়ল কিনা।

মাঝে মাঝে ফোন আসে—কাজের কথার। 'তোমার হাতের কাছে *কাশীদাসী* মহাভারত আছে? নেই। তাহলে ছেড়ে দাও।' বা 'শিবরাম চক্রবর্তীর কোন্ কোন্ বই তোমার আছে? পাঠাতে পার?' প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করায় ভানুদার (মিত্র-ঘোষ) নির্দেশের কথা বলেন। *কথাসাহিত্য* পত্রিকায় লিখতে হবে। সেই সূত্রে বলে যান শিবরামের সঙ্গে যোগাযোগের অল্পবয়সের মধুর স্মৃতি; ফিরে আসেন বেলেঘাটার সেই সব সুখের দিনগুলির কথায়।

কিংবা সকালেই ফোন। নজরুল-জীবনীটা হাতের নাগালে আছে?

—আছে।

—খুলে দেখো অমুক পৃষ্ঠা।........কী দেখলে? নজরুলের একটি চিঠির বঙ্গানুবাদ প্রসঙ্গ। তাহলে বাদ তো যায়নি আমার বইয়ে। নজরুল ইসলামের যে ইংরাজি চিঠি গতকাল সংগ্রহ করে এনেছো তা নতুন কিছু নয়। তবে মুল পত্রটি এতদিনে হাতে পাওয়া গেলো। পঞ্চম খন্ডে (নজরুল রচনাসমগ্র) এর ফ্যাক্সিমিলি ছাপিয়ে দিতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির অভিলেখাগারে নিয়মিত কর্মে মগ্ন যে মানুষটিকে পাওয়া যায় তিনি অরুণকুমার বসু। নজরুল রচনাবলীর গুরুদায়িত্ব, মানিক রচনাসমগ্রের যাবতীয় কাজ, সুনির্মল বসুর রচনাপঞ্জি প্রস্তুত. রবীন্দ্রকবিতার নতুন সংকলন, বাঙালি লেখকদের জীবনপঞ্জি নির্মাণ — অজস্র কাজ নিয়ে তিনি আনন্দময়। প্রতিদিনের একটি পরিচিত দৃশ্য:

বাংলা আকাদেমির তিনতলা থেকে স্নেহভাজন কোনো তরুণ গবেষকের কাঁধে হাতের ভরটি রেখে দিনশেষে নেমে আসছেন আজকের অরুণকুমার বসু — অরুণ রাঙা চরণ ফেলে সত্তরের ভাস্কর রাজপুত্র!

২০ ৬.২০০৩

দিব না ভুলিতে

সুদিন চট্টোপাধ্যায়

১৩০৫ বঙ্গাব্দের একটি সংক্ষিপ্ত রচনায় রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করেছিলেন 'বিদ্যাসাগরের বস্ওয়েল্ কেহ ছিল না .... ' এবং তাই 'তাঁহার (বিদ্যাসাগরের) অসামান্য মনস্বিতা ... কেবল অপরিস্ফুট জনশ্রুতির মধ্যে অসম্পূর্ণ আকারে বিরাজ করিবে।' প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার বাংলার স্বাধীন নৃপতি শশাঙ্ক সম্পর্কেও একই রকম আক্ষেপোক্তি করেছিলেন, 'বাণভট্টের মত চরিত-লেখক ... থাকিলে হয়ত হর্ষবর্ধনের মতই তাঁহার (শশাঙ্কের) খ্যাতিও চতুর্দিকে বিস্তৃত হইত। কিন্তু অদৃষ্টের নিদারুণ বিড়ম্বনায় তিনি স্বদেশে অখ্যাত ও অজ্ঞাত ...।' নজরুল সম্পর্কেও একই কথা বোধহয় বলা যায়। একজন উপযুক্ত বসওয়েল বা বাণভট্টের অভাবে নজরুলের জীবনের অনেক কথা বাঙালি তথা বিশ্বের কাছে অজ্ঞাত ও অবিন্যস্ত রয়ে গেল। তাঁর রৌদ্রদগ্ধ জীবন, মধ্যাহ্নের খরতাপেও অবিচলিত আবেগ, সঙ্কল্পে কঠোর মন, তীব্র ও গভীর আত্মসম্মানবোধ, অহংকারহীন অভিমানী হৃদয়, ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে আপসহীন সতত উদ্যত বিদ্রোহী লেখনী, তাঁর কর্মময় সৃষ্টিচঞ্চল সত্তা, নীড়হারা পাখির কুলায় ফেরার মতো তাঁর প্রেমের ব্যাকুলতা, গোধুলি গগনের বিলীয়মান আলোর মতো তাঁর জীবন-সায়াহ্নের রোগকাতর অস্থির প্রহরগুলির যথাযথ ইতিহাস ও বাস্তব ভিত্তিক বিবরণ আমাদের কাছে খুব সহজলভ্য নয়। বঙ্কিমের দুঃখ করার যথেষ্ট কারণ ছিল। সাহেবরা পাখি মারলেও তার ইতিহাস লেখা হয়। অথচ বাঙালির বাংলার ইতিহাস নেই। নজরুলের মতো কবি, কথাকার, সাংবাদিক, দেশপ্রেমী, বিদ্রোহী যোদ্ধার জীবনবৃত্তান্ত সমকালের ও একালের বুদ্ধিজীবীদের অনাগ্রহ ও অমনোযোগের কারণে আচ্ছন্ন ও ধুসর হয়ে রইল। যশস্বী গবেষক ও লেখক শ্রীঅরুণকুমার বসুর প্রায় ছশো পৃষ্ঠার নজরুল জীবনী গ্রন্থখানি অভিনিবেশ-সহ পড়তে পড়তে মনে হল তিনি নজরুল সম্পর্কে আমাদেব এই গ্লানিবোধ ও বেদনার যথার্থ উপশম ঘটিয়েছেন। অসামান্য আন্তরিকতা ও নিরবিচ্ছিন্ন নিষ্ঠার সঙ্গে ঘটনা ও সৃষ্টির পারম্পর্য এবং সময়ানুক্রমের ঐতিহাসিকতায় অবিচল থেকে তিনি প্রায় এক অখণ্ড *নজরুল জীবন* আমাদের উপহার দিয়েছেন। শ্রীবসুকে নজরুলের বস্ওয়েল বা বাণভট্ট বলা যাবে কিনা বাংলার পাঠক ও গবেষকবৃন্দ তার বিচার করবেন। তবে তিনি বলতেই পারেন 'বর্ত্ম কর্ষতি পুরঃ পরমেক / স্তদ্গতানুগতিকো ন মহার্ঘ্যঃ।' শ্রীবসু এ পথের একলা পথিক না হলেও অন্যতম প্রধান প্রদর্শক সে বিষয়ে সন্দেহ করার কোনো কারণ নেই। মুজফ্ফর আহ্মদ সাহেবের অসাধারণ রচনা কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা (১৯৬৫), শেখ দরবার আলমের অজানা নজরুল বা রফিকুল ইসলামের কাজী নজরুল ইসলাম জীবন ও সৃষ্টি এবং নজরুল সম্পর্কে একাধিক অনুরাগ ও বীতরাগ-মূলক লেখার কথা মাথায় রেখেই এমন মন্তব্য করলাম। নজরুল জন্মশতবর্ষে উভয় বঙ্গের অনেক

উদ্দীপিত অনুষ্ঠানের অন্তরালে থেকে একাগ্র অভিনিবেশ ও গবেষণায় অরুণকুমার বসু শতবর্ষের কঠিনতম দায়িত্ব পালন করে শ্রেষ্ঠতম উপহার নজরুল-প্রেমী পাঠকদের হাতে তুলে দিয়েছেন। তৃপ্ত বাঙালি পাঠক তাঁকে অনন্তকাল ধরে সাধুবাদ জানাবে।

সারস্বত সাধনার সহজাত বিনয়ে অরুণবাবু অবশ্য বলেছেন 'এই জীবনীটি নতুন কোনো স্পর্ধা নয়, কোনো নতুন তথ্যে সমৃদ্ধ নয়, কেবল একাধিক, জ্ঞাত-বর্ণিত-পঠিত জীবনীর পুনরুক্ত ও পুনর্বিন্যস্ত খসড়া মাত্র।' কিন্তু গ্রন্থ পাঠ সমাপ্ত হলে আমরা বিস্মিত ও মুগ্ধ হই এই কারণে যে, লেখক নিরাবেগ নিষ্ঠা ও ঐতিহাসিকের দৃঢ়তা নিয়ে নজরুল জীবনের জটিল ও বিক্ষিপ্ত সময়ানুক্রমকে সারণীবদ্ধ করেছেন এবং তাঁর বহুমাত্রিক সৃষ্টিকে তাঁর কখনও চঞ্চল, কখনও-বা বিচ্ছিন্ন জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ও সাঙ্গীকৃত করে বিবেচনা করেছেন।

কিঞ্চিতধিক সাতাত্তর বছরের জীবন কাজী নজরুল ইসলামের। জন্ম ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ২৪ মে, তিরোধান ১৯৭৬-এর ২৯ আগস্ট। প্রথম কুড়িবছর ছেড়ে দিলে তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির সময়কাল মাত্র বাইশ-তেইশ বছরের। তাঁর প্রথম মুদ্রিত রচনা মাসিক পত্রিকা *সওগাত* এর ১৯১৯ মে-জুন সংখ্যায় বেরিয়েছিল — 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী', করাচির সেনাছাউনি থেকে লেখাটি তিনি পাঠিয়েছিলেন। ১৯৪২-এর গুরুতর জাতীয় সংকটের দিনগুলিতে তাঁর কলম ও কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে যায়। তারপর চৌতিরিশটা বছর তিনি বেঁচে থাকেন নির্বাপিতপ্রায় দীপশিখার মতো রোগের অশেষ দাহ ও যন্ত্রণা বুকে নিয়ে। নির্বাক এবং স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার আগে তাঁর শেষ কবিতা সংকলন *নির্ঝর* ১৯৩৮-৩৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। নজরুলের প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত সমস্ত রচনা খুঁজে পাওয়া গেছে এবং তার পঞ্জীকরণ হয়েছে এমন দাবী কেউ না করলেও এ পর্যন্ত প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুসারে তিনি প্রায় আড়াই হাজার গান, কবিতা আটশোর মতো, গল্প আঠারো, উপন্যাস তিনটি, প্রবন্ধ আলোচনা ভাষণ সব মিলিয়ে প্রায় একশোটি এবং নাটক-নাটিকা-গীতিকাব্য ইত্যাদি প্রায় তিরিশটির স্রষ্টা। এর মধ্যে অনেকগুলি বিভিন্ন সময়ে নানা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, গ্রন্থাকারেও বিন্যস্ত হয়েছে অনেক লেখা।

নজরুলের বাল্য ও কৈশোর জীবন খুব আনন্দময় ছিল না। 'চুরুলিয়ার গৈরিক মাটি, তপ্ত হাওয়ার' মতো অনাদর অবহেলায়* তিনি মানুষ হয়েছিলেন। পিতৃবিয়োগ হয়েছে শৈশবে, কিন্তু তাঁর উদ্বেলিত স্মৃতির স্পর্শ নেই নজরুলের কোনো রচনায়। মায়ের প্রতি ছিল তাঁর গভীর অভিমান। শৈশব-কৈশোরের বার বার পড়তে গেছেন মক্তব মাদ্রাসা, স্কুলে, পড়া ছেড়েছেনও দারিদ্র্যে অভিমানে ঔদাসীন্যে। কাকভোরে শীতে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে মসজিদে গেছেন ধর্ম সাধনার আকুলতায় নয়, ক্ষুধাতুর পেটের অন্ন সংস্থানে। লেটোর দলে ভিড়ে তেপান্তরের মাঠে মাঠে গান গেয়েছেন। শব্দহীন সুদূর নক্ষত্রের পানে চেয়ে চেয়ে রাতের পর রাত অপটু কবিতা রচনা করেছেন শব্দ আর ছন্দের সঙ্গে মিল মিলিয়ে। কিন্তু স্নেহের বুভুক্ষায় বিদীর্ণ হয়েছে অভিমানী কিশোরের বক্ষতল। 'পথচারী' কবিতায় তাঁর চিরচঞ্চল কৈশোরের এতদিনের অকথিত বেদনা কান্না

হয়ে ঝরে পড়েছে :

জননীরে ভুলি যে পথে পলায় মৃগশিশু বাঁশি শুনি,
যে পথে পলায় শশকেরা শুনি ঝরনার ঝুনঝুনি,
পাখি উড়ে যায় ফেলিয়া কুলায় সীমাহীন নভোপানে,'

সেই পথেই গিয়েছেন তিনি — একা, আশ্রয়হীন, আনন্দহীন, স্নেহ-মায়া বঞ্চিত এক বালক পলাতক জীবনে যেন অদৃশ্য হয়ে যেতে চেয়েছে :

'সেই পথ ধরি পলাইনু আমি। সেই হতে ছুটে চলি
গিরি দরী মাঠ পল্লির বাট সোজা বাঁকা শত গলি।'

নজরুল জীবনের আর একটি দিক দ্বন্দ্ব ও দ্রোহে অগ্নিবলয় সৃষ্টিকারী, বিপ্লবের স্পর্ধায় বেপরোয়া। সাহিত্য ও সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী শাণিত, তীব্রতম আঘাতে উদ্যত। তিনিই প্রথম বাঙালি লেখক 'যিনি ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে কলম ধরে কারাবরণ করেছেন।' তিনি বাঙালি মধ্যবিত্তের সীমানা ও বন্ধন চূর্ণ করেছেন অবলীলায়। তিনি মাটির ধুলোয় মিশে থাকা মানুষকে তুলে এনেছেন তাঁর সাহিত্যের পাতায়। সাধারণ জীবনকে দিয়েছেন এক অভিনব অভিব্যক্তি, মহনীয় মাধুর্য। মানুষের শ্বাস, শ্রম ও স্বেদ জড়িয়ে আছে তাঁর সৃষ্টিতে। তাই *লাঙল* পত্রিকার শীর্ষে তিনি কবি চণ্ডীদাসকে উদ্ধৃত করেন, 'শুনহ মানুষ ভাই — / সবার উপরে মানুষ সত্য / তাহার উপরে নাই।' সে কেবলমাত্র অলংকার সর্বস্বতা নয়, তাঁর জীবনে ও অনুভবে সর্বাধিক বরণীয় সত্য। পরে আপন কণ্ঠস্বরেই বলেন 'মানুষের চেয়ে বড় কিছু নহে / নহে কিছু মহীয়ান।' এই পর্বে সাহিত্যসৃষ্টিতে ও সাংবাদিকতায় কবি নজরুল সচেতনভাবে সংগ্রামী, দেশপ্রেমী, প্রগতিশীল, জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতাবাদী, অসাম্প্রদায়িক, অসাম্য ও শোষণ বিরোধী। সমাজ ও রাষ্ট্রীক জীবনের দীর্ঘদিনের সঞ্চিত জড়তা ও স্থিতাবস্থাকে তাঁর উদ্দীপনামূলক রচনার অভিঘাতে ভেঙে চুরমার করে এক অসাধারণ আলোড়ন ও জাগরণ নিয়ে আসেন। মুক্তির বাসনার সঙ্গে নজরুলের নাম মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।

প্রেম ও বিরহ, বিবাহ এবং বৈরাগ্য নজরুল জীবনকে অন্য অনেকের চেয়ে স্বতন্ত্র করেছে। মনের কাছে তিনি পৌঁছতে চাইতেন সোজা সড়ক ধরে, তাই তাঁর ভালোবাসার অভিব্যক্তি ছিল স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। একই কারণে প্রত্যাখ্যান ও অচরিতার্থতার যন্ত্রণাটাও ছিল তীব্র। 'বাজলো ফিরে ভোরের সানাই' গাইতে না গাইতেই নজরুলকে প্রস্তুত হয়ে যেতে হয় 'না মিটিতে সাধ মোর নিশি পোহায়' গাইবার জন্যে। এ নিয়েই তাঁর জীবনে আলো-আঁধারের চরম বৈপরীত্য। ভালোবাসা সব সময়ে কবি-জীবনে আকাশ ভরা উদার আলোর আহ্বান হয়ে ওঠেনি। বরং এর মধ্যেও তিনি দেখেছেন চরম স্বার্থপরতা, দ্বিচারিতা, সংকীর্ণতা ও খামখেয়ালিপনা। তাঁর অন্তরের আবেগ আর ঐশ্বর্য বিধ্বস্ত বিষাক্ত হয়েছে তুচ্ছ ব্যক্তিগত বাসনার কূট বিচারে। 'রহস্যময়ী' নামে একটি কবিতা রচনা করেছিলেন নজরুল। পরে সেটির পরিবর্তিত নাম হয় 'তুমি মোরে ভুলিয়াছ'। কবিতাটি রচনার পটভূমি স্বতন্ত্র হলেও, নজরুলের বিরহ-ব্যথাতুর জীবনের বিলাপ শোনা যায় এর প্রতিটি পঙক্তিতে!

'তুমি মোরে ভুলিয়াছ তাই সত্য হোক!
নিশি শেষে নিভে গেছে দীপালি-আলোক!
সুন্দর কঠিন তুমি পরশ-পাথর,
তোমার পরশ লভি' হইনু সুন্দর —
—তুমি তাহা জানিলেনা!
... সত্য হোক প্রিয়া
দীপালি জ্বলিয়াছিল — গিয়াছে নিভিয়া!'

নজরুল যে অতৃপ্ত থেকেছেন তা নয়। পারিবারিক জীবনের আনন্দ ভালোবাসায় তিনি সিঞ্চিত হয়েছেন। আশালতা বা প্রমীলার প্রেম তাঁর চোখের জল মুছিয়ে দিয়েছে, গিরিবালা, বিরজাসুন্দরীর বুকভরা ভালোবাসা তাঁর মাতৃ-স্নেহ বুভুক্ষা প্রশমিত করেছে। অনেকের বন্ধুত্ব, স্নেহ ও করুণায় তিনি কৃতার্থ হয়েছেন।

খ

এমন বৈচিত্র্যে ভরা বর্ণাঢ্য মানুষটির ইতিহাস-নিষ্ঠ, সময়ানুক্রমিক জীবন-চরিত না থাকাটা আশ্চর্যের এবং পরিতাপের কথা। তিনি যে সময় জন্মেছেন, বেড়ে উঠেছেন এবং সৃষ্টিশীল জীবনস্পন্দনে উদ্বোধিত হয়েছেন তখন স্বদেশে ও বিশ্বে ইতিহাস একের পর এক নতুন অধ্যায় রচনা করে চলেছে। অরুণবাবু অসাধারণ বিশ্লেষণে নজরুলের জীবৎকালের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরেছেন। ঔপনিবেশিক শোষণ এবং তার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য দেশ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা স্বাধীনতার বিশাল কর্মকাণ্ড। অহিংসানীতি, বিপ্লববাদ, অসহযোগ, গান্ধী-নেহরু-সুভাষ। দাঙ্গা-দুঃখ-দেশভাগ, মারী-মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক অবিশ্বাসের ঘনিয়ে ওঠা বিষবাষ্প। অন্যদিকে রাশিয়ায়, চীনে এতদিনের বঞ্চিত মানুষের জেগে ওঠার কাহিনী। ফ্যাসীবাদ, ইউরোপের দেশে দেশে ক্ষুদ্র জাতি-অভিমানের প্রলয়ংকর রূপ, তার মাঝেই আমাদের জাগ্রত বিবেক রবীন্দ্রনাথের ঔদার্য আর মিনতি ভরা কণ্ঠস্বর। দেশ ভাগ হ'ল, দেশ স্বাধীন হ'ল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ক্ষমাহীন ক্ষয় মানুষের ইতিহাসে অনপনেয় গ্লানির চির-চিহ্ন রেখে গেল। অরুণকুমার বসু ইতিহাসের এই জ্বলন্ত সময়ের ঘটনার সঙ্গে নজরুলের সৃষ্টির সম্পর্ক স্থাপন করেছেন এবং প্রমাণ করেছেন তাঁর রচনা 'নিছক সমকালীনতার অভিযোগে মূল্য হারায়নি' একেবারেই। প্রায় দুঃসাধ্য কাজ। কিন্তু অসামান্য নিপুণতায়, অধ্যবসায়ে তিনি একাজ সম্পন্ন করেছেন।

দুঃসাধ্য বলেছি এই কারণে যে নজরুলের যাঁরা অন্তরঙ্গ ছিলেন অথবা তাঁর কাছাকাছি আসার বা থাকার সুযোগ ঘটেছিল তাঁরা তাঁদের স্মৃতি-ধার্য সঞ্চয় থেকে সঠিক বিবরণ সঙ্গত মাত্রায় পরিবেশন করে যাননি। অকারণ আবেগ, আত্ম-প্রশংসার প্রবৃত্তি অথবা নজরুল নিন্দার প্রবণতা এইসব স্মৃতিচারণের ঐতিহাসিক মূল্য লঘু করেছে। শ্রদ্ধেয় ব্যতিক্রম অবশ্যই মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ সাহেবের নজরুল সম্পর্কিত স্মৃতিকথাখানি। অন্য যাঁদের লেখা নজরুল জীবন চরিত রচনায় উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা যেত তাঁদের বক্তব্য তথ্য বিলোপ ও নানা ভ্রান্তিতে ভারাক্রান্ত। নজরুল নিজেও তাঁর সৃষ্টির প্রতি চূড়ান্ত অবিচার করে গেছেন।

তাঁর যে কথা সেই কাজ 'পরোয়া করি না বাঁচি কি না বাঁচি / যুগের হুজুগ কেটে গেলে।' তাই আসক্তিহীন, মমতাহীন অবহেলায় নিজের জীবন ও সৃষ্টিকে অনাদৃত উত্তরাধিকারের মতো নিক্ষেপ করে গেছেন পরবর্তীদের কাছে। রেকর্ড কোম্পানি, অল ইণ্ডিয়া রেডিও, বেতার জগতের সঙ্গেও তিনি জড়িত ছিলেন। এরাও তাঁর সময় ও সৃষ্টির ধারাবাহিক ঐতিহাসিকতা রক্ষায় প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব পালন করেনি মোটেই। দেশ দ্বিখণ্ডিত ও স্বাধীন হওয়ার পর পূর্ব প্রান্তের পাকিস্তানে, পরে বাংলাদেশে নজরুল চর্চায়, তাঁর সাহিত্য ও কর্মময় জীবনের মূল্যায়নের এক নতুন পর্ব ও উচ্ছ্বসিত উদ্যোগ শুরু হয় বটে। তবে সেখানেও 'ক্রমান্বয়ে মুক্তবুদ্ধি নজরুলচর্চা ও প্রতিক্রিয়াশীল নজরুলচর্চা দুটি ধারাই একসঙ্গে প্রবাহিত হয়েছে'। উল্লেখ করতেই হয়, এক সময়ে পূর্ব-পাকিস্তানে ইসলামায়নের ঝোঁকে নজরুলের কবিতা থেকে হিন্দু অনুষঙ্গের শব্দ বদলে দেওয়া হত। 'শ্মশান' কে করা হত 'গোরস্থান'। কেউ কেউ তাঁকে 'ইসলামী জাগরণের অগ্রদূত' বা পাকিস্তানবাদের প্রবক্তা হিসাবে দেখেছেন, আবার কেউ কেউ তাঁকে 'কাফের শয়তান ইত্যাদি অ্যাখ্যা' দিতেও কুণ্ঠিত হননি। তবু একথা সতত স্বীকার্য যে বিভাগোত্তর বাংলার পূর্বাঞ্চলেই যথার্থ সংহত নজরুল চর্চা হয়েছে এবং প্রকৃত প্রগতিশীল, মানবতাবাদী, বিদ্রোহী নজরুলকে উভয় বঙ্গ তথা বহির্বিশ্বে পরিচিত করিয়ে দেওয়ার ব্যাপ্ত আয়োজন তাঁরা যথাযথ নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার সঙ্গে করেছেন।

গ

শ্রীঅরুণকুমার বসু কাজী নজরুল ইসলামের জীবন, সৃষ্টি ও কর্ম-সাধনাকে ছোটো বড়ো পঁয়তাল্লিশটি অধ্যায়ে ভাগ করে নিয়েছেন। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯১৮ অর্থাৎ জন্ম থেকে তাঁর কৈশোর সমাপ্তি ও যৌবনে প্রবেশ পর্যন্ত মোটামুটি উনিশ বছরের কালপর্ব ছ'টি অধ্যায়ে বিভক্ত। মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর সম্বিৎহারা নির্বাক শেষ সময়ের ছায়াচ্ছন্ন জীবন অর্থাৎ ১৯৪২ থেকে ১৯৭৬ পর্যন্ত শেষ অধ্যায়ে 'রণক্লান্ত বিদ্রোহী'-তে বিবৃত হয়েছে। বলাই বাহুল্য জীবনীকার নজরুল জীবনের প্রারম্ভ ও সমাপ্তি পর্বের চেয়ে মধ্যবর্তী সময়ের কর্মময় সৃষ্টিশীল নজরুলকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই ১৯১৭-১৮ থেকে শুরু করে ১৯৪১-৪২ পর্যন্ত প্রসারিত নজরুল জীবনকে আটতিরিশটি অধ্যায়ে বিধৃত করা হয়েছে। বছরে বছরে, কখনও বা একই বছরের জন্যে একাধিক অধ্যায় সংরক্ষণ করে নজরুলের স্বপ্ন ও সৃষ্টির ভুবনের পরিবর্তনময়তাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। সময়ের ক্রমের সঙ্গে নজরুলের রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনা, কাজকর্ম, প্রতিবাদ প্রতিরোধ আন্দোলন, কারাবাস, ব্যক্তিগত জীবনের বিয়োগ বিধুরতা ও সাহিত্যচর্চার সাযুজ্য ও সমীপবর্তিতা স্থাপন করে লেখক নজরুলের এই জীবনীখানিকে যথার্থই সমৃদ্ধ ও পরবর্তী পাঠককুলের গবেষণার অতি প্রয়োজনীয় উপাদানে পরিণত করেছেন। নজরুল জীবনের ধারাবাহিক এবং কালানুক্রমিক পুনর্গঠন অত্যন্ত জরুরি ছিল। প্রয়োজন ছিল তাঁর মানস পরিবর্তনের দিক্‌চিহ্নগুলি যথাযথ সনাক্ত করা। উভয় কাজেই লেখক অসাধারণ আন্তরিকতা ও যুক্তিবোধের পরিচয় রেখেছেন। রফিকুল ইসলামের বহু আলোচিত *কাজী নজরুল ইসলাম জীবন ও সৃষ্টি গ্রন্থে* এই পুনর্গঠনের প্রস্তাব এবং আশ্বাস থাকলেও তা সর্বত্র অনুসৃত হয়নি। রফিকুলের অসম্পূর্ণতার

অনেকটাই মোচন হয়েছে বর্তমান গ্রন্থটিতে। ইতিপূর্বে এ জাতীয় কাজে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছেন শ্রদ্ধেয় প্রশান্তকুমার পাল তাঁর *রবিজীবনী গ্রন্থগুচ্ছে*। ঠাকুরবাড়ির বংশ বিবরণ ও দেশকালের প্রাসঙ্গিক পরিচয় বিধানের পর রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রতিটি বছরের কালসীমাকে এক একটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছেন তিনি। প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে অতিরিক্ত এবং প্রাসঙ্গিক তথ্য নির্দেশ করেছেন, আবার কখনও কখনও পরিশিষ্ট যোগে রবীন্দ্রনাথের জীবনকথাকে পূর্ণতা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। রবীন্দ্রজীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাবলী এইভাবে সন তারিখের সীমানায় বেঁধে ফেলার ফলে তাঁর জীবন ও সাহিত্য নিয়ে বিচার-বিভ্রাট এড়ানো অনেকটাই সহজ হয়ে গেছে। প্রশান্তবাবুর কাজ অনেক বড়ো মাপের, বিরাট ক্যানভাসে তা ছড়ানো। *নজরুল জীবনী* তার সঙ্গে সর্ব অর্থে হয়তো তুলনীয় নয়। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের জীবন ছিল সুশৃঙ্খল, নিয়ন্ত্রিত। তাঁর বই, কাগজপত্র, চিঠি অনেক উপাদান সহজলভ্য। সেদিক থেকে নজরুল ছিলেন যাযাবর বাউণ্ডুলে। তাঁর দিনযাপনের ঠিক-ঠিকানা ছিল না। কাগজ-কলম, বইখাতা, চিঠিপত্র সবই ছড়ানো ছিটানো। একরাশ অবিন্যস্ত চুল ও একমুখ অট্টহাসিতে চৌচির হয়ে যিনি সরল শিশুর মতো চেঁচিয়ে উঠতেন 'দে গরুর গা ধুইয়ে', উত্তরকালের স্মৃতিপটে বেঁচে থাকার ব্যাকুলতা ও রোমাঞ্চ ছিল না তাঁর মনে। আর যদি বা থাকতই, অবশিষ্ট অচল জীবনে তা গুছিয়ে তোলার অবকাশ তো তিনি পাননি। তাই শ্রীবসুর কাজ হয়ে উঠেছে অনেক কঠিন।

নজরুলকে নিয়ে যেখানে যত বিতর্ক, মতবিরোধ বা অসংলগ্নতা ছিল শ্রীবসু তা প্রাপ্ত তথ্যের নিপুণ বিশ্লেষণে অবাধ এবং আবেগহীন নিরপেক্ষতায় নিরসনের চেষ্টা করেছেন। একাজে তিনি নজরুল-রচনার প্রণালীবদ্ধ পাঠ, পুনঃপাঠ এবং পরিবর্তিত পাঠ, তাঁর ভাষণ, চিঠিপত্র, তাঁকে লেখা অন্যের চিঠি, স্মৃতিকথা-মূলক রচনা, সেকালের পত্র-পত্রিকা এবং একালের দু-বাংলায় প্রকাশিত নজরুল বিষয়ক নানা ধরনের গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি প্রাথমিক ও আনুষঙ্গিক, উভয় উপাদানেরই যথাসাধ্য সদ্ব্যবহার করেছেন। এক্ষেত্রে একটি উদাহরণই যথেষ্ট। নজরুল জীবনে কুমিল্লা ও নার্গিস-পর্ব বিরক্তি ও বেদনায় ভরা। নানা গ্রন্থে এর নানারকম বর্ণনা ও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। কেউ কেউ হীন মৌলবাদী এবং সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির বশে বিষয়টি দেখেছেন। যিনি সবটুকুই বলতে পারতেন তিনি আকস্মিক নীরব হয়ে গেলেন বলেই তাঁর বিপন্নতা ও বিষণ্ণতার কাহিনী এমন ডালপালা মেলতে পারল। শ্রীবসু প্রাপ্ত সমস্ত তথ্য, চিঠি, কবিতা, গান যুক্তিসিদ্ধ পারম্পর্যে সাজিয়ে একটি নিটোল প্রেক্ষাপট নির্মাণ করেছেন। শেষ সিদ্ধান্ত তিনি উচ্চারণ করেননি বটে, তবে নজরুল-নার্গিস-আলী আকবর খান-বুলবুল ইসলাম-মুজফ্ফর সাহেব-শৈলজানন্দ হয়ে নজরুলের জিজ্ঞাসার সূত্রে এ সত্যে আসা আদৌ কঠিন হয় না 'আমি কি ভুলেও কোনোদিন এসে দাঁড়িয়েছি তব দ্বারে?'

নজরুলের আধ্যাত্মিকতার প্রশ্নেও বেশ কিছু তর্ক এবং প্রতি-তর্কের অবকাশ ছিল। প্রিয় পুত্র বুলবুলের মৃত্যু, স্ত্রীর পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হওয়া ইত্যাদি পারিবারিক দুর্যোগ কবিকে সাময়িকভাবে সাধারণ জীবনের বৃত্তচ্ছিন্ন করে দেয়। তিনি যোগীরাজ বরদাচরণের

আধ্যাত্মিক নন্দন কাননে 'পুষ্পিত পারিজাত' হয়ে ওঠেন। অন্যে যে যাই বলুক না কেন মুজফ্ফর আহ্মদ সাহেব নজরুল ইসলামের এ অবস্থাকে 'ভ্রান্তির শিকারে পরিণত হওয়া' বলে ব্যাখ্যা করেছেন। সুখের কথা এই যে শেষপর্যন্ত তাঁর যুক্তিবোধ মানসিক সংস্কারকে অতিক্রম করে এবং তিনি আবার রাজনৈতিক চেতনা ও মানবিক আদর্শের জগতে ফিরে আসেন। এ পর্বটিও নানা তথ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল নজরুলের রাজনৈতিক আদর্শ, সাংবাদিকতা ও সাহিত্যজীবন সম্পর্কে সমস্ত সাক্ষ্য, তথ্য ও বক্তব্যের অনুপুঙ্খ পরীক্ষা ও বিচার। যেসব পত্র-পত্রিকার পাতায় নজরুল প্রতিভার বিকাশ ও বিস্তার ঘটেছিল, যেগুলিতে তাঁর সম্পর্কে আলোচনা-সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল তার প্রত্যেকটিকে জীবনীকার অকৃপণ ধৈর্যে বিশ্লেষণ করেছেন — *সওগাত, মোহাম্মদী, শনিবারের চিঠি, কল্লোল, কালিকলম, প্রবাসী*, আবার *লাঙল-গণবাণী, ধূমকেতু* ইত্যাদি। যেসব সাহিত্যিক বা অন্য জগতের মানুষ তাঁর নিকট সান্নিধ্যে এসেছেন তাঁরাও এ আলোচনায় হাজির আছেন গুরুত্ব অনুসারে। সজনীকান্ত মোহিতলালের হাত ধরে যে অন্ধকার মেঘের দল এই জ্যোতির্বলয়কে ম্লানতায় ঢেকে দিতে চেয়েছিল, তার বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ বাদ যায়নি। অনিবার্যভাবেই এসেছেন রবীন্দ্রনাথ; নজরুলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের টানাপোড়েন, সাহিত্যে আধুনিকতা প্রসঙ্গে দ্বন্দ্ব-বিরোধ।

বিশাল এ জীবনীগ্রন্থের কলেবর জুড়ে লেখক 'অবিভক্ত' এক নজরুলকে আমাদের দৃষ্টিগোচর করিয়েছেন যিনি *ছোলতান* পত্রিকায় ১৩৩০ বঙ্গাব্দের ২৯ চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত একটি রচনার ' ..... মোছলমান সমাজ তাঁকে চায় অন্যভাবে' .....এর মূর্ত প্রতিবাদ। *ধূমকেতু*-র একাধিক অগ্নিবর্ষী লেখায়, *যুগবাণীতে*, অন্যত্র এবং অন্যান্য কবিতায় তুচ্ছ ধর্মচিন্তা এবং সাম্প্রদায়িক ভেদজ্ঞানকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাই *নওবাহার* পত্রিকা যখন লেখে 'আমাদিগকে ভুলিলে চলিবে না নজরুল অপেক্ষা ইসলাম বড়', তখন নজরুল কিন্তু অনায়াসে, অসন্ত্রস্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করে চলেন :

'তব মসজিদ মন্দিরে প্রভু নাই মানুষের দাবী।
মোল্লা পুরুত লাগায়েছে তার সকল দুয়ারে চাবী।'

এসব কথা স্বতন্ত্র করে বলেন নি অরুণবাবু। নজরুলের জীবন যখন পর্ব থেকে পর্বান্তরে আলোচিত হয়েছে তখন আপনা-আপনি এ সত্য উজ্জ্বল হয়ে ফুটেছে।

ঘ

জীবনীকারের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করে আলোচনার উপসংহারে আসা যাক। ' ... বস্তুতঃ নজরুলের জীবন এবং এই উপমহাদেশের, বিশেষত পূর্ব ভারতের শতবর্ষের ইতিহাস যেন একই মহাগ্রন্থের পাঠান্তর, একই বৃত্তের উপবৃত্তান্ত।' এই বৃত্তান্ত রচনায় শ্রীঅরুণকুমার বসু যে সাহস, সতর্কতা, সততা ও একনিষ্ঠ বিচারবোধের পরিচয় দিয়েছেন তা এককথায় অতুলনীয়। 'মুক্তবুদ্ধি নজরুলচর্চায়' তাঁর এই কাজ একটি অসাধারণ মানবিক দলিল হিসাবে একালে ও ভবিষ্যতে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। সাধারণ পরিবারের সম্বলহীন সম্বিৎহারা একটি মানুষকে নিয়ে টানাটানি, কুৎসা ও কলরব হয়েছে প্রচুর। হারিয়ে গেছে তাঁর লেখার মূল্যবান্

পাণ্ডুলিপি, অনেক চিঠিপত্রের খোঁজ নেই, গ্রন্থস্বত্বের ঠিকানা মেলে না, তাঁর পরিচিত মানুষজনও নিঃশেষ হয়ে আসছেন, তাঁকে 'মুসলিম জাগরণ ও ইসলামী চেতনা'-র কবি বলে খর্ব করার চেষ্টা হয়েছে, হচ্ছেও — এ সমস্তের মধ্যে থেকে ঔদাসীন্য ও ভ্রান্ত বিচারের নির্মমতা মোচন করে শতবর্ষের কবি, 'জনগণের কবি' নজরুলের পূর্ণ জীবনবৃত্তের সঙ্গে সৃষ্টির সাঙ্গীকরণ ঘটিয়ে অরুণবাবু একটি অতি শ্রদ্ধেয় ও ব্যতিক্রমী গ্রন্থ আমাদের উপহার দিলেন। নজরুলের জীবন ও সৃষ্টির পরম্পরা বিচারে, দুই বাংলায় নজরুলচর্চার দিক্ নির্দেশে, একাল ও সেকালে নজরুল মূল্যায়নের বিস্তার ও সীমাবদ্ধতার বিষয়ে সচেতন, নির্মোহ, নিরাবেগ ও প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির এই রচনা আমাদের জীবনী সাহিত্যে মর্যাদাপূর্ণ সমাদর পাবে আশা করা যায়। গ্রন্থশেষে কাজী নজরুল ইসলামের সমুদয় গ্রন্থপঞ্জী এবং উভয় বঙ্গে প্রকাশিত নজরুল বিষয়ক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ তালিকা সংযোজিত করে গবেষকদের তিনি অশেষ উপকার করেছেন। শতবর্ষে নজরুলকে নিয়ে অনেক হৈ চৈ হয়েছে। কিন্তু আর একটি শতবর্ষের কিনারায় তাঁকে বেঁধে রাখার কাজ কোথায় কতটুকু হলো জানি না। সে কাজ করলেন শ্রদ্ধেয় শ্রীঅরুণকুমার বসু ও পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। তাঁদের ধন্যবাদ। 'সন্ধ্যামণি'-র একটি সঙ্গীতে যে কবির অভিমান ঝরে পড়েছিল :

'বলেছিলে ভুলিবে না মোরে
ভুলে গেলে হায়, কেমন করে।'

শ্রীঅরুণকুমার বসুর বইখানি পড়ে তাঁর উদ্দেশ্যে আজ বলতে পারলাম তোমাকে 'দিব না ভুলিতে।'

বঙ্গদর্শন পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধের পুনর্মুদ্রণ

নজরুল : পুনর্নির্মাণের মহৎ চেষ্টা

সুধীর চক্রবর্তী

একেক সময় মনে হয় লালন শাহ্ ফকির আর কাজী নজরুল ইসলাম যেন ভঙ্গবঙ্গে-র অখণ্ড আশ্চর্য এক প্রতীক প্রতিমা। অবশ্য এই দুজন দু কালের মানুষ কিন্তু তাঁদের সমাজ অভিভব ও ভবিতব্য একই রকম। অখণ্ড বঙ্গভূমির সব কিছুই ভাগ হয়ে গেছে কিন্তু ভাগ হয়নি লালন ও নজরুল। দুই বাংলায় এখনও এঁদের ভূমিকা সমাদৃত, দুজনেই দু অর্থে গীতিকার, দুজনের রচনাতে হিন্দু-মুসলিম যুক্ত চৈতন্যের স্ফূরণ এবং দুজনের কপালেই জুটেছে ইসলামিকরণের পরিহাস। তবে পার্থক্যও ব্যাপক। কারণ লালন ছিলেন প্রত্যন্ত গ্রামের নিঃসঙ্গ লৌকিক সাধক, জীবিতকালে কজনই বা তাঁকে জানত? প্রধানত রবীন্দ্রনাথের প্রয়াসে সারস্বত সমাজ তাঁকে পরে জেনেছে। নজরুল কিন্তু জীবিতকালেই ছিলেন জনাদরের বিগ্রহ, দেশের জাগ্রত তারুণ্যের আগ্নেয় উচ্ছ্বাস। দেশকাল সমাজের সমকালীন বিদ্রোহ বিপ্লবে, গানে নাট্যে ছায়াছবিতে, স্ববিরোধ ও উন্মাদনায়, সৃষ্টি ও ধ্বংসের চূড়ায় থাকতেন তিনি। প্রগল্ভ উন্মুখর বেহিসেবি আত্মোন্মত্ত অথচ ভাগ্যের সকরুণ লীলায় শেষ পর্যন্ত নির্বোধ ও নীরব। একই সঙ্গে বাঁশি ও বিষাণের সব্যসাচী নজরুল আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি-সংগীত আবার সব সময় ও ঐতিহ্যের এক বিচিত্র নির্মাণ। বিতর্ক ও জনপ্রিয়তা ছিল তাঁর শিরোধার্য, উষ্ণ অভ্যর্থনা ও গূঢ় নিষ্ক্রিয়তা, দু রকম প্রাপ্তিই ঘটেছে তাঁর জীবন ও রচনা সম্পর্কে। তাঁর জন্ম এক রাষ্ট্রে, সমাধি আর এক রাষ্ট্রে, অথচ সেই দুই রাষ্ট্রের একই ভাষা-আকাশ, একই সাংস্কৃতিক প্রবাহিনী। নজরুল তার মাঝখানে সেতুর মতো।

এহেন নজরুল ইসলামের প্রামাণিক জীবনী রচনা কঠিন এবং ইতিপূর্বে তার যত বিচ্ছিন্ন ও ব্যক্তিক প্রয়াস ঘটেছে তা সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য হয়নি। তার কারণ, তাঁকে ঘিরে সত্যমিথ্যার এত আখ্যান গড়ে উঠেছে, তাঁকে বিচার করা হয়েছে এত প্রান্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে এবং তাঁর সৃষ্টিতে এত হস্তাবলেপ ঘটেছে যে সত্যের অদ্বৈত মূর্তি আজ আচ্ছন্ন। আমাদের নিকট সমকালের (১৮৯৯-১৯৭৬) একজন নিতান্ত চেনা-জানা স্পষ্ট প্রকাশ্য ব্যক্তি কেমন করে যে মিথের ধূসরতায় সুদুর হয়ে গেলেন আমাদেরই অবহেলায় ও অবিমৃশ্যকারিতায় তা ভাবলে বিস্ময়ও হার মানে। এর জন্য তাঁর অসংগঠিত বেহিসেবি স্বভাব, তাঁর ঝোড়ো জীবনযাপন, অপরিমিত সৃজনশীলতা ও অপরিণামদর্শী আচার-আচরণকে দায়ী করাই রেওয়াজ কিন্তু তাতে আমাদের অকর্তব্যের কলঙ্ক ঘোচে কি? তাঁর শেষ ত্রিশ বছরের নীরবতা ও বোধহীনতার কারণে আমরা যথেচ্ছভাবে তাঁকে উপেক্ষা করেছি, অনাদর করেছি, তাঁকে দেশান্তরিত করেছি। তাঁর রচনা সংরক্ষণ করিনি, গানের স্বরলিপি করিনি, রচনার কালক্রম প্রণয়ন করিনি, তাঁর প্রাপ্য অর্থ তাঁকে দেওয়ার ব্যবস্থা করিনি। উল্টে তাঁর সম্পর্কে মিথ্যা কাহিনি, মিথ্যা গুজব মিথ্যা কলঙ্ক রটিয়েছি। তাঁর গানের সুর বিকৃত করেছি, তাতে তানকর্তব্যের ওস্তাদি দেখিয়ে নিজেদের গায়নকে প্রতিষ্ঠা

করেছি, তাঁর বাণীতে নিজের বাণী বসিয়ে দিয়েছি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর রচনার সংস্কার প্রচেষ্টা। পাকিস্তান আমলে তাঁর লেখা 'নবনবীনের গাহিয়া গান সজীব করিব মহাশ্মশান' এমন পঙ্‌ক্তিতে মহাশ্মশানের জায়গায় বসানো হয়েছিল 'গোরস্থান' শব্দটি। ভ্রান্ত দৃষ্টিকোণ, অসত্য ভাষণ, একদেশদর্শিতা সাম্প্রদায়িক মনোভঙ্গি এবং বিকৃত তথ্য পরিবেশনের বহুতর উদাহরণে নজরুল জীবন ও তাঁর রচনা ভারাতুর হয়ে আছে। সেই সব পুঞ্জিত জঞ্জাল সরিয়ে প্রকৃত নজরুল বিগ্রহের মূর্তি গঠন আজ শুধু কঠিন নয়, অলীক প্রস্তাব।

ইংরিজিতে যাকে বলে 'স্ট্যান্ডার্ড বায়োগ্রাফি', নজরুলের তেমন এক জীবনী রচনার দায়িত্ব নিয়েছেন সাহিত্য ও সংগীতে স্বচ্ছন্দ উভচারী অরুণকুমার বসু। তিনি প্রবীণব্যক্তি, বিবেচক, পরিশ্রমী ও যুক্তিপথের পদাতিক। অপ্রয়োজনীয় ভাবালুতা এবং অকারণ উচ্ছ্বাস সংযত করে তিনি তাঁর কাজে নেমেছিলেন। কাজটি ছিল কঠিন, কারণ তাঁর আগে যাঁরা নজরুল জীবনী বা নজরুল জীবনের কিছু কিছু অধ্যায় নিয়ে গ্রন্থ ও নিবন্ধ রচনা করেছেন তাঁদের পরিবেশিত তথ্যের ভ্রান্তি অপনোদনেই তাঁকে যথেষ্ট খাটতে হয়েছে যেমন ধরা যাক, ১৯৯১ সালে বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত (চুয়াডাঙা জেলার কার্পাসডাঙা থেকে পাওয়া) জনৈক ম. ইনামুল হকের পরিবেশিত তথ্য : 'নজরুল ১৯২৬ সালে এখানে তাঁর স্ত্রী ও দুই ছেলেকে নিয়ে এসেছিলেন এবং কংগ্রেস নেতা হর্ষপ্রিয় বিশ্বাসের বাড়িতে দু মাস ছিলেন।' এ প্রসঙ্গে অরুণবাবুর মন্তব্য :

> কার্পাসডাঙায় দু মাস কাটানোর সময় নজরুল কী কী লিখেছিলেন, সে সন্ধান এঁরা দিতে পারেননি। সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা, '১৯২৬-এ তিনি স্ত্রী প্রমীলা ও পুত্র সব্যসাচী ও অনিরুদ্ধকে নিয়ে আসেন' এই বাক্যটি যাঁরা লিখেছেন তাঁরা কি জানেন না, সব্যসাচীর জন্ম ১৯২৯ জানুয়ারি, অনিরুদ্ধর জন্ম ১৯৩১-এর ডিসেম্বর। সুতরাং ১৯২৬-এ নজরুলের পক্ষে কার্পাসডাঙায় এই দুই পুত্রকে নিয়ে আসা সম্ভব নয়। আর কার্পাসডাঙায় নজরুলের আগমনের মাসটির উল্লেখ কার্পাসডাঙা নজরুল মেলার সংগঠকরা উদ্ধার করেননি। সেটি সেপ্টেম্বরের আগে হলে নজরুল-পুত্র বুলবুল তখন প্রমীলার গর্ভে।

এ ধরনের ভ্রান্তি তো অবিরল। নজরুলের একেবারে ঘনিষ্ঠ মানুষরাও সজ্ঞানে মিথ্যাচার করেছেন অনেক ক্ষেত্রে যেমন গায়ক আব্বাসউদ্দীন 'আমার শিল্পী জীবনের কথা'য় লিখেছেন ১৯৩২ সালে রেকর্ডে প্রকাশিত তাঁর দুটি ইসলামি গানই নজরুলের প্রথম ইসলামি গান রচনা। তিনি কেমন করে কত কৌশলে এক ঠোঙা পান কিনে আধ ঘণ্টার মধ্যে এই দুটি প্রথম ইসলামি গান কাজীদাকে দিয়ে লেখালেন তার বিবরণ দিয়েছেন ফলিয়ে। অরুণকুমার বসু অকাট্য যুক্তি দিয়ে এ তথ্য অপ্রমাণ করে দিয়েছেন এবং দেখিয়েছেন ১৯৩২-এর অনেক আগেই নজরুল ইসলামি গান লিখেছেন এমনকী নিজেই সম্মেলনে গেয়েছেন। 'বাজল কি রে ভোরেই সানাই' গানটি কে. মল্লিক রেকর্ড করেন ১৯৩২ সালে একথা ঠিক কিন্তু আব্বাসউদ্দীনের মতে 'এটি কে মল্লিকের জন্য' লেখা এমন তথ্য ভুল, কারণ গানটি প্রকাশিত হয় ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'সওগাত'-এ। এ ধরনের

নানা রকম গানের তথ্যে ভুল নির্দেশ করে লেখকের সংগত বক্তব্য হল :

> ইসলামি গান আব্বাসউদ্দীনের তাগিদে রচিত হয়েছিল, শ্যামাসংগীত কৃষ্ণচন্দ্র দে-র অনুরোধে রচিত হয়, তেমনই কীর্তন গান প্রতিভা বসুর পিসিমার অনুরোধে নজরুল লিখেছিলেন—এই ধরণের তথ্য সমর্থনবঞ্চিত বিশ্বাসগুলি সংগীতকার নজরুল সম্পর্কে কেবল মিথ-ই প্রচার করেছে, মিথ্যার আবরণ মোচনে সহায়তা করেনি।

এবারে বোঝা গেল অরুণবাবুকে দুটো কাজ একসঙ্গে করতে হয়েছে পদে পদে। একদিকে মিথ্যার আবরণ মোচন আর একদিকে সত্যের প্রতিষ্ঠা। সে কাজে তাঁকে কেবলই নথিপত্র দেখতে হয়েছে এবং বলাবাহুল্য বহু নথি তিনি পাননি। যেমন, তাঁর কঠিন সমস্যা হয়েছে নজরুলের বিভিন্ন রচনার (বিশেষত গানের) কালনির্ণয়। সে ক্ষেত্রে পত্রপত্রিকায় প্রকাশের তারিখটি তাঁর ভরসা। লেখা আর ছাপার তারিখে ফারাক থাকা তো স্বাভাবিক। জীবনীকার এ ক্ষেত্রে নিরুপায়।

৬১৬ পৃষ্ঠার এই সুবৃহৎ 'নজরুল জীবনী' অন্তত আমার বিচারে এখনও পর্যন্ত সব কটি নজরুল জীবনীর মধ্যে সেরা এবং নির্ভরযোগ্য তবে পূর্ণাঙ্গ নয়। পূর্ণাঙ্গ হওয়া সম্ভব নয়, কারণ তাঁর সম্পর্কে সব তথ্য পাওয়া যায়নি, সম্ভবত পাওয়া যাবেও না। অথচ তাঁর সারস্বত জীবন রবীন্দ্রনাথের মতো সুদীর্ঘ নয়, মাত্র বাইশ তেইশ বছর তিনি লেখালেখি করেছেন, সাংগীতিক জীবন আরও সংক্ষিপ্ত। জীবনী রচনা করতে গিয়ে তাই লেখককে ক্ষোভ প্রকাশ করতে হয়েছে এই বলে :

> তাঁর সেই জীবনের কোনো অংশই গোপন বা অপ্রকাশ্য বিশেষ ছিল না। অথচ সে জীবনীর উপকরণ সতর্ক সংরক্ষণের অভাবে দ্রুত অবলুপ্ত বা বিনষ্ট হয়েছে। সাহিত্য জীবনের সূচনা থেকেই নজরুল পেয়েছিলেন অভাবিত খ্যাতি পরিচিতি ও প্রচার। অথচ সেই প্রচারিত সংবাদ অনুপুঙ্খ সংকলিত হয়নি। তাঁর চিঠিপত্র অতি সামান্যই রক্ষা পেয়েছে। তাঁর কবিতার পাণ্ডুলিপিও যথেষ্ট পরিমাণে সংরক্ষিত হয়নি।

এর কারণ কি? সবচেয়ে বড়ো কারণ নজরুল সর্বজনপ্রিয় ছিলেন কিন্তু তাঁর প্রকৃত অনুরাগী বন্ধু কেউ ছিলেন না। সবাই তাঁকে নিয়ে নেচেছেন, হুল্লোড় করেছেন, কাজ আদায় করেছেন এবং যথাসময়ে অন্তর্ধান করেছেন। তিনি নিজে স্বভাবে ছিলেন আমুদে এবং কল্পবৃক্ষের মতো উদার অথচ তাঁকে ঘিরে কোনো আত্মনিবেদিত পরিমণ্ডলী ছিল না। তার ওপরে দাঙ্গা, দেশবিভাগ, স্বাধীনতার উত্তেজনা এবং দুই বঙ্গের উতরোল দোলাচলে বিভ্রান্ত ব্যক্তি ও সমাজ মূক ও অসহায় তাঁর দিকে প্রয়োজনীয় দৃকপাত করেনি ১৯৪২ থেকে পরবর্তী পর্যন্ত। এই সময়েই তিনি অবহেলিত হয়েছেন। একমাত্র শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নজরুলের রোগাক্রমণের শুরুর সময় যথেষ্ট অনুকম্পায়ী ছিলেন এবং তাঁকে সপরিবারে মধুপুরে নিজের বাড়িতে পাঠিয়েছিলেন শুশ্রূষার জন্য। সেখানে দু মাসের ওপর কাটিয়ে নজরুল কলকাতা ফেরেন ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বরে। খবরের কাগজে তাঁর ব্যাধিপীড়িত জীবনের খবর প্রচারিত হয় কিন্তু তেমন কোনো সাড়া মেলে না মানুষের কাছ থেকে। অরুণবাবু লিখছেন :

> জনাব ফজলুল হকের কাছে পুনর্বার সাহায্য প্রার্থনা করা হল, পাওয়া গেল নিষ্ফল উপদেশ। জনাব নাজিমুদ্দীন শুনে বললেন, অসুখ হয়েছে ডাক্তার দেখান। আল্লাহ ভালো করবে। সোহারাওয়ার্দি বললেন, নবযুগ-এর সম্পাদক কাজী নজরুল ইসলামের অসুখ কিংবা আর্থিক দুরবস্থা, সে জন্য আমার কাছে কেন? তোমাদের ফজলুল হক তো রয়েছে, তার কাছে যাও।

কলকাতার সমকালীন প্রভাবশালী মুসলিম সমাজের এতটাই ছিল অমানবিক নিস্পৃহতা। পরে, অনেক পরে, নজরুলকে ঘিরে প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, অর্থ সাহায্য মিলেছে, ব্যাধির ব্যাপক চিকিৎসা (এমনকী বিদেশে নিয়ে গিয়ে) করা হয়েছে কিন্তু সকল কৃতবিদ্য চিকিৎসকই বলেছেন খুব দেরি হয়ে গেছে। রোগের প্রথম পর্যায়ে চিকিৎসা করলে আশা ছিল। নজরুল যখন সচল ও সক্ষম ছিলেন তখনও কি অসহায়তা কম ছিল? ১৯২৯ সালের ২৩ আগস্ট 'আত্মশক্তি' পত্রিকায় নজরুল যে চিঠি লেখেন জীবনীকার তার উদ্ধৃতি দিয়েছেন :

> আমার গান প্রায় প্রত্যহই কোনো-না-কোনো আর্টিস্ট রেডিওতে গেয়ে থাকেন। আমার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যবশত তা শুনেও ফেলি। এক উমাপদ ভট্টাচার্য মহাশয় এবং ক্বচিৎ দু-একজন গাইয়ে ছাড়া অধিকাংশ ভদ্রলোক বা মহিলাই আমার গান ও সুরকে অসহায় ভেবে (বা একা পেয়ে) তার পিণ্ডি এমনি করেই চটকান যে মনে হয় ওর গয়ালাভ ওখানেই হয়ে গেল। সে একটা রীতিমত সুরাসুরের যুদ্ধ।
>
> একদিন শুনলাম কোনো একজন ভদ্রলোক আমার ঠুংরি চালেব দুর্গা সুরের 'নহে নহে প্রিয় এ নয় আঁখিজল' গানটিতে ধ্রুপদের ইমনসুরে গাইছেন। এবং তা শুনে আমার গানের আঁখিজল' গানটিকে ধ্রুপদের ইমনসুরে গাইছেন। এবং তা শুনে আমার গানের আঁখিজল আমার চোখে দেখা দিল।

তাঁর জীবিতকালেই দেখা যাচ্ছে তিনি একা। তাঁর গান আর সুরের মতো তিনিও অসহায়। চলৎশক্তি ও বাক্‌শক্তি রহিত হওয়ার পরে আর্থিকভাবে অসহায় নজরুল সম্পর্কে সমকালীন গানের মানুষদের ভূমিকা কেমন ছিল? জীবনীকার লেখেন:

> পুরো তিরিশের দশক দেশের অগণ্য উচ্চাকাঙ্ক্ষী সংগীতশিল্পীর প্রচার ও প্রতিষ্ঠার পিছনে যে সুরকার-সংগীতস্রষ্টার ভূমিকা ছিল সর্বাধিক, সেই শিল্পীদের কেউই কাজীদাকে একবারের জন্যেও দেখতে আসেননি, সাহায্য করা তো কল্পনাতীত।

'নজরুল জীবনী' পড়তে পড়তে মন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। বিশেষত শেষের কটি অধ্যায় পড়া খুবই অরুন্তুদ অভিজ্ঞতা। তাঁকে পূর্ব পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে 'আজকের জমানায় নজরুল ইসলামই বাংলাভাষী মুসলিম কওমের নবজীবনের নকীব', 'পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা'। আর এক দলের দাবি ছিল, 'আমার বিবেচনায় পশ্চিমবঙ্গ বাসী নজরুলকে পাকিস্তানে আনিতে হইলে অবশ্যই পাকিস্তানী করিয়াই আনিতে হইবে।' নজরুল কাব্যের অবাঞ্ছিত অংশ বলে কেউ কেউ বেশ কিছু কবিতা ও পংক্তিকে শনাক্ত করে প্রকাশ করেন এবং নজরুল কাব্যের পাকিস্তান সংরক্ষণের প্রস্তাব করেন। তবু মুক্তবুদ্ধি মুসলিম মানসের অভাব ছিল না। একথা সত্যি যে, নজরুলের শেষজীবনে সেবাশুশ্রূষা ও উদার আতিথ্য দিয়েছিলেন বাংলাদেশ সরকার। তাঁরাই প্রকাশ করেছেন সামগ্রিক নজরুল

রচনাবলি এবং তাঁর গানের স্বরলিপি, স্থাপন করেছেন নজরুল একাডেমি!

'নজরুল জীবনী' মন দিয়ে আগাগোড়া পড়লে মনে হয়, সময় তাঁকে গড়ে তুলেছে, সময় তাঁকে কাজে লাগিয়েছে এবং সময়ই তাঁকে প্রতারণা করেছে। আত্মবশীভূত হতে পারেননি তিনি। গভীর আত্মতার অভাবে তিনি বড়ো বেশি উত্তেজনা ও সমসাময়িকতার মধ্যে গ্রস্ত হয়ে পড়তেন। মনটা খুব নরম ছিল বলে কাউকে ফেরাতে পারতেন না। নিজে যে গান লিখে সুর দিয়েছেন তাতে অন্য কেউ সুরারোপ করে শোনালে বলে উঠতেন, 'বাঃ এইটাই থাক'। নজরুল কেবলই সারাজীবন 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' মেতে রইলেন? অথচ সেই সৃষ্টি, কবিতা বা গান, তাঁকে, তাঁর মনকে কোনো পরিচর্যা বা সান্ত্বনা শেষপর্যন্ত দেয়নি। জীবনীটি পড়লে দেখা যায় বাংলার এই অনুপম বিদ্রোহী যৌবন অবসিত হওয়ার আগেই রণক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর কাব্য রচনায় স্পষ্টত একটা ভাঁটার টান লেগেছিল। গানের জগৎ বিশেষত নতুন মিডিয়া রেকর্ড-রেডিও-টকির ত্রিগুরা তাঁকে এমনভাবে দোহন করতে থাকে যে শান্ত শমিত আত্মমগ্ন রচনার দিন ফুরিয়ে আসে। পরিবারের অর্থ সংকটের চাপে তাঁকে সবরকম অর্থ সম্ভাবনার প্রস্তাবে প্ররোচিত করত। কচুরিপানা বিষয়েও তিনি সাবলীল গান লিখে দিতেন এবং সেইসব গান শেষপর্যন্ত কচুরিপানার মতোই ভেসে গেছে। ১৯৩৫ সালের ২৮ আগস্ট তিনি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথকে লেখেন :

> আমার ওপর হয়তো প্রসন্ন কাব্যলক্ষ্মী হিজ মাস্টার্স ভয়েসের কুকুরের ভয়ে আমায় ত্যাগ করেছেন বহুদিন। কাজেই সাহিত্যের আসর থেকে আমি প্রায় স্বেচ্ছা নির্বাসন নিয়েছি।

এসব পংক্তি পড়লে আমাদের যে শোচনা জাগে তার কারণ একজন স্রষ্টা কতখানি পরবশ হলে এমন মর্মান্তিক উক্তি করতে পারেন তা অনুভব করা যায়। গানে বিপণনের জগৎ তাঁকে নিঃস্ব করে দিয়েছিল। কেন তিনি গান সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেননি, কেন কেউ তাঁর গানগুলিকে স্বরলিপিতে বাঁধলেন না, কেন তাঁর অজস্র বিচিত্র গানগুলি কালক্রমিকভাবে সাজানো যায় না, কেন তাঁর গানের গায়নে কোনো আদর্শ নেই—সদুত্তরহীন এসব প্রশ্ন একটা দিকেই ইঙ্গিত করে—তাঁর বিশৃঙ্খল যাপন এবং বন্ধুদের বিশ্বাসঘাতকতা।

নজরুল জীবনের শেষের বিবরণ লিখতে লেখক যে কষ্ট পেয়েছেন তা পাঠকদের ছুঁয়ে যায়। বাংলাদেশে তাঁকে বিমানযোগে নিয়ে যাওয়া হয় ১৯৭২ সালের ২৪ মে। তাঁর প্রয়াণ ঘটে সেখানেই ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট তারিখে। জীবনীকারকে লিখতে হয়েছে : 'যে-কোনো কারণেই হোক, বাংলাদেশে কবিকে নিয়ে যাওয়ার পর পূর্বপ্রতিশ্রুতি মতো পরবৎসর নজরুলকে কলকাতায় ফিরিয়ে দেওয়া হয়নি।' তবে বাংলাদেশ তাঁকে স্বাচ্ছন্দ্য ও শুশ্রূষার ত্রুটি করেননি। তাঁকে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান 'একুশে পদক' দিয়েছেন তাঁরা ১৯৭৫ সালে, নাগরিকত্বও দিয়েছেন ওই সালে। তবে কবিপত্নীর শেষ ইচ্ছা ছিল তাঁর সমাধিস্থানের পাশে যেন নজরুলকে সমাধিস্থ করা হয়, সে-সাধ মেটেনি। জীবনীকার জানাচ্ছেন :

তাঁর একটি ইসলামি গান আছে :

> মসজিদেরই পাশে আমায় কবর দিও ভাই
> যেন গোরে থেকেও মোয়াজ্জিনের আজান শুনতে পাই।

এই গানের ইঙ্গিতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণবর্তী মসজিদ-সংলগ্ন কবরস্থানে কবিকে সমাধিস্থ করা হোক, কারও উত্থাপিত এই প্রস্তাব তৎকালীন বাংলাদেশ সরকার দ্রুত বাস্তবায়িত করবার নির্দেশ দিলেন।

এই দ্রুততা এতটাই যে, পুত্র সব্যসাচীর কলকাতা থেকে আসার তরও সইল না। আকাশযানের প্রতিকূলতা সামলে সব্যসাচী এসে 'আছড়ে পড়লেন সমাধিভূমির ওপর।' বড়ো আন্তরিক উচ্চারণে অন্নদাশঙ্কর লিখেছেন :

আহা!
অন্তর ভরে হা হা।
হায় কী বেদন। হায় কী রোদন।
সন্তান অভাগার
পিতার কবরে একমুঠো মাটি
দেওয়া হল না কো আর।
কেউ জানল না ইতিহাসে ফের
ভুল হয়ে গেল বিলকুল।
এতকাল পরে ধর্মের নামে
ভাগ হয়ে গেল নজরুল।

জীবনীকার আর একটি স্খলনের তথ্য আমাদের দিয়েছেন। ১৯৫৬-৫৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য দপ্তর মন্মথ রায়কে দিয়ে নজরুল ইসলামের সম্পর্কে একটি তথ্যচিত্র করান। এই জন্য নজরুলকে চুরুলিয়াতেও নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। 'একমাত্র এইটিই বোধহয় নজরুলের জীবিত অবস্থার শেষ সবাক চলচ্চিত্র যা পশ্চিমবঙ্গে তোলা হয়েছিল। কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয়, তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসি জমানায় তথ্যচিত্রটি সম্পূর্ণরূপে অব্যবহার্য হয়ে গেছে।'

অন্তবর্তী ক্ষোভ আর বেদনার সঙ্গে 'নজরুল জীবনী' পাঠ সাঙ্গ হয়। এ-বই সকল বাঙালির পাঠ্য হওয়া উচিত বলে বিবেচনা করি।

অধ্যাপক অরুণকুমার বসুর জন্য কিছু প্রশ্ন

যদিও এর আগে আপনার সংবর্ধনাগ্রন্থ *আরুণি*-তে আপনার একটি সুদীর্ঘ সাক্ষাতকার প্রকাশিত হয়েছে, তা হলেও আমাদের আরও কিছু কৌতূহল নিরসনের জন্য কয়েকটি প্রশ্ন করছি।

১। আপনার শৈশব আর যৌবনের অনেকটা কেটেছে বেলেঘাটায়। স্বাধীনতা আন্দোলন, নানা রাজনৈতিক আন্দোলন আর দাঙ্গাহাঙ্গামায় বিক্ষুব্ধ সেই সময়ের অত্যন্ত আবেগসংরক্ত স্মৃতিচারণ আপনার মুখে শুনেছিলাম কোনও এক অনুষ্ঠানে। সেই সব কথা যদি আমাদের আর একবার বলেন।

২। আপনার মাতাপিতার এবং পরিবারের প্রভাব আপনার উপর কিভাবে পড়েছে তা যদি আমাদের বলেন। বেলেঘাটা দেশবন্ধু উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র আপনার অগ্রজ সতীর্থ কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য কি কোনোভাবে আপনাকে প্রভাবিত বা অনুপ্রাণিত করেছিলেন?

৩। রবীন্দ্রচর্চায় আপনার আগ্রহের সূচনা কিভাবে, প্রেরণা কে বা কি?

৪। টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর সঙ্গে আপনার যোগ কিভাবে ঘটল, কবে থেকেই বা এই প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনার সূচনা। 'রবীন্দ্রভাবনা' সম্পাদনার দায়িত্ব কোন সময় থেকে গ্রহণ করলেন?

৫। আজকের যুগে রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রচর্চা কতটা প্রাসঙ্গিক?

৬। রবীন্দ্রচর্চার আদর্শ ও লক্ষ্য কি হওয়া উচিত বলে আপনার মনে হয়? এই লক্ষ্যে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলি কতখানি নিবিষ্ট বলে আপনার মনে হয়?

৭। নজরুল-জীবনী লেখার কারণ দু'একটি বাক্যে 'গুরুজন সংবর্ধনা' অনুষ্ঠানে আপনি বলেছিলেন। কিন্তু সেটুকুই কি যথেষ্ট কারণ? আপনার নিজের ভিতরে কি কোনও তাগিদ ছিল না? থাকলে তার সূচনা কিভাবে? 'নজরুল পুরস্কার' প্রদান অনুষ্ঠানে গ্রন্থটি রচনা প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত ভাষণে আপনি মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ প্রসঙ্গ উল্লেখ যোগ্য করে বলেছিলেন যে প্রচুর অশ্রুক্ষরণের মূল্যে গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। প্রকৃত নজরুলকে নানা কিংবদন্তী ও পরস্পরবিরোধী স্মৃতিচারণার জলাভূমি থেরে উদ্ধার করতে গিয়ে আপনি ব্যক্তিগতভাবে যে নতুন নতুন নজরুলকে আবিষ্কার করলেন তার কথা সবটা জীবনীগ্রন্থটি অবশ্যই ধরা নেই। সে সব কথা যদি আমাদের বলেন।

৮। শুনেছি আপনি বর্তমানে নজরুল রচনাকালী সম্পাদনার কাজে ব্যস্ত আছেন এবং সে কাজ শেষ হয়ে এসেছে। আপনার পরবর্তী কর্মপরিকল্পনা কি?

৯। আমাদের শিক্ষিকা রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত ক্ষিতিমোহন-জীবনীর লেখিকা প্রণতি মুখোপাধ্যায় ও তাঁর ঐ গ্রন্থটি সম্পর্কে আপনার সবিস্তার বক্তব্য জানতে আমরা আগ্রহী।

১০। আমাদের (ছাত্রছাত্রীদের) জন্য আপনার বাণী।

আমাদের সাজিয়ে দেওয়া উপরের প্রশ্নগুলির উত্তরে অধ্যাপক অরুণকুমার বসু লিখে দিয়েছিলেন —'সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়'। বলেছিলেন, 'এর মধ্যেই তোমাদের সব প্রশ্নের উত্তর পাবে।'

প্রশ্নগুলি না জানলেও অবশ্য নিবন্ধটির রসগ্রহণে মনোযোগী পাঠকের কোনো অসুবিধা হবে না।

‘সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়’

অরুণকুমার বসু

আমি যে শহরতলিতে জন্মেছি, বড়ো হয়েছি, জীবনের তিন দশকেরও বেশি সময় কাটিয়েছি এবং আজও যে অঞ্চলের সঙ্গে আমার যাতায়াতের যোগাযোগের এবং মানসিকতার বন্ধন অটুট আছে, সেই বেলেঘাটা চোখের সামনে কেমন মরিয়াভাবে নিজেকে বদলে ফেলেছে। সেদিন সে ছিল শহরের পূর্ব সীমান্ত, তার পর আর যাতায়াতের পথ ছিল না। ছিল খাল, জলা, ভেড়ির পর ভেড়ি। আজ সেই বেলেঘাটা হয়েছে যাতায়াতের পথের একটা মধ্যবর্তী শহরখণ্ড, শহর তার ওপর দিয়ে পুবে আরও পুবে আরও বহুদূরে চলে গেছে, যেন নতুন রূপকথার দেশে, নতুন নতুন জনপদে। সেই অতীতের বেলেঘাটার স্মৃতি অবশ্য দুটো অংশে খণ্ডিত। একটা সাবেক বেলেঘাটা, আর-একটা দাঙ্গা ও স্বাধীনতালাভের পরবর্তী বেলেঘাটা। প্রথম বারো-তোরো বছরের বেলেঘাটা ছিল মুসলমানপ্রধান, সংখ্যায় সংযোগে জীবনযাপনের নানান বাঁধনে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত বেলেঘাটা। স্কুলে একসঙ্গে পড়েছি, এক পথে হেঁটেছি, এক মাঠে খেলেছি, এক দোকানে খেয়েছি। তারপরে কী যে হয়ে গেল! কী ঘৃণা, কী কুৎসিত হিংসা, ধর্মের নামে কী বেপরোয়া জবাইদারি! দুঃস্বপ্নের দুটো বছর আমার বাল্য-কৈশোরের দিনগুলোকে পোড়া কাঠের ছাই মাখিয়ে দিয়ে গেল। তারপর দিন আবার স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। অগ্নিদগ্ধ বাড়ির ওপর নতুন ছাউনি পড়েছে, স্কুলের খাতায় অজস্র সহপাঠীর নাম অন্তর্হিত হয়েছে। সেই সঙ্গে হাজার হাজার উদ্বাস্তু শেয়ালদা স্টেশন থেকে মাত্র দশ-পনেরো মিনিটের পথ পেরিয়ে বেলেঘাটার বিস্তীর্ণ এলাকা ভরিয়ে তুলেছে। ছেঁড়া কাঁথা বিবর্ণ মুখ ভয়ার্ত স্মৃতি মাখানো চোখ শীর্ণ উলঙ্গ শিশুর দল দখল নিয়েছে মুসলমানদের পরিত্যক্ত এলাকায়, যে যেখানে পেরেছে, গাছতলায় শিবমন্দিরের মাঠে, খালের পাড়ে পাড়ে। ক্ষুধা অভাব হাহাকার সর্বস্বহারা আর্তনাদ ক্রমশ রঙ বদলেছে। বেলেঘাটা নারকোলডাঙা মানিকতলা এই পাশাপাশি তিন শহরতলির একই ইতিহাস। এই উদ্বাস্তু, নতুন ইহুদিরাই পরবর্তী দুই দশকে এই অঞ্চলের সামাজিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক জীবনযাত্রাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। ধীরে ধীরে তারা মিশে গেছে মূল স্রোতে। স্বাধীনতা-পরবর্তী বছরগুলিতে বেলেঘাটার যত সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, যত বামপন্থী আন্দোলন, খাদ্য আন্দোলন, ট্রামভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন, যত বিধানসভা লোকসভা নির্বাচন, যত সমাজসেবা সংস্কৃতি-চর্চার ক্লাব বা কেন্দ্র গড়ে তোলা, সুস্থ সামাজিক জীবনের অভিমুখে উত্তীর্ণ হওয়ার আন্দোলন ও প্রয়াস, তা এই নতুন জনগোষ্ঠীর সাহায্যেই। আমার জন্ম-পরবর্তী বেলেঘাটার সেই প্রাক্‌দাঙ্গা পর্ব থেকে স্বাধীনতা-লাভের পরবর্তী, বিশেষত লবণহ্রদকেন্দ্রিক শহর গড়ে ওঠার পূর্ববর্তী সময়কার বেলেঘাটার শত সহস্র স্মৃতি নিয়ে আজও যাঁরা জীবিত আছেন, তাঁদের মুখ থেকে সে ইতিহাস নতুন করে গড়ে তোলা যায়। তাহলে সেটাই হবে সত্যিকার শহরতলির ইতিকথা। আমি তার কতটুকু অংশ?

আমার ওপর আমার মাতাপিতার প্রভাবের কথা মাঝে মাঝে উচ্চারণ করেছি। আমাদের সেই বয়সের স্বভাবই তো তাই। পিতামাতার শিক্ষাদীক্ষা স্নেহশাসনেই তো বড়ো হয়েছি আমরা। এর মধ্যে নতুন কথা কিছু নেই। তাই পুনরাবৃত্তির তাগিদ বোধ করছি না। তবে দু একটি কথা সূত্রাকারে বলতে পারি। যেমন, আমার ব্যক্তিগত শিক্ষাদীক্ষা, পড়াশোনা, বৃত্তিনির্বাচন, এসব ব্যাপারে আমার পিতামাতা ছিলেন নির্বিকার ও নিস্পৃহ। নিতান্ত একটি অসম্মানজনক সাধারণ জীবনযাপন করে, মার খেয়ে লড়াই করতে করতে সত্তরে এসে বিদ্যাসাগরের ভুবন-এর মতো বলতেই পারতাম, আমার বাবা-মা যদি ছোটোবেলা থেকে সতর্ক হতেন, ভালো স্কুলে পড়াতেন, ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার বা অর্থকর বৃত্তির দিকে যেতে বাধ্য করতেন, তাহলে আমার এ দশা হত না। কিন্তু প্রণাম তাঁদের, তাঁদের নির্বিকারত্ব আমাকে অমানুষ করেনি। নিজের ইচ্ছেয় লেখাপড়া শিখে শেষ পর্যন্ত অধ্যাপনা জীবন গ্রহণ করে অনায়ত্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষার গ্লানি বোধ করিনি কখনও। যে অমানবিক হত্যা হিংসা ধর্মবিদ্বেষের উগ্র পরিবেশে কৈশোর দিনগুলো থরথর করে কেঁপেছে, সেদিন এই পিতামাতা তো শেখাননি, এই নাও ছুরি, এই নাও কেরোসিন তেল, প্রতিবেশী বিধর্মীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ো, তাদের ঘরে আগুন লাগিয়ে এসো। কিন্তু আমার দাদা-খুড়োরা ঠিক তাই করেছেন সেদিন। আমি কৃতজ্ঞ, আমার পিতামাতা বহুক্ষেত্রে মনের দিক থেকে পরস্পরের বিপরীত হলেও, অনৈতিক ঘৃণার দূষণ থেকে আমাকে বাঁচিয়েছেন। ধর্মপরায়ণ হয়েও ধর্মান্ধতার লেশমাত্র তাঁদের স্বভাবে ছিল না। ছোঁয়াছুঁয়ি জাতপাতবিচারের ঊর্ধ্বে ওঠার শিক্ষা কোথায় পেয়েছিলেন জানি না। কিন্তু এই পিতার কণ্ঠে একাধিক বার শুনেছি 'হে মোর চিত্ত পুণ্যতীর্থে', 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ', 'বলো বীর', 'জাতের নামে বজ্জাতি সব'—অনর্গল কণ্ঠস্থ ছিল তাঁর। ছয়-সাত থেকে চোদ্দো-পনেরো বছরের সংক্রামকতা-সন্ত্রস্ত সেই দিনগুলোয় এই কবিতাগুলি কি আমার মনের আমার বোধবুদ্ধির চারপাশে নিঃশব্দ নিঃশঙ্ক প্রবল প্রতিরোধশক্তি গড়ে তোলেনি? নিজেদের খাওয়ার গ্লাসে মেথরকে খাওয়ার জল দিতে মা-র কোনো বৈলক্ষণ্য ঘটেনি। অথচ ঠিক নিচের তলায় ভাড়াটে বাড়ির মা তাঁর ছেলেকে খাওয়ার-সময় আমি ছুঁয়ে ফেলেছিলাম বলে পাতের সব ভাত মাছ নর্দমায় ফেলে দিয়েছিলেন। সেই ছেলে এবং সমবয়সী আমি, এক সঙ্গে বড়ো হয়েছি। আমাদের দুজনের উপরই আমাদের পিতামাতার প্রভাব রয়ে গেছে। আমি পেয়েছি ধর্মের উদারতার, সহিষ্ণুতার শিক্ষা। আমার বন্ধু কী পেয়েছে আমি জানি না। কারণ তাঁর সঙ্গে ষাট বছরের মধ্যে আর দেখা হয়নি।

আর বিদ্যালয়ের প্রভাব দুচার কথায় বলা যায় না। আমি যখন স্কুলে ভর্তি হয়েছি ১৯৩৯ সালে তখন সুকান্ত উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্র। যখন আশ্চর্য কবিত্বশক্তিতে সে ছাত্রবয়সেই শিক্ষকদের স্নেহপ্রীতি লাভ করতে শুরু করেছে, তখন তার পরিচয় পাওয়ার বয়সই হয়নি আমার। যখন সপ্তম শ্রেণীতে উঠে প্রথম বিদ্যালয়-পত্রিকা প্রকাশ করছি, তখন সুকান্ত-অরুণাচল বসু আর স্কুলে নেই। কিন্তু পত্রিকায় লেখা পাঠিয়ে দিয়েছিল। সে পাণ্ডুলিপি পত্রিকাসম্পাদক মাস্টারমশায় আমাদের সবাইকে ডেকে দেখিয়েছিলেন। সুকান্তের কবিতার

নাম 'মুহূর্ত' ('এমন মুহূর্ত এসেছিল একদিন আমার জীবনে'), আর অরুণাচল-দা লিখে পাঠিয়েছিলেন 'নায়েগ্রার ডাক' ('নায়েগ্রার ডাকে হরিণের কান খাড়া')।

রবীন্দ্রচর্চা বলতে আজকাল যা বুঝি অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও জীবন অবলম্বিত নিরন্তর অনুশীলন ও গবেষণা, তা হঠাৎ একদিনে শুরু হয় না। যে রবীন্দ্রানুরাগ হয়তো রক্তসূত্রে পিতামাতার কাছ থেকে পেয়েছি, আমার মায়ের পরিবারের দিক থেকে অর্থাৎ মামা মাসিমা ও মাসতুতো ভাইবোনদের দিক থেকে পেয়েছি, তা রবীন্দ্ররোদ্দুরে ঝলমলে হয়ে আমার দিনরাত্তির মুখর করে রাখত। বেলেঘাটা সান্ধ্য সমিতি, যেখানে বাবার আঁকা বিরাট রবীন্দ্রপ্রতিকৃতি এখনও টাঙানো, সেই লাইব্রেরিও রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ দিয়ে আমাকে সজীব রেখেছে। মায়ের মুখ থেকে শুনে শুনে অজস্র রবীন্দ্রকবিতা মুখস্থ হয়ে গেছিল। কিন্তু এ অভিজ্ঞতা অনেকের জীবনেই হতে পারে। আমার ক্ষেত্রে যা হয়েছিল, নিরন্তর পাঠে অভিনিবেশে যেন রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে পারতাম অনেকের চেয়ে তাড়াতাড়ি বা বেশি। তারপর কলেজ জীবনে এসে আমার রবীন্দ্রচর্চার উন্মোচন হল আমার শিক্ষক জগদীশ ভট্টাচার্যের স্নেহ-সাহচর্যে। সে অনন্য স্মৃতির কথা অন্যত্র বলেছি। শুধু এইটুকু পুনরুক্তি করছি, আমার রবীন্দ্রচর্চার গুরু তিনিই। এ ছাড়া আরও অনেকের কথাই হয়তো বলা যায়, হয়তো সকলের কথা ঠিক সময় মনেও পড়বে না। তবে রবীন্দ্রচর্চার ক্ষেত্রে টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের কথা না বললেই নয়।

রবীন্দ্রচর্চায় টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট যে প্রস্তাব ও পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিল, তার মুখ্য অধীক্ষক ছিলেন সোমেন্দ্রনাথ বসু। চারুচন্দ্র কলেজে তিনি অধ্যাপনা করেন, আমি বঙ্গবাসী কলেজে। আমাকে উনি বিলক্ষণ চিনতেন, তাঁর স্নেহসৌজন্য লাভের সুযোগ আমার ঘটেছিল। তাঁরই আহ্বানে টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটে পড়াতে শুরু করি সম্ভবত ১৯৬৯ সাল থেকে। আজও নিরবচ্ছিন্ন যোগ রয়ে গেছে। তবে রবীন্দ্রভাবনা-সম্পাদনার দায়িত্ব এসে গেল অকস্মাৎ। দুর্ভাগ্যক্রমে বন্ধুবর দেবদাস জোয়ারদার চলে গেলেন। সেই থেকেই এই সম্পাদনা। তবে সম্পাদনার অনুপুঙ্খ পিনাকী ভাদুড়ীর উপর ন্যস্ত করে আমি প্রায় নেপথ্যেই থাকি।

আজকের দিনে রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রচর্চা কতটা প্রাসঙ্গিক, এই ধরনের কলেজছাত্র পাঠ্যসুলভ প্রশ্নের উল্লেখই আমার কাছে অপ্রাসঙ্গিক। ধরা যাক, আর কোনো স্কুল-কলেজের পাঠক্রমে রবীন্দ্রনাথের কোনো কবিতা গল্প প্রবন্ধ ছাপা হয় না। রবীন্দ্রনাথের কোনো বই কোনো পাঠক্রমে পড়ানো হয় না। রবীন্দ্রনাথের গান কোথাও বাজে না। কোনো ক্যাসেট তৈরি হয় না। দোকানে রবীন্দ্রনাথের বই বিক্রি হয় না। রবীন্দ্রনাথের নাটক অভিনীত হয় না, বা চলচ্চিত্রায়িত হয় না। তাঁর জন্মদিন উদ্‌যাপন প্রায় লুপ্ত হয়ে এল। দেওয়ালে তাঁর ছবিও দুর্লভদর্শন হয়ে এল।

হ্যাঁ হতেই পারে। হয়তো সেই হওয়ার পথেই চলছি আমরা, অথবা আমাদের চালানো হচ্ছে। মাতৃভাষা ও সংস্কৃতিকে ধীরে ধীরে জীবন থেকে বিশ্বাস থেকে মুছে ফেলা হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ এই সংস্কৃতির সমৃদ্ধতম কেন্দ্র, সম্পন্নতম আধার। একে নিঃশেষে চূর্ণ করা, গুঁড়িয়ে দেওয়া, ধুয়ে-মুছে সাফ করে দেওয়ার সাংস্কৃতিক গুণ্ডামি শুরু হয়ে গেছে। পুকুর-দিঘির জল শুকিয়ে যাক, নদী মরে-হেজে যাক, তৃষ্ণা নিবারণের জন্যে চাই ঠাণ্ডি ঠাণ্ডি বোতল। কবি পেপসি গোস্বামী কবি কোকাকোলা চট্টোপাধ্যায় কবি থামসআপ চক্রবর্তী নাট্যকার পিৎজা মিত্র সাংবাদিক বমন চট্টোপাধ্যায় আমাদের সংস্কৃতির বাজারকে এখন বিশ্বের বাজারের সঙ্গে মিলিয়ে দেবেন। রবীন্দ্রনাথের বিশাল মূর্তি গুঁড়িয়ে দিতে কটা তালিবানি বোমা লাগে?

সব অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সোচ্চার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামক ওই বিপজ্জনক মানুষটাকে মুছে ফেলার দিন আসছে। সুতরাং রবীন্দ্রচর্চার আদর্শ ও লক্ষ্য হওয়া উচিত রবীন্দ্রনাথকে সমাজ ও সংস্কৃতির দিক থেকে সব থেকে বিপজ্জনক ঘোষণা করা।

তারাই রবীন্দ্রজন্মদিবসে ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে রবীন্দ্রনাথ আজও প্রাসঙ্গিক কিনা এই জাতীয় মেধাবী প্রশ্ন তুলে। তাদেরই কাগজে রবীন্দ্রপ্রকৃতির পাশে চিত্রতারকাদের বস্ত্রকৃচ্ছ্রতার মারকাট বিজ্ঞাপন বেরোয়। আর রাতবিরেতে ডিস্কোথেকে আধখোলা নেশার বুকে লোভী চোখ রেখে কেমন করে পানীয়ে চুমুক দিতে হয় তার রঞ্জিত বিবরণ থাকে। বেতারে বাংলা হিন্দী ইংরিজি মিশিয়ে নতুন এক ভাষা চালু হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথের গানের সুরের উপর কালোয়াতি কেরামতির হাততালিতে বাজারি নববাবুরা মোহরের থলি ছুঁড়ছেন। *রক্তকরবী*-র রাজা-র সেই আর্ত উচ্চারণ মনে আছে?

> আমি যৌবনকে মেরেছি — এতদিন ধরে আমি সমস্ত শক্তি দিয়ে কেবল যৌবনকে মেরেছি। মরা যৌবনের অভিশাপ আমাকে লেগেছে।

এখন মরা যৌবনের অভিশাপ রাজাদের গায়ে লাগে না। এখনকার যৌবন স্বেচ্ছামৃত্যুর গোপন মন্ত্র শিখে নিয়েছে। তারা জানে, 'তৃষ্ণার জল যখন আশার অতীত হয় মরীচিকা তখন সহজে ভোলায়। তার পরে দিকহারা নিজেকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না।'

এমনই কপাল যে এসব কথার খেই রবীন্দ্ররচনা থেকেই বের করতে হচ্ছে। তা হোক, তবু রবীন্দ্রনাথকে আর নয়। ধীরে ধীরে বছরের তিনশো পঁয়ষট্টি দিনই হয়ে উঠুক রবীন্দ্র-হঠাও দিবস।

এবার আসি নজরুলজীবনী প্রসঙ্গে। 'রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ' 'নজরুলবিশেষজ্ঞ' এইসব শব্দ এখন খুবই শস্তায় বিকোয়। একটি জীবনী লিখে ফেলেই আমি রাতারাতি নজরুল-বিশেষজ্ঞ বনে গেছি। বড়ো মজা পাই, হাসি পায়, নিজেকে নিয়ে বিদ্রূপ করতে ইচ্ছে করে। ওই একই বিশেষণ ব্যবহার করায় কেউ কেউ আত্মপ্রসাদ অনুভব করেন, কাল্পনিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের

প্রতি হম্বিতম্বিরও শেষ নেই, ভাবখানা যেন সেই নজরুলেরই ভাষায়, 'আমপারা-পড়া হামবড়া মোরা এখনও বেড়াই ভাত মেরে'। এদের প্রাদুর্ভাব গত এক দশকে বেড়েছে। পশ্চিমবঙ্গে নজরুলচর্চা আজও মরুনদীর মতো ক্ষীণস্রোত। অথচ নজরুলের জীবন ও সাহিত্যচর্চা তাঁর সুস্থাবস্থায় ছিল কলকাতা-কেন্দ্রিক। তাঁর জীবনের যাবতীয় উপকরণ কলকাতাতেই সংরক্ষিত ছিল, অযত্নে হারিয়ে গেছে অথবা বাংলাদেশের গবেষকরা নিষ্ঠাভরে তা জোগাড় করে নিয়ে গেছেন। নজরুলের জীবন বিস্ময়কর প্রতিভার বিরল দৃষ্টান্ত। কী অবিরাম অগ্নিগর্ভ উচ্ছ্বাস, তারই সঙ্গে কী মধুরস্নিগ্ধ বংশীনিনাদ, কী আপোষহীন তেজস্বিতা, কী নির্বিরোধ আত্মসমর্পণ, অসঙ্গতির কী আশ্চর্য জীবন্ত বিগ্রহ। প্রথম তিরিশ বছর তারুণ্যে, প্রথাদ্রোহিতায়, তীব্র উত্তেজনায়, প্রতিভার দুর্ধর্ষ আবেগে যেন থরথর গিরিশিখর। পরবর্তী দশ বছর শান্ত গীতিচর্চায়, অদীন দানপুণ্যে অলৌকিক কল্পতরু। তারপরই বজ্রাহত বনস্পতির মতো মহাপতন। বড়ো নিষ্ঠুর অসহায় স্তব্ধবাক্ একটি জীবন্মৃত করুণাপ্রার্থী অস্তিত্ব! হাজার বছরের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এমন একটি উত্থানপতনের বিমূঢ় জীবন আর কোথায় আছে? পৃথিবীর অন্যান্য সাহিত্যের ইতিহাসেও বোধহয় খুব একটা নেই।

নজরুলের কবিজীবন বা সাহিত্যিক জীবনকে গড়ে তোলা নয়, এই ব্যক্তিজীবনটিকে পুনরঙ্কিত করার তাগিদই আমাকে নজরুল-জীবনী লিখতে বাধ্য করেছে, এই কথাটা স্বীকার করতে চাই। কবি-জীবন সাহিত্যিক-জীবন আর ব্যক্তি-জীবনকে ঠিক এভাবে আলাদা-আলাদা পাত্রে পরিবেশন করা যায় না। এ কথা সত্যি হলেও অন্যান্য নজরুল-জীবনীতে নজরুলের কবিপ্রতিভার সাংগীতিক প্রতিভার উপরই আলো ফেলা হয়েছে। ফলে নিষ্প্রভ হয়ে গেছে মানুষ নজরুল। নিজের সমাজের মৌলবাদীদের কাছ থেকে পাওয়া ধর্মবিদ্বেষ, হিন্দু সমাজের গুণমুগ্ধদের কাছ থেকে পাওয়া তুমুল অভিনন্দন এবং ঠিক তারই সঙ্গে কিছু সন্দিগ্ধ সংকীর্ণতা তাঁকে ভিতরে ভিতরে কতখানি ক্ষতবিক্ষত করেছিল, তার চুলচেরা বিশ্লেষণ কোথায় কে করেছেন? সংস্কারভাঙার বেপরোয়া উদ্দামতায় হিন্দু নারীকে বিয়ে করেও পেয়েছেন চরম লাঞ্ছনা, নিঃসহায় ঔদাসীন্য! আবার সমস্ত সংযম সংস্কার সামাজিক নিষেধকে উপেক্ষা করে কোনো আগন্তুক নারীর প্রতি আবেগে নতজানু হয়ে তার প্রণয়ভিক্ষা করেছেন! পরমুহূর্তে আঘাতে বিপর্যস্ত হয়ে সৃষ্টির গভীরে ডুব দিয়ে শান্তিসন্ধান করেছেন। সৃজনেই সব নিদারুণ অশান্তির স্বস্ত্যয়ন ঘটে কি না, অন্তত নজরুলের ক্ষেত্রে ঘটেছিল কি না, তার যথেষ্ট প্রমাণ তিনি দিয়ে যাননি। তাঁরই হাতে-গড়া ছাত্রশিষ্য জাতীয় তরুণ উচ্চাভিলাষী কয়েকজন গীতশিল্পী তাঁর লেখা গানে যথেচ্ছ সুর বসিয়েছেন, তাঁর দেওয়া সুরের উপর যথেচ্ছ স্বেচ্ছাচারিতা ঘটিয়েছেন, এমনকী তাঁর দেওয়া সুরকে নস্যাৎ করে নিজস্ব সুর চাপিয়ে আয় বৃদ্ধি করেছেন। আর আত্মভোলা উদার সহিষ্ণু স্নেহবশ নজরুল তাঁদের তারিফ করেছেন! বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। ভদ্র মার্জিত ঔদার্যের সুযোগ নিয়ে যাঁরা তাঁর সৃষ্টির অসম্মান করে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করেছেন, তাঁদের জন্যে তাঁর অবচেতনায় কি কোনো ক্ষোভ কোনো যন্ত্রণার কম্পরেখা আঁকা হয়নি।

এ সবের অনুকূলে কোনো তথ্যপ্রমাণ আমাদের হাতে নেই। আছে শুধু এই বিপন্ন বিমূঢ় মানুষটির আপন ভাগ্যের হাতে বিড়ম্বিত এক স্থিরচিত্র—তার কোনো বৈলক্ষণ্য নেই, ভাবান্তর নেই, আর্তনাদ নেই! এই মানুষটির জীবনী রচনা করা কি এতই সহজ? *মেঘনাদবধ কাব্য* লেখা শেষ করে মধুসূদন যখন তাঁর প্রিয় আদর্শ নায়ক মেঘনাদকে চিতাশয্যায় তুলে দিয়েছিলেন, তখনকার অনুভূতি ব্যাখ্যা করে তিনি তাঁর বন্ধুকে চিঠিতে লিখেছিলেন, It costs me many a tear to kill him। নজরুল-পুরস্কার গ্রহণের সভায় এই বাক্যটির উল্লেখ করে আমি নজরুল-জীবনী সম্পর্কে বলেছিলাম, It cost me many a tear to rebuild him। স্বীকার করছি, সেই গভীরতর বেদনা থেকেই আমি নজরুল-জীবনীর একটি খশড়া তৈরি করতে চেয়েছি, যেখানে ঘটনার ভিতর-মহলে উঁকি দেওয়ার চেষ্টা করেছি। এর সার্থকতা নিয়ে আমার কোনো উদ্‌বেগ বা জিজ্ঞাসা নেই। অনেকের সমালোচনায় নানা মতের আনাগোনা ঘটেছে। কিন্তু অন্তত একজন পাঠকের কাছ থেকে পাওয়া একটি চিঠিতেই আমি আমার পুরস্কার পেয়েছি। চিঠিটি লিখেছিলেন আমার দীর্ঘকালের বন্ধু প্রখ্যাত গবেষক-অধ্যাপক, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রবীন্দ্র-অধ্যাপক শিশিরকুমার দাশ, সদ্য যাঁকে আমরা অকালে হারিয়েছি। তিনি এই চিঠিটি লিখেছিলেন দিল্লী থেকে, ২৪ জানুয়ারি ২০০২ তারিখে। তাও তৎক্ষণাৎ আমার ঠিকানা হাতের কাছে না-থাকায় কলকাতাস্থিত অন্য একজন পরিচিতের ঠিকানায়। চিঠিটি তুলে দিচ্ছি :

ড. অরুণকুমার বসু
প্রীতিভাজনেষু

আমার সঙ্গে কলকাতার সাহিত্যজগতের সম্পর্ক অতি ক্ষীণ। হঠাৎ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রকাশিত 'বাংলা বই' নামক আলোচনাপত্রে অরুণকুমার বসু লিখিত নজরুল-জীবনী নামক একটি বই-এর সমালোচনা পড়লাম। সুধীর চক্রবর্তী বইটির বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তারপর 'দেশ' পত্রিকাতেও একটি সমালোচনা পড়লাম। দুটি সমালোচনাই আমাকে মূল বইটি পড়তে উৎসাহিত করল। হঠাৎ সাহিত্য আকাদেমির লাইব্রেরিতে বইটি পেয়ে গেলাম।

গত দুদিন ধরে আমি বইটি পড়ছি এবং আজ এইমাত্র পড়া শেষ হল।

বহুদিন কোন বই পড়ে এত অভিভূত হইনি। তোমার বই-র শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমি অবিচ্ছিন্ন মুগ্ধতায় পড়েছি। নজরুল ইসলামের জীবনী আগেও কয়েকটি পড়েছি, কিন্তু তাঁর জীবনের উদ্দাম বাঁধনহারা শক্তিকে তুমি যে-ভাবে রূপায়িত করেছ, তার কোন নজির নেই। নজরুলের জীবনের কী বিপুল অসঙ্গতি, কী অবিশ্বাস্য বৈপরীত্য। এমন অসামান্য অভ্যুদয়, এমন বিপুলশক্তির জলোচ্ছ্বাস, এমন প্রগল্‌ভ বাক্যবিন্যাস, আর তার পরেই কী করুণ নৈঃশব্দ্য, কী পীড়ন, কী তিলে তিলে ক্ষয়। অর্ধেক জীবন যেন গ্রীক ট্রাজেডির নায়কদের মতো স্পর্ধাদীপ্ত, আর বাকি অর্ধেক জীবন তিলে তিলে মরা। তুমি এই মহাজীবনকে অপরূপ সহানুভূতি ও ভালোবাসা দিয়ে রূপায়িত করেছ। এমন এক জীবন যেখানে ধর্মের সব সংকীর্ণতা কীভাবে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, আর ঐ ধর্মের সংকীর্ণতাই কীভাবে যে তাঁকে শেষ পর্যন্ত লাঞ্ছিত করল বাকশক্তিহীন দুর্বল মানুষটির

শবদেহটি নিয়ে যে রাজনৈতিক খেলা হয়ে গেল তার নজির ইতিহাসে আর নেই। তোমার লেখায় বুদ্ধি বিবেচনা বিশ্লেষণের চিহ্ন পাতায় পাতায়, প্রত্যেকটি তথ্য তুমি কৌশলী গোয়েন্দার মতো বিচার করেছ, নজরুল-জীবনীর রচনায় ধর্মান্ধতার মুখোসগুলি খুলে দিয়েছ। কিন্তু আমাকে যা সবচেয়ে বিচলিত করেছে তা হল নজরুল-জীবনের এক প্রলয়ঙ্করী শক্তি। এই শক্তিই নজরুলকে নিয়ে গেল খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার তুঙ্গে, আবার এই শক্তি তাঁকে ঠেলে ফেলে দিল অবসন্নতার কোন অতলে। গৌরব ও বেদনা, খ্যাতি ও অবহেলার এই ভার আর কোন জীবন কি এইভাবে বহন করতে পারত। তোমার বই পড়ে আমি এত আনন্দ পেয়েছি যে তোমাকে এই চিঠি না লিখে পারছি না। তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য এই কয়েকটি লাইন।

এই চিঠি আমাকে দেওয়া শিশিরের শেষ দান। পুনরুক্তি করে বলি, আমার নজরুল-জীবনী লেখার সবচেয়ে বড়ো সম্মান তাঁর মতো বোদ্ধা পাঠকের তৃপ্তি ও অভিনন্দন।

এই সূত্রে আর-একটি কথাও উচ্চারণ করে নেওয়া ভালো। নজরুলকে ঘিরে জমে-থাকা অতিশয়োক্তি কটূক্তি সন্দিগ্ধতা মিথ্যাচার প্রভৃতির জাল-জঞ্জাল থেকে প্রকৃত নজরুলকে উদ্ধার করার প্রয়াস আমার লেখা এই গ্রন্থে সম্পূর্ণতা পেয়েছে, এমন দাবি করি না। বই লেখার পর আরও অনেক তথ্য পাওয়া গেছে, আরও বহু কুয়াশা কেটে যাচ্ছে। হয়তো পরবর্তী কোনো সংস্করণে সে চেষ্টা আরও কিছুটা পুষ্টি ও পূর্ণতা পাবে। বাংলা আকাদেমির পক্ষে নজরুল *রচনাসমগ্র* সম্পাদনার গুরুদায়িত্বে অংশ নিতে পেরে আমি নজরুলের সমগ্র রচনাকে এই বঙ্গের পাঠকদের হাতে তুলে দেবার আনন্দময় কৃত্যে ও কর্তব্যে ধন্য হয়েছি। এও নজরুল-জীবনীর পরিপূরক কাজ। *মানিক রচনাসমগ্রের* দায়িত্ব সবে শেষ হয়েছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো লেখকের যাবতীয় সাহিত্যকর্মকে সুশৃঙ্খল সৌষ্ঠবে ও তথ্যনিষ্ঠ পরিচয়ে পাঠকবর্গের হাতে তুলে দেওয়া গেছে। বাংলা আকাদেমির এই কর্মকাণ্ড সব মহল থেকে অভিনন্দিত হয়েছে। এই জাতীয় সম্পাদনার গুণমান রক্ষায় আমার নিষ্ঠা ও পটুত্বের স্বীকৃতি দিয়ে বঙ্গীয় প্রকাশক সমিতি পাবলিশার্স অ্যাণ্ড বুক সেলার্স গিল্ড কয়েক বছর আগে বিশ্ব বই দিবসে আমাকে সংবর্ধনা জানিয়েছিলেন — স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য নন্দন চত্বরের সেই সভায় আমাকে সম্মাননা-স্মারক প্রদান করেন। এই ঘটনায় আমি অভিভূত। আমি এ অভিনন্দনের যোগ্য হতে চাই। 'তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি'। নজরুল রচনাসমগ্রের কাজ শেষ হওয়ার আগেই *সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতাসমগ্র* সম্পাদনার কাজ শেষ হয়ে যাবে বলে আশা করছি। আর সেই সঙ্গে আর একটি গুরুদায়িত্ব হাতে নিয়েছি। *সঞ্চয়িতা-য়* অন্তর্ভুক্ত নয় এমন রবীন্দ্রকবিতার একটি ব্যবহারযোগ্য সংকলন, *সঞ্চয়িতা* ২ প্রকাশ করতে চলেছেন পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। সঞ্চয়িতা-বহির্ভূত বহু জনপ্রিয় রবীন্দ্রকবিতা এখন একটি পূর্ণাঙ্গ সংকলনে পেয়ে রবীন্দ্রকাব্য-পাঠকরা খুশি হবেন বলে আমাদের প্রত্যাশা এই প্রস্তুয়মান বইটি ঘিরে। সংকলনের পালা শেষ হয়েছে। আশা করা যায়, ২০০৩-এ বইটি প্রকাশিত হবে।

প্রণতি মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রচর্চার সঙ্গে আমার পরিচয় দীর্ঘকালের। যে নিবিড় নিষ্ঠায় তিনি রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রাথমিক পাঠ গ্রহণ করেছিলেন টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটে এসে, তাকে ক্রমান্বয় অনুশীলনে, গভীরতর অধ্যয়নে, প্রায় তপশ্চর্যায় সমৃদ্ধ করেছেন তিনি। তাঁর গবেষণার কয়েকটি নিদর্শন রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞদের কাছে সমাদৃত হয়েছে। শান্তিনিকেতন আশ্রমের ইতিবৃত্ত সন্ধানে কিংবা রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জি প্রস্তুত করায় তিনি যে তথ্যসন্ধানী ঔৎসুক্যের পরিচয় দিয়েছেন, তার পরিণত রূপ তাঁর পিয়ারসন-জীবনী রচনাতেই প্রমাণিত হয়েছে। দীর্ঘকাল যাবৎ তিনি অক্লান্ত শ্রমে শ্রদ্ধায় ও একাগ্রতায় ক্ষিতিমোহন সেনের জীবনীর উপকরণ সংগ্রহ করে চলেছেন, এ সংবাদ আমার জানা ছিল। তাই বাংলা আকাদেমির পক্ষ থেকে একখানি নাতিদীর্ঘ ক্ষিতিমোহন-জীবনী লিখে দেওয়ার জন্যে তাঁবে অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু দীর্ঘতর গভীরতর অন্বেষাকে পাশে সরিয়ে পরিমিত হ্রস্ব জীবনী লেখায় তিনি সম্মত হননি। পরে তাঁর পূর্ণতর জীবনীর কাজ শেষ হলে আমিই ব্যক্তিগত উদ্যোগে সেটি বাংলা আকাদেমি থেকে প্রকাশের ব্যবস্থা করি। তার পরবর্তী অধ্যায়গুলি তো এখন সকলেরই জানা। শ্রীযুক্তা মুখোপাধ্যায় তাঁর পরিশ্রমের সেবার ও সাধনার যে পুরস্কার পেয়েছেন, তা তাঁর অহংকারকে প্ররোচিত করেনি। তাঁর রবীন্দ্রচর্চাকে সামান্য তৃপ্তি দিয়েছে, বলাই ভালো। মোটের উপর, আমার কথা আপাতত এখানেই শেষ করছি।

ছাত্রছাত্রীদের জন্যে বাণী বিতরণের অভ্যাস নেই। রবীন্দ্ররচনাংশই পুনরুচ্চারিত হবে মাত্র।

যে-কেহ মোরে দিয়েছ সুখ, দিয়েছ তাঁরই পরিচয়
সবারে আমি নমি
যে-কেহ মোরে দিয়েছ দুখ, দিয়েছ তাঁরই পরিচয়
সবারে আমি নমি।

এই তাঁরই অবশ্যই সেই রবীন্দ্রনাথ।

অধ্যাপক অরুণকুমার বসুর রচনাপঞ্জি

অধ্যাপক বসুর রচিত এবং সম্পাদিত গ্রন্থ, বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ এবং অপর লেখকের গ্রন্থের ভূমিকাগুলি তালিকাবদ্ধ করার একটি অসম্পূর্ণ প্রয়াস করা গেল। অসম্পূর্ণ কারণ, অধ্যাপক বসু লিখেছেন প্রচুর, হারিয়েছেন তার চেয়েও বেশি। সেগুলি উদ্ধার করা শুধু সময়সাধ্যই নয়, অনেকক্ষেত্রে দুঃসাধ্যও। তার একাংশের পরিচিতিমাত্র এখানে উল্লিখিত হল।

মৌসুমী মল্লিক

ক. প্রকাশিত গ্রন্থ

১. বাংলা কাব্যসংগীত ও রবীন্দ্রসংগীত, (দে'জ, ১৯৯৪)
২. শক্তিগীতি পদাবলী, (পুস্তক বিপণি, ১৯৮৩)
৩. রবীন্দ্র বিচিন্তা, (ওরিয়েন্ট, ১৯৮৩)
৪. ক্ষণিকের বাণীশিল্পী রবীন্দ্রনাথ, (টেগোর রিসার্চ ইন্সটিটিউট, ১৯৮৭)
৫. সামান্য সুখ প্রামাণ্য দুঃখ (সমতট প্রকাশনী, ১৯৭৬)
৬. তিনতাসের পালা, (সমতট প্রকাশনী, ১৯৮৬)
৭. কহত কবীর শুন ভাই সাধু (তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ, ১৯৯৯)
৮. নজরুল জীবনী (পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০১)
৯. সলিল থেকে সুমন এবং তারপর (সৃষ্টি প্রকাশন, ২০০১)

খ. রবীন্দ্রনাথ

১. নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ ও ফাল্গুনী (নাট্য একাডেমি পত্রিকা, ৫)
২. রবীন্দ্রশরৎ কথা (রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ ১৪, সংখ্যা ৩, শ্রাবণ আশ্বিন ১৩৮৩)
৩. কবিরে খুঁজিছ যেথায় সেথা সে নাহিরে (শারদীয় সপ্তাহ ১৮০৩)
৪. রবীন্দ্রনাথের বিদ্যাসাগর (পশ্চিমবঙ্গ, রবীন্দ্রসংখ্যা ১৪০৫)
৫. বীণা ফেলে দিয়ে এসো সুন্দরী (বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা, রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা)
৬. পদ্মাপারে রবীন্দ্রনাথ (বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রবীন্দ্রচর্চার একটি প্রতিবেদন, নন্দন, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭)
৭. বাঙালির রবীন্দ্রচর্চা আর বাংলাদেশের রবীন্দ্রচর্চার পার্থক্য (ঐকতান পত্রিকার রবীন্দ্রচর্চা সম্মেলনের ভূমিকা)
৮. জালিয়ানওয়ালাবাগ পঁচাত্তর বছর পরে (বিশেষ রবীন্দ্রস্মরণ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৪০১)
৯. রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শে সংগীতের স্থান (সেমিনার পেপার)
১০. রবীন্দ্রনাথ : শেষে অন্তরে পাই সাড়া (অষ্টম রবীন্দ্রচর্চা সম্মেলন, নভেম্বর ১৯৯৪, টেগোর রিসার্চ ইন্সটিটিউট)
১১. যারা আমার সাঁঝ সকালের গানের দীপে (শারদীয় সপ্তাহ ১৩০৪)

১২. রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস চিন্তা (পশ্চিমবঙ্গ, রবীন্দ্রসংখ্যা ১৩৯৪)

১৩. রবীন্দ্ররচনার ষত্ব ণত্ব (প্রাহ্ন, রবীন্দ্রসংখ্যা ১৯৯০-৯১)

১৪. খাপছাড়ার ব্যাকরণ কৌমুদী (আজকের সংবাদ বিভাকর, মে জুলাই ১৯৯৫)

১৫. উত্তর পঞ্চাশ (সান্নিধ্য, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, মে জুন ১৯৯১)

১৬. দুই ভুবনের নাগরিক (উদিত, ফাল্গুন, ১৩৯৯)

১৭. যে আমি আমারে বুঝিতে বোঝাতে নারি (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, বিভাগীয় পত্রিকা, ১৯৯৮)

১৮. ধান ভানতে মহীপালের গীত (সাম্প্রতিক রবীন্দ্রচর্চা, ঐকতান ১৯৯৬)

১৯. রবীন্দ্রজীবন ও রবীন্দ্রজীবনী : সাধ ও সাধ্যের সীমা অসীম (রবীন্দ্রভারতী রবীন্দ্রচর্চা কেন্দ্রের বিভাগীয় পত্রিকা ১৯৯৬)

২০. রবীন্দ্রনাথের নববর্ষ (পুরশ্রী, এপ্রিল ১৯৯৬)

২১. সান ইসিদ্রেয় রবীন্দ্রনাথ (প্রাহ্ন, রবীন্দ্রসংখ্যা ১৯৯৩)

২২. রবীন্দ্রসংগীতের স্বদেশ পর্যায় : একটি সমীক্ষা (দেশ, সাহিত্য সংখ্যা ১৩৯৩)

২৩. লাতিন আমেরিকা ও রবীন্দ্রনাথ (পশ্চিমবঙ্গ রবীন্দ্রসংখ্যা বৈশাখ ১৩০০)

২৪. এক নেটিভ কবি ও এক কালো শিল্পী (সপ্তাহ, শারদীয় সংখ্যা, ১৯৯৮)

২৫. পঁচিশে বৈশাখ চলেছে .... (রবীন্দ্রমিলন মেলা ১৪০৪)

২৬. ঔপন্যাসিক যখন আবৃত্তিগুরু (বাল্মীকিপত্রিকা, জানুয়ারী ১৯৯৮)

২৭. রবীন্দ্রনাথের নাট্যসংগীত (বিশ্ববীণা পত্রিকা, ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা এপ্রিল — জুন ১৯৬৮)

২৮. রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য বাল্মীকিপ্রতিভা (রবীন্দ্রভারতী সোসাইটি সাহিত্যপত্র বর্ষ ২, সংখ্যা ১, বৈশাখ ১৩৮৮)

২৯. রবীন্দ্রসংগীতের অর্থপূর্ণ গায়ন (সেমিনার পেপার)

৩০. তোমায় নতুন করে পাব বলে (লৌকিক উদ্যান, লোকসংগীত সংখ্যা ১৯৯৭)

৩১. রবি বাউলের উৎস মুখে (রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ — পৌষ ১৩৮৭)

৩২. রবীন্দ্রসংগীতের রূপ রূপান্তর (রবীন্দ্রসংগীত ১, রবীন্দ্রভারতী, রবীন্দ্রসংগীত, বিভাগীয় পত্রিকা)

৩৩. দূর রজনীর স্বপন লাগে (বিষয় কলকাতা, জাতীয় গ্রন্থাগারকর্মী সমিতি)

৩৪. 'হিং, টিং ছট : রবিবাবু কি মনে করিয়া এই কবিতা লিখিয়াছিলেন (তথ্যকেন্দ্র মে ১৯৯৭)

৩৫. রবীন্দ্রসংগীতের ক্রমবিকাশ (ঋকবৈদিক, মে ১৯৮৬)

৩৬. পুরানো বাংলা গান ও রবীন্দ্রনাথ (বিশেষ বাংলাগান সংখ্যা, মাঘ ১৩৯৫)

৩৭. শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান (রবীন্দ্রসংগীত ২, রবীন্দ্রভারতীর রবীন্দ্রসংগীত বিভাগীয় পত্রিকা, বৈশাখ ১৯৯৮)

৩৮. রবীন্দ্রসংগীতের দুই-ভুবন (গীতিকুঞ্জ স্মারকপত্রিকা, এপ্রিল ১৯৯৮)

৩৯. রবীন্দ্রনাথের প্রাবন্ধিক পরিচয় (পশ্চিমবঙ্গ, রবীন্দ্রসংখ্যা, ১৩৯৪)
৪০. রবীন্দ্রসংগীতের স্বদেশ পর্যায় (রবীন্দ্রভারতী রবীন্দ্রসংগীত বিভাগীয় পত্রিকা ১৯৮২)
৪১. গীতাঞ্জলির গান (বারোমাস আগষ্ট, ১৯৭৮)
৪২. সাম্প্রতিক রবীন্দ্রচর্চা (আকাদেমি পত্রিকা, প্রথম সংখ্যা ১৩৯৪)
৪৩. রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসংগীত (রবীন্দ্রসংগীতায়ন ১, প্যাপিরাস, সেপ্টেম্বর, ১৯৮৮)
৪৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : কবিমানস ও কাব্য পরিচিতি (আধুনিক বাংলাসাহিত্য, প্রতিভা : স্বাতন্ত্র্যবিচার, জুলাই ১৯৮৭)
৪৫. রবীন্দ্রসংগীতের স্বদেশপর্যায়, দু একটি বিনীত প্রস্তাব (বাংলাসংগীতমেলা স্মারক গ্রন্থ এপ্রিল ১৯৯৮)
৪৬. লিপিকার গদ্যভাষা (বাংলা গদ্যশৈলী বিজ্ঞান, সমতট ১৩৮৮)
৪৭. একটি রবীন্দ্রনাটকের অভিনয় : সেকাল ও একাল [গৃহপ্রবেশ নাটকের অভিনয় সম্পর্কে] (রবীন্দ্রভাবনা জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯৮)
৪৮. ভারতীয় সাহিত্যে রবীন্দ্র-উত্তরাধিকার (রবীন্দ্রভাবনা, অক্টো-ডিসে ২০০১)
৪৯. আঁধার রাতে একলা পাগল (রবীন্দ্রভাবনা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০২)
৫০. এবারের বর্ষশেষ [শান্তিনিকেতনে বর্ষান্ত ভাষণের মুদ্রিত রূপ] (রবীন্দ্রভাবনা, এপ্রিল-জুন, ২০০৩)
৫১. রবীন্দ্রচেতনায় বর্ষা: কবিতায় গল্পে - নাটকে- প্রবন্ধে - গানে (রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্রসংগীত বিভাগ প্রকাশিত বক্তৃতামালা, আগষ্ট, ১৯৯৯)

গ: স্মৃতিচারণা ও ব্যক্তিতর্পণ

গ. ১ স্মৃতিচারণা

১. জার্নাল থেকে (সপ্তাহ, সাহিত্য সংখ্যা, শ্রাবণ ১৪০৩)
২. গীতিকারের ডায়েরি থেকে (নন্দন, মে ১৯৯৪)
৩. একটি অন্যায় প্রার্থনা ও একটি অসৎ মমতা (বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ প্রশান্তকুমার বসুর স্মরণিকায়, ১৯৯৫)

গ: ২ ব্যক্তিতর্পণ

১. গুণময় মান্নার রবীন্দ্রনাথ (গুণময় মান্নার সংবর্ধন সংখ্যা ১৯৯৮)
২. রবীন্দ্রচর্চায় কেন্দ্রানুগ দেবদাস (রবীন্দ্রভাবনা, জানুয়াবী মার্চ, ১৯৯৮)
৩. প্রভাত কুমার : শ্রদ্ধায় স্মরণে (গণনাট্য, ডিসেম্বর, ১৯৮৫)
৪. নীলাদ্রিশেখর : শ্রদ্ধায় স্মরণে (আবৃত্তিলোকের স্মরণিকা, জানুযারী ১৯৯৩)
৫. গানের ফ্রেমে ঝাপসা কৈশোরের ছবি (রবিতীর্থের পঞ্চাশবছর উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক পত্রিকা)
৬. রবীন্দ্রসংগীতের এক বিদগ্ধ আধিকারিক (উদীচী, আষাঢ় পৌষ ১৩৯৪)
৭. সুকুমার সেন : শ্রদ্ধায় স্মরণে (নন্দন, এপ্রিল, ১৯৯২)
৮. আমার সেইকালের গুরুদের চরণে (বেলেঘাটা দেশবন্ধু হাইস্কুল স্মারক পুস্তিকা,

১৯৯৭-৯৮)

৯. শ্রী প্রফুল্লকুমার দাস : গীতপ্রাণ সাধক (প্রাক্তনী সুরঙ্গমা আয়োজিত প্রফুল্লকুমার দাস সংবর্ধনা সংখ্যা, এপ্রিল, ১৯৯৩)

১০. কলকাতার সংগীতচর্চা (অধ্যাপক নিশীথরঞ্জন রায়ের প্রতি শ্রাদ্ধার্ঘ)

১১. হেমন্ত মুখোপাধ্যায় (শারদীয় যুবমানস ১৩৯৭)

১২. বাংলা বাক্শিল্পের স্থপতি

১৩. রবীন্দ্র সমালোচনার নতুন অধ্যায় (অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্যের প্রতি নিবেদিত শ্রদ্ধার্ঘ্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বর্ষ, ১১ সংখ্যা ১)

১৪. আমার ঢালা গানের ধারা (দূরের নীলিমা, প্যাপিরাস, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭)

১৫. 'পৌঁছিলে পূর্ণিমাতে' (মোহর, ডিসেম্বর ১৯৯৮)

১৬. দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার্ঘ (দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের সংগীত জীবনের পঞ্চাশ বছর, সেপ্টেম্বর ১৯৯৫)

১৭. রবীন্দ্রপ্রতিভার উন্মেষকার (পথের ছায়া সরণিতে)

১৮. রবীন্দ্রসংগীত যাঁর যাত্রাপথের আনন্দগান (শৈলজারঞ্জন মজুমদার জন্মশতবর্ষপূর্তি সংখ্যা, রবীন্দ্রভাবনা, জানুয়ারি-মার্চ, ২০০০)

১৯. রবীন্দ্রভাষ্যকার প্রমথনাথ বিশী, (

২০. আকাশে বিদ্যুৎ বহ্নি অভিশাপ দিল লেখি (দেবব্রত পালিতের প্রয়াণে স্মরণ, রবীন্দ্রভাবনা অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০২)

২১. অনন্তকুমার চক্রবর্তী: রবীন্দ্রসংগীতের বিদগ্ধ ভাষ্যকার

কবি—কবিতা

১. কলকাতা' ৯২ (অয়শ্চক্র, পূজা সংখ্যা ১৩৯৯)

২. কবিতা সকলের, মুষ্টিমেয়ের নয় (সমকালীন বাংলা কবিতা, সেমিনার গ্রন্থমালা ১)

৩. কবিতা পঞ্চাশৎ (এবং মুশায়েরা, জানুয়ারী মার্চ ১৯৯৮)

৪. উৎপলের সঙ্গে ছন্দোভেদ (বাল্মীকি পত্রিকা, ১৯৯৬)

৫. জীবনানন্দের জন্মশতবর্ষে (নগরকথা, বইমেলা সংখ্যা, জানুয়ারী ১৯৯৯)

৬. 'ঘুরে ঘুরে কথা বলা' : ছন্দের জীবনানন্দ (শিলীন্ধ্র পত্রিকা, ১৯৯৮)

৭. জীবনানন্দের কবিতায় বাংলা ছন্দের প্রকৃতি (কবিতা সীমান্ত, জীবনানন্দ সংখ্যা, ১৯৯৯)

৮. সকলেই (জীবন-এর) কবি নন, কেউ কেউ (মৃত্যু-র) কবি (নন্দন, ১৯৯৯)

৯. ধূসর কাব্যলিপি (পলিমাটি, ১৯৯৯)

১০. রূপের বিতান করুণানিধান (রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা, বর্ষ, ১৫, সংখ্যা ৪, কার্তিক পৌষ ১৩৮৫)

১১. কবি অতুলপ্রসাদ সেন (রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা, বর্ষ ৯, সংখ্যা ৪, ১৯৭১)

১২. বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস-ভাষ্যকার কালিদাস রায় (কথা সাহিত্য), ৪০ বর্ষ, একাদশ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৯৬)

১৩. রেখো মা দাসেরে মনে (গণশক্তি, রবিবারের পাতা, ২৪ শে জানুয়ারী, ১৯৮৮)
১৪. জন্মশতবর্ষের ভাবনা (নজরুল) (গণশক্তি মে, ১৯৯৯)
১৫. নজরুলের গান: কালান্তরের দৌবারিক (সপ্তাহ, মে ১৯৯৯)
১৬. কাজী নজরুল ইসলাম (নবকল্লোল, মে ১৯৯৯)
১৭. ভুল হয়ে গেছে বিলকুল (রোপন, শারদীয় ১৪০৫)
১৮. অঞ্জলি লহ মোর, সঙ্গীতে (নন্দন, জানুয়ারী, ১৯৯৯)
১৯. আঁচল ভরা ফুল (রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা, বর্ষ, ১৪, সংখ্যা ৪)
২০. নজরুল : তাঁর রাজনৈতিক জীবন, গানের প্রতিষ্ঠা (নন্দন)
২১. ছয়মাত্রায় ছন্দ : নজরুলের রক্তকরবী (কোরক সাহিত্য পত্রিকা, বইমেলা, ১৪০৫)
২২. নীলদর্পণে রবীন্দ্র-নজরুল (ওয়েবকুটা মুখপত্র, নজরুল শতবর্ষ সংখ্যা, ১৯৯৯)
২৩. বসন্ত প্রসঙ্গে (মন্ত্র নামক প্রতিষ্ঠানের স্মরণিকার প্রকাশিত ১৯৯৯)
২৪. নজরুলের দেশোদ্দীপনার গান (বিশ্ববীণা, পঞ্চমবর্ষ, প্রথমসংখ্যা, বৈশাখ — আষাঢ় ১৩৭৭)
২৫. বাংলার প্রথম আবৃত্তিকার কবি (বিষয় : আবৃত্তি, আগষ্ট ১৯৮৫)
২৬. রামচরিত মানস (রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা, বর্ষ ১১, সংখ্যা ৪)
২৭. রামপ্রসাদের সঙ্গে একালে কিছুক্ষণ (প্রমা ১৯৯৭)
২৮. সুকান্ত প্রসঙ্গে (বাহান্নতম জন্মবার্ষিকী স্মারক পত্রিকা সেপ্টে, ১৯৭৮, পূর্ব কলিকাতা কবি সুকান্ত জন্মোৎসব কমিটি)
২৯. কবিতা চোখে দেখার, না কানে শোনার? (শিল্পলিপি, ২০০১)
৩০. কবিতার গান, (বিভাব, কবিতা সংখ্যা, ২০০২)

ঘ : খ : কথা সাহিত্য ও লেখক

১. সাধের তরণী আমার (বঙ্কিম মৃত্যুশতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ, ১৯৯৪)
২. তারাশংকর : রাজনীতির জানালা থেকে (শরক্ষেপ, শারদীয় সংখ্যা ১৪০৫)
৩. অশ্বমেধের ঘোড়া : দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (গণতান্ত্রিক লেখক কর্তৃক আয়োজিত দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (গণতান্ত্রিক লেখক কর্তৃক আয়োজিত দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মরণ সভায় পঠিত।)
৪. যে প্রাবন্ধিকের কাছে আমরা ধৃতঋণ ও নতগ্রীব (কথা সাহিত্য শ্রী অন্নদাশংকর রায় সম্বর্ধনা, বইমেলা, ১৪০৪)
৫. সেকালের নভেল : একালের (সমতট শতক : প্রবন্ধ ১৯৯০)
৬. হাঁসুলিবাঁকের উপকথা (রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা)
৭. শরৎ সাহিত্যচর্চার অর্ধশতক (বাংলা বিভাগীয়পত্রিকা, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯৪-৯৫)
৮. পদ্মানদীর মাঝি (মানিক সাহিত্য সমীক্ষা, নারায়ণ চৌধুরী সম্পাদিত)
৯. অভিজিৎ তরফদারের গল্প, (সাহিত্য-সংস্কৃতি পত্রিকা গল্পসংখ্যা, ১৯৯৯)

ঘ: গ: প্রবন্ধ ও নাটক

১. বাংলা নাটক, প্রগতির দিগন্ত (নন্দন, ২৯বর্ষ, মে ১৯৯৩)
২. আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ (সাহিত্য সংস্কৃতি বর্ষ ৯, সংখ্যা ৪)

ঘ: ঘ: লোকসংস্কৃতি

১. লালনগীতি : সুর ভুলে যে ঘুরে বেড়াই (লোকশ্রুতি ১০)
২. লালন প্রসঙ্গে (কদমখালি বাউলমেলার লালন স্মারক পত্রিকায় প্রকাশিত)
৩. মৌলবাদের প্রতিষেধক (লালন স্মারক পত্রিকা, লালনমেলা ভীমপুর, ১৯৯৮)
৪. পূর্বভারতের লোকসংস্কৃতি (পূর্বভারতীয় সংস্কৃতির রূপরেখা তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ, এপ্রিল ১৯৭৭)
৫. লোকগীতি প্রসঙ্গ ও রচয়িতা তত্ত্ব (রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা, ২য় বর্ষ, ১৯৮১)
৬. লালন চর্চার শতবর্ষ : এপার বাংলায় (লালন প্রয়াণ শতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ, কার্তিক ১৩৯৭)
৭. মানবতাবাদী লালন (সংভরণ, ২য় ও ৩য় সংখ্যা, জানুয়ারী-জুন, ১৯৯১)
৮. সব লোকে কয় লালন কি জাত (নন্দন, আষাঢ়—শ্রাবণ, ১৩৯৮)
৯. খুঁজলে জনম ভোর মেলে না (শঙ্খচিল নদীয়া, ১৩৯৮)
১০. লালন বলে জেতের কি রূপ (মরমীয়া লালন, এপ্রিল ১৯৯২)
১১. লালনের গানে আমাদের মৈত্রীর রূপমঙ্গ
১২. লোকসংস্কৃতি চর্চাও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা
১৩. লালন ফকির ও তার গান (বসন্তবিহারী স্মারক বক্তৃতা, নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯৯১)

ঙ. গীতিসাহিত্য

১. বাংলা গান : জীবনমুখী : রবীন্দ্রনাথ (রবীন্দ্রস্মরণ ১৯৯৪)
২. অতুলপ্রসাদ সেন (তত্ত্বকৌমুদী, ৮৯ বর্ষ, ১১ ও ১২ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৭৩)
৩. পুরনো বাংলাগানে সমাজবিদ্রূপ (নন্দন, ভাদ্র—আশ্বিন ১৩৯৭)
৪. মেশিনগানের সম্মুখে গাই জুঁই ফুলের এই গান (রাজ্য সংগীত একাডেমির বুলেটিন)
৫. শান্তি জীবনের এক নাম (কথা, সুর ও স্বরলিপি, রাজ্য সংগীত একাডেমির বুলেটিন)
৬. শতবর্ষে বাংলা গান (দৈনিক বসুমতী, এপ্রিল ১৯৯৩)
৭. সুপ্রভাত, আধুনিক বাংলা গান (শারদীয় যুবমানস ১৪০১)
৮. পুরনো কলকাতার অনুরোধের আসর (পশ্চিমবঙ্গ কলকাতা ৩০০ ১৯৯০)
৯. ফ্যাসিবাদ বিরোধিতায় বাংলা গণসংগীত (বাংলা আকাদেমি পত্রিকা, ১৯৯৫)
১০. মানুষের কাছে দায়বদ্ধ গীতিকার সুরকার (কাজী কামাল নাসেরের গান, যুবমানস, ডিসেম্বর ৯৫, জানুয়ারী' ৯৬)
১১. ও আলোর পথযাত্রী ....এখানে থেমো না (নন্দন, শারদ সংখ্যা ১৪০১)
১২. রূপচাঁদের খাঁচা (প্রতিবাদী কলকাতা, ঐকতান গবেষণাপত্র, ১৯৯১)
১৩. নতুন প্রজন্মে আধুনিক বাংলা গান (স্বপ্নদীপ শারদ পত্রিকা ১৯৯৪)

১৪. ঠাকুরবাড়ির গান ও বাংলা গানের নবজাগরণ (অগ্রস্থিত)
১৫. সলিল চৌধুরি : শ্রদ্ধায় স্মরণে কে দেবে সেই ভেরী
১৬. একটি শহীদ বেদী হয়ে রয়ে যাব (নন্দ, জানুয়ারী, ১৯৯৬)
১৭. আধুনিক বাংলা গান : অকাল আকাল একাল (বিনোদন, বিচিত্রা, বর্ষপূর্তি সংখ্যা ডিসেম্বর ১৯৯৫)
১৮. বাংলা গান : শতবর্ষের দিগন্তে (বাংলা গানমেলা স্মরকগ্রন্থ ১৯৯৭)
১৯. গানের পূজো এখন আর সেই (দৈনিক বসুমতী, সেপ্টেম্বর ১৯৯৮)
২০. বিষ্ণুপুরের গান (একটি বক্তৃতার অনুলিপি)
২১. একালের বাংলা গান প্রসঙ্গে (গান মেলা স্মারক গ্রন্থ ১৯৯৮)
২২. সলিল চৌধুরী (প্রগতির পথিকেরা, ১৯৩৬-১৯৪০, একুশ সংসদ)
২৩. গীতিকার সলিল চৌধুরী (মনন, আশ্বিন ১৯৯৭)
২৪. কেউ বা চলে ডাইনে বা কেউ বাঁয়ে চলি (গণনাট্য স্মারকসংখ্যা ১৯৯৮)
২৫. পুজোর গানের সেকাল একাল (দৈনিক বসুমতী, শিলিগুড়ি, রবিবারের পৃষ্ঠা)
২৬. শতবর্ষের নাট্যসঙ্গীত (শারদীয় সুরছন্দা, ১৯৮৩)
২৭. ব্রহ্ম সংগীত ও ব্রাহ্ম সমাজ (রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা বর্ষ, ১১, সংখ্যা ১)
২৮. গীতিকার হেমেন্দ্রকুমার (আকাশবাণী কলকাতা থেকে ৭ই মার্চ ১৯৮৯ মঙ্গলবার 'অভিজ্ঞান' অনুষ্ঠানে সম্প্রচারিত)।
২৯. কলকাতার সংগীত ইতিহাস : সূচনা পর্ব (কলকাতা ৩০০, রাজ্য পুস্তক পর্ষদ)
৩০. কবিতা লিখিয়া ভারতোদ্ধার হইবে না! (সপ্তাহ সাহিত্যসংখ্যা জৈষ্ঠ, ১৪০৫)
৩১. মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের সংগীতিক পটভূমি (বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)
৩২. কুমকুম চট্টোপাধ্যায়ের গান শুনে (রবীন্দ্রভাবনা, ১মার্চ, ১৯৭৭)
৩৩. শান্তিদেব ঘোষের কণ্ঠে, রবীন্দ্রভাবনা, এপ্রিল, ১৯৭৭
৩৪. ইন্দিরার রবীন্দ্রসংগীত প্রদর্শনী, রবীন্দ্রভাবনা মে, ১৯৭৭

চ: অন্যান্য

চ: ক: বহির্বঙ্গে বাংলা সাহিত্য

১. প্রবাসে বাংলাসাহিত্য চর্চা : পশ্চিম ভারত (সেমিনার পেপার)
২. বাংলা কবিতা ঈশানে নৈঋতে (পাক্ষিক বসুমতী, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩)
৩. গোমতী উপত্যকায় কবিতার মেঘপুঞ্জ (বিভাব, কবিতা সংখ্যক, ১৯৯৮)
৪. গোমতী থেকে শাখানটাং : ত্রিপুরার বাংলা কবিতা (নন্দন, স্মারক সংখ্যা ১৯৯৪- ৯৬)
৫. বাংলা কবিতা : আরব সাগরের কাছাকাছি

চ: খ: পুস্তক পর্যালোচনা

১. সৎ স্মৃতিচারণা (নন্দন, মার্চ, ১৯৯৮)
২. হাসপাতালের অভয়ারণ্যে একা (নন্দন)

৩. সমকালের দর্পণে বিদ্যাসাগর (গণশক্তি, ২৫শে এপ্রিল ১৯৯৪)
৪. প্রতিনিধিমূলক শ্রেষ্ঠ রচনা কিনা সন্দেহ (গোপাল হালদারের শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ সম্পর্কে আলোচনা, যুগান্তর ১৯৮৭)
৫. বাংলা পুঁথি থেকে সামাজিক ইতিহাস (অণিমা মুখোপাধ্যায়ের আঠারো শতকের বাংলা পুঁথিতে ইতিহাস প্রসঙ্গে নামক বইয়ের সমালোচনা, যুগান্তর ১৯৮৭)
৬. স্বল্প তথ্য ভাসা আলোচনা (সৃষ্টির বৈচিত্র্য : রবীন্দ্রনাথ শিশির কুমার সিংহ, গ্রন্থের আলোচনা, যুগান্তর ১৯৮৭)
৭. সংস্কৃতির কালবেলা : সংস্কৃতির সুবাতাস (মানস মুখোপাধ্যায়ের সংস্কৃতির বেলা অবেলা'র আলোচনা গণশক্তি, ১৯৮৮)
৮. রবীন্দ্রনাট্যের অতিশয়োক্তিহীন আলোচনা ('রবীন্দ্রনাথের নাট্যপ্রতিভা' সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল)
৯. মূলানুগ কাব্যধর্মে এবং তথ্যভাষ্যে বিশিষ্ট (রাজা অয়দিপাউস্' বাংলা রূপান্তর শিশিরকুমার দাস, যুগান্তর ১৯৮৯)
১০. রবীন্দ্র কবিতা শতক, প্রথম খণ্ড : জগদীশ ভট্টাচার্য, (রবীন্দ্রচর্চা, এপ্রিল; ১৯৭৫)
১১. সূর্যাস্তের আগে রবীন্দ্রনাথ (রবীন্দ্রভাবনা, অক্টোবর, ১৯৮১)
১২. শান্তিনিকেতনে সুখের বারমাস্যা, অমিতাভ চৌধুরী, (রবীন্দ্রভাবনা, অক্টোবব, ১৯৮১)
১৩. রবীন্দ্রবিদূষণ ইতিবৃত্ত : আদিত্য ওহদেদার (রবীন্দ্রভাবনা, ডিসেম্বর ১৯৮৬)
১৪. রবীন্দ্রসংগীত বিচিত্রা : অমিয়মুকুল দে (রবীন্দ্রভাবনা, মার্চ ১৯৯৮)
১৫. রবীন্দ্রভুবনে পতিসর : আহমেদ রফিক (রবীন্দ্রভাবনা ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৯)
১৬. রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত পত্রাবলী : আবুল হাসান চৌধুরী, (রবীন্দ্রভাবনা, অক্টোবর - ডিসেম্বর, ২০০০)
১৭. রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ : কয়েকটি সাম্প্রতিক সমীক্ষা
ক) রাজা ও কবি : অরুণোদয় সাহা
খ) ২৪ শে বৈশাখ · অমিতাভ ঘোষ ও শ্যামল দাশ (সম্পা)
গ) রবিজীবনে খেলা ও খেলা ভোলার দিন : সুমিতা সাহা (রবীন্দ্রভাবনা, এপ্রিল, - জুন, ২০০১)

চ: গ: ভ্রমণ

১. রবিদীপিত মরিশাস (শারদীয় দৈনিক বসুমতী, ১৯৯১)
২. সূর্যকন্যা মরিশাসের প্রাঙ্গণে (নন্দন, শারদসংখ্যা, ১৩৯৮)
৩. মরিশাসে রবীন্দ্রজন্মোৎসব (পাটনা বাংলা একাদেমি পত্রিকা)

চ: ঘ বিচিত্র প্রবন্ধ

১. শিশুশিক্ষা ও লিপিসংস্কারের সমস্যা (প্রসঙ্গ বাংলা ভাষা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি)
২. এখনও বিশ্বাস হারাইনি (রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা)
৩. 'সঠিক মনোঞ্জরন' একটি সাংস্কৃতিক আয়ুর্বেদীয় (ব্যঙ্গ রচনা, নন্দন, শারদ সংখ্যা ১৩৯৯)

৪. গ্রামীণ সাংবাদিকতার পুরোধা হরিনাথ মজুমদার (নন্দন শারদসংখ্যা ১৯৯৩)
৫. এই দুনিয়ায় থাকতে হলে (গল্প অনুবাদ, নন্দন ১৯৯২)
৬. ১৪০০ সাল : শতবর্ষ জীবেষু (নন্দন ১৪০০)
৭. সংবাদ প্রভাকর (ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ছদ্মনামে, নন্দন ১৯৯৩)
৮. তখন চারু এখন (দিগন্ত বলয়, ২৪ বর্ষ, সংখ্যা ২, এপ্রিল জুন ১৯৯১)
৯. বাংলার সাংগীতিক ঐতিহ্য ও অবদান (জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর ঐতিহ্য ও অবদান, ঐকতান গবেষণা পরিষদ, শ্রাবণ ১৩৯৫)
১০. বাংলায় ব্রেশ্‌ট : একটি অসম্পূর্ণ আলাপচারিতা (শারদীয় নন্দন, ২০০২)
১১. বইকুণ্ঠের পাতা (নাগরিক, ২০০১)
১২. বাঙালি কবির জাপানি বউ? (নন্দন, শারদ সংখ্যা ২০০১)

চ: ৎ সম্পাদিত গ্রন্থ

১. একেই কি বলে সভ্যতা (ওরিয়েন্ট ১৯৮৫)
২. বিল্বমঙ্গল (ওরি য়েন্ট, ১৯৯২)
৩. সাজাহান (ওরিয়েন্ট, ১৯৮০)
৪. কপালকুণ্ডলা (ওরিয়েন্ট, ১৯৬৬)
৫. কৃষ্ণকান্তের উইল (ওরিয়েন্ট, ১৯৬৪)
৬. মেঘনাদবধ কাব্য (ওরিয়েন্ট, ১৯৯১)
৭. বৈষ্ণব পদাবলী (বামা পুস্তকালয়, ১৯৯৮)
৮. রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ (পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৭)
৯. বাংলা গদ্য : শৈলীবিজ্ঞান (সমতট, ১৯৮১)
১০. বাংলা গদ্য জিজ্ঞাসা (সমতট, ১৯৯২)
১১. আবীর (সমতট, ১৯৮০)
১২. এই দশকের ছোটগল্প (সমতট ১৯৭৬)
১৩. আলাউদ্দিন খাঁ : জীবনসাধনা ও শিল্পী (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমি, ১৯৮৯)
১৪. নব সংস্করণ শাক্ত পদাবলী, (গ্রন্থবিকাশ, ২০০১)

চ.চ ভূমিকা

১. কাব্যপ্রতিধ্বনি (ওরিয়েন্ট, ১৯৬৮)
২. শঙ্কু মহারাজ : শ্রেষ্ঠ গল্প (দে'জ ১৯৯৮)
৩. শঙ্কু মহারাজ : হিমালয় (১) (মিত্র ও ঘোষ ১৯৮৩)
৪. শঙ্কু মহারাজ : হিমালয় (২) (মিত্র ও ঘোষ ১৯৮৩)
৫. শঙ্কু মহারাজ : হিমালয় (৩) (মিত্র ও ঘোষ ১৯৯৩)
৬. শঙ্কু মহারাজ : হিমালয় (৪) (মিত্র ও ঘোষ ১৯৯৭)
৭. বাংলা কৌতুক নাটক ও রবীন্দ্রনাথ : মিন্টু দাশগুপ্ত (প্রয়াস ১৯৯৭)
৮. আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচনাবলী (সপ্তম খণ্ড) (মিত্র ও ঘোষ ১৯৯১)

৯. সুমথনাথ ঘোষ রচনাবলী (১) (মিত্র ও ঘোষ ১৯৯১)
১০. তারাশংকর রচনাবলী (বিংশ খণ্ড) (মিত্র ও ঘোষ ১৯৮২)
১১. সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী (সপ্তম খণ্ড) (মিত্র ও ঘোষ ১৯৭৬)
১২. গজেন্দ্র কুমার মিত্র রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড) (মিত্র ও ঘোষ ১৯৮৭)
১৩. পূর্ববাংলার লোকসংগীত (দিনেন্দ্র চৌধুরী সম্পাদিত ১৯৯৭)
১৪. রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলা (বামা পুস্তকালয়, ১৯৯৮)
১৫. পথে প্রবাসে (গ্রন্থবিকাশ, ২০০২)

ভাস্কর বসু রচিত কিছু গান

অধ্যাপক অরুণকুমার বসুর আর একটি বড় পরিচয় যে তিনিই গীতিকার ভাস্তর বসু। ভাস্কর বসু রচিত বহু গান আমরা অনেকেই আশৈশব শুনে এসেছি। তাঁর গানগুলি সবসময়েই ছিল ব্যতিক্রমী। লোককথা, রূপকথা ও উপকথার বিষয় এবং চরিত্রদের নিয়ে তিনি গান লিখেছেন অনেক। গানে কিন্তু তারা পেয়েছে নতুনত্বের আলো। তাঁর এইসব গানের শিকড় ঐতিহ্যের ভূমিতে প্রোথিত হলেও শাখাপ্রশাখা আধুনিকতায় আকাশচারী। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে তাঁর রচিত গীতিনাট্যগুলি সম্পর্কেও বোধহয় একই কথা বলা যায়। ময়মনসিংহগীতিকা থেকে শুরু করে আরব্যরজনী পর্যন্ত তাদের বিষয়ের বিস্তার। সেগুলিকে তিনি এই বাংলার মানসের উপযোগী করে তুলেছেন কল্পনাশক্তি ও ভাষার প্রসাদগুণে। গান লিখেছেন 'আনন্দমঠ' যাত্রাপালার জন্য, মহালয়ার সকালে প্রচারিত দূরদর্শনের অনুষ্ঠানের জন্যেও। সম্ভবত, এ যাবৎ তাঁর রেকর্ড হওয়া শেষ গানগুলি বাংলার মনীষীদের স্মরণ করে — 'স্মরণীয় যাঁরা' নামে এই ক্যাসেটের গানগুলিতে সুরারোপ করেছেন অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। আকাশবাণীতে স্টুডিও রেকর্ডেও তাঁর কিছু গান রেকর্ড হয়েছে ও প্রচারিত হয়েছে। এইরকম একটি গান— 'ও মন বাওরে আশার পানসিখানি ভালোবাসার সুরে সুরে' জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের সুরে গেয়েছিলেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ভাস্কর বসু রচিত এবং রেকর্ড হওয়া গীতিনাট্য ও গানের একটি অসম্পূর্ণ তালিকা আগ্রহী সংগীতরসিক পাঠকের জন্য দেওয়া হল :

গীতিনাট্য

১. আলাদিন আলাদিন
২. এক যে ছিল শেয়াল
৩. কাজলরেখা
৪. ঠাকুরমার ঝুলি (বুদ্ধু-ভুতুম ও লালকমল-নীলকমল)
৫. হিংসুটে দৈত্য
৬. সোনাই-মাধব

ভাস্কর বসুর গানের তালিকা (অসম্পূর্ণ)

১. অশোক বনের বন্দিনী গো
২. অরুণ বরুণ কিরণমালা
৩. অহল্যা কন্যা ঘুম ঘুম কি ভাঙবে না
৪. আমি যদি ছুটি পাই বলি তবে শোনো ভাই
৫. উঠো উঠো মা গৌরী হিমানী আর নাই
৬. উঠো উঠো সুরজাই ঝিকিমিকি দিয়া

৭. এই ছায়াবীথীতলে ফাগুন আসে না আর
৮. এপারে গঙ্গা ওপারে গঙ্গা
৯. ও মন বাওরে আশার পানসিখানি
১০. কবে তুমি আসবে বলে
১১. খোলা জানালার ধারে মাথা রেখে
১২. চন্দ্রকলা বরণডালা দোলায় চেপে যায়
১৩. জ্যোছনা বিছানো আঙিনায় ছিন্ন আঁচল পাতিয়া
১৪. টাকডুম টাকডুম ডুমাডুম
১৫. তুমি কাঁকন কখন বাজিয়ে গেলে
১৬. তোমারই তুলনা তুমি
১৭. নগরে বন্দরে নিথে প্রান্তরে
১৮. পানকৌড়ি পানকৌড়ি, কোন দেশে যাও ভাই
১৯. পৌষালি সন্ধ্যার ঘুম ঘুম তন্দ্রা
২০. বলো তো আরশি তুমি মুখটি দেখে
২১. বিদেশিনী কাদের রানী পাল্‌কি চড়ে চলেছে
২২. বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদে এল বান
২৩. বেহুলা বেহুলা বউ, এগাঙে কুটিলা ঢেউ
২৪. ভাঙা তরীর শুধু এ গান
২৫. মৃণাল বাহুলতা ঘেরিয়া কাঁকন রিনিঝিনি বাজে না
২৬. যমুনাবতী সরস্বতী, কাল যমুনা লীলাবতী
২৭. রূপকাঠি গাঁয়ে শ্যামলী মেয়েটি পথ চলে
২৮. শুভ জন্মদিন
২৯. সজলপুরের কাজলা মেয়ে নাইতে নেমেছে
৩০. সুয়োরানী ঘুমায় সোনার বাসরে/আর দুয়োরানী কাঁদে ঘরে ঘরে
৩১. সে এক পাহাড়ি বাংলো থেকে
৩২. সোনার নাও বেয়ে ব্যথার গান গেয়ে
৩৩. সোনার হরিণ ভালোবাসা বুঝিনি তার ছল
৩৪. সোনালি মেঘ রূপালি মেঘ বাড়ি আছো নাকি
৩৫. হলুদ বনে বনে আমার নাকছাবিটি হারিয়ে গিয়ে

তৃতীয় পর্ব

প্রসঙ্গ প্রণতি মুখোপাধ্যায়



ক্ষিতিমোহন সেন ও অর্ধশতাব্দীর শান্তিনিকেতন গ্রন্থের অমর্ত্য সেন রচিত মুখবন্ধ

মুখবন্ধ

ক্ষিতিমোহন সেনকে শ্রেণীতে ফেলা সহজ কাজ নয়। একদিকে তিনি পণ্ডিত, অন্যদিকে সাধক। একদিকে প্রাচীন পুঁথির পাঠক, অন্যদিকে [illegible] গ্রামীণ সংগ্রহে অদম্য উদ্যম। একদিকে গূঢ় শাস্ত্রচর্চায় নিমগ্ন, অন্যদিকে [redacted] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মুক্তি অনুসন্ধান। একদিকে বিদ্যাচর্চায় সূক্ষ্ম অনুসন্ধান, অন্যদিকে [redacted] [illegible] [redacted] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [redacted] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [redacted] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [redacted] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

ক্ষিতিমোহন সেনের [redacted] [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible], [redacted] [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [redacted] [illegible] নয়। একদিকে [illegible], অন্যদিকে [illegible] ও [illegible] — [illegible] [illegible] [illegible] [redacted] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible],

২

[illegible]

৬

সে উৎসাহ, প্রাণের চাঞ্চল্য এখন আমার মনে স্পষ্ট ভাবে লেগে আছে। এখনও প্রাণশক্তির খুঁজ নেই। এই আনন্দ উচ্ছ্বাসের মূলে আছেন এদের উৎসুক হবার [illegible] সম্বন্ধে [redacted] খুব গেলেন।

এই প্রসঙ্গে [redacted] অনির্বাচিত বহুত্ব এখনও মনে। [redacted] ক্ষিতিমোহন আনন্দ ও সংস্কৃতের সাথে + উপনিষদের গানের ও দুঃখের মধ্যে ছিল। এখন সকলে মিলে সংস্কৃতের এবং আকাশ-আলোকের সর্বাঙ্গ সুখময় হয়েছিল। এই পরিবেশে সেই সময়ের তুহিন ও আনন্দানুভূতি মোহন ও মুক্তা ছিল [redacted] সত্য জানা ছিল।

এখন ক্ষিতিমোহনের সেই মিষ্টি কথার মধ্যে জীবনের উজ্জ্বল দিন এবং আমি খুশী মনে ভাবি। [redacted] ক্ষিতিমোহনের জীবনবৃত্তান্ত এখন ওঁর আমার [redacted] দিলাম। আমাদের এ বইটিতে সেই বৃত্তান্ত [redacted] পাবার মত করে সংক্ষিপ্ত তুলনা পাওয়া যাবে। ক্ষিতিমোহন সেন থেকে [redacted] এই আমার [redacted] লেখার মধ্যে আছে। [redacted] অন্তর্নিহিত ওঁর জীবনে [illegible] থেকে প্রকাশিত হয়ে আমার কৃতজ্ঞতা [redacted] জানাই তো।

অমর্ত্য সেন।

১৮ই আগস্ট, ২০১৮

আমাদের দিদি — প্রণতিদি

কবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটে পড়তে এসে আমার প্রণতিদির সঙ্গে প্রথম পরিচয় সেই ১৯৮২ সালে। গম্ভীর, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষটিকে দেখতাম একটু দূরত্ব থেকে, সম্ভ্রমের অনুভূতিতে। পরে জেনেছিলাম তাঁর পরিবারে রবীন্দ্রপ্রভাব এবং রামকৃষ্ণ পরিবারের প্রভাব — এই দুটি ধারার সার্থক সমন্বয় হয়েছিল। অল্পবয়সে পিতৃহারা হয়ে মা ও বড়দির তত্ত্বাবধানে তাঁর বড় হয়ে ওঠা। পড়াশোনার মাঝপথে কলেজ জীবনে তাঁর দৃষ্টিসমস্যা দেখা দেয়। অত অল্প বয়সে দুটি চোখই অপারেশন করাতে হয়। চোখের কিছু সমস্যা থেকেই যায়, কিন্তু তা নিয়েই তাঁর আজীবন পড়াশোনার জগতে পদচারণা।

রবীন্দ্রসাহিত্য পড়তে এসে তাঁর কাছে পড়েছি ছিন্নপত্র, জীবনস্মৃতি, আত্মপরিচয়, জাপানযাত্রী ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথকে তখন আর শুধু বিশ্বকবি বলে মনে হত না — আমাদেরই মত হাসি-কান্না মায়ায় জড়ানো মানুষটি মনে হত। এর আগে রবীন্দ্রনাথ যেমনভাবে পড়েছি তার থেকে একটা আলাদা দৃষ্টিভঙ্গী। রবীন্দ্রনাথ আমাদের, এই বিশ্বাসটা কেমন করে যেন আমারও মনে দিনে দিনে গড়ে উঠল। প্রণতি দি যখন ক্লাসে বলা শুরু করতেন — শান্ত গলায় ধীরে ধীরে, মনে হত মনের কোন গভীর স্তর থেকে কথাগুলো উঠে আসছে। বিষয়বস্তু সম্পর্কে তাঁর স্বচ্ছ ধারণা আর স্পষ্ট ভাষার ব্যাখ্যায় তা আমাদের স্পর্শ করত।

এর পর নানা অনুষ্ঠানে ইনস্টিটিউটের নানা কাজে যুক্ত হয়ে দিদিকে আরও কাছ থেকে দেখার সুযোগ হল। তাঁকে বুঝেছি কি বুঝিনি জানিনা, সে কথা ভাবার সাহসও নেই, কিন্তু একটা সময় নানা কাজের মাঝে অনুভব করলাম তাঁর কাছে পৌঁছেছি তাঁরই স্নেহ-ভালবাসার টানে। প্রচারবিমুখ, অন্তর্মুখী মানুষটি নিঃশব্দে কত বড় দায়িত্ব পালন করে চলেছিলেন তা ভাবলে অবাক হতে হয়। অর্থসর্বস্ব যুগে নামী কলেজের অধ্যাপনা ছেড়ে বিনা পারিশ্রমিকে রবীন্দ্রসাহিত্যের শিক্ষিকা হয়েছিলেন। তাঁর কাছেই শিখেছি সমস্যাকে এড়িয়ে গেলে চলবে না, তা পেরিয়ে যেতে হবে। ছাত্রছাত্রীরাই তাঁর পরম আত্মীয় — এ কথাটা আমরা খুব অনুভব করি বলেই যখন যার যা প্রয়োজন নিঃসংকোচে তাঁকে জানাই। আমরা জানি যে আমাদের সমস্যা সমাধানের একটা সূত্র তিনি ঠিকই ধরিয়ে দেবেন।

কত দিনের কত ঘটনাই মনে পড়ে। আপাত-গম্ভীর মানুষটির অন্তরে রয়েছে শিশুর সারল্য। আবার প্রয়োজনে সত্যের জন্য কতটা কঠোর হতে পারেন তাও আমরা দেখেছি। ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক সোমেন্দ্রনাথ বসুর অকাল প্রয়াণে নিদারুণ শূন্যতা নেমে এসেছিল। রবীন্দ্রচর্চার মহাযজ্ঞে সোমেন্দ্রনাথের পাশে অন্যতম প্রধান সহযোগী ছিলেন

আমাদের দিদি। সেই সময় কী হবে, কেমন করে হবে, ইনস্টিটিউট চলবে তো — এ রকম নানা প্রশ্ন নানা প্রান্ত থেকে শোনা যাচ্ছিল। সেদিনের সেই দুখের রজনী কী অপূর্ব নিষ্ঠায় অতিক্রম করা সম্ভব হল এবং পরবর্তী পাঁচটি বছর তাঁরই দক্ষ পরিচালনায় ইনস্টিটিউট চলতে থাকল মসৃণভাবে। যে সমস্ত রবীন্দ্র-অনুরাগীরা বিচলিত হয়েছিলেন — কী হয়, কী হবে — তাঁরাও আশ্বস্ত হলেন। ঐ সময় এত আলোচনাচক্র, সেমিনার, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে, রবীন্দ্র-পরিকরদের নিয়ে নানা গবেষণামূলক কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলল। অর্থাৎ সোমেনদা যা শুরু করেছিলেন, যা করতে চেয়েছিলেন সেই রবীন্দ্র-কর্মযজ্ঞের রবীন্দ্রচর্চার জোয়ার এল। দেশ-বিদেশ থেকে নানাজন প্রায়ই আসতে শুরু করলেন। আমাদের মনে হত সোমেনদা দূর থেকে বসে দেখছেন তাঁরই হাতে তৈরী ছাত্রছাত্রীরা কেমনভাবে কাজ করছে প্রণতিদির পরিচালনায়। হয়তো নয়, সত্যিই সেই কর্মযজ্ঞের দড়িটি তাঁরই অদৃশ্য মুঠোয় ছিল। ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয় কোনওদিন যদি টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের তথ্যনিষ্ঠ ইতিহাস রচিত হয় সেদিনই স্পষ্ট হবে এই পর্বের কাহিনী।

এরপর অনেকগুলো বছর কেটে গেল। পরিবর্তমান জগতে অনেক পরিবর্তন ঘটল। রবীন্দ্রমনস্ক মানুষটি আপন গৃহকোণে নিজেকে ডুবিয়ে রাখলেন রবীন্দ্রচর্চায়। যে কোনো কাজই, তা ছোট হোক বা বড় মাপের হোক, সুন্দর নিটোল যথাযথ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর মনে অস্বস্তি থেকেই যেত। *ক্ষিতিমোহন সেন* রচনার কাজের সময়েও দেখেছি — প্রায় ঐ সময় থেকে পাশাপাশি বসুমতী পত্রিকার প্রবন্ধ সূচীর কাজেও হাত দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত ক্ষিতিমোহন সেন শেষ না হয়েছে ততক্ষণ সম্পূর্ণভাবে বসুমতীর কাজে মন দিতে পারছেন না। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে তাঁর কাজ ছিল ক্ষিতিমোহনের জীবনী রচনা, কিন্তু এই কাজ করতে গিয়ে তৎকালীন শান্তিনিকেতনের পরিবেশ, সেই সময়ের ইতিহাসকে তুলে ধরে সেই পটভূমিতে ক্ষিতিমোহনকে স্থাপন করলেন। সম্পূর্ণ হল, নিখুঁত হল তাঁর কাজটি। তাঁর এই নিষ্ঠা ও একাগ্রতা শুধু উপলব্ধিরই বিষয়।

১৪০৯ বঙ্গাব্দে রাজ্য সরকার প্রদত্ত রবীন্দ্র পুরস্কারের নাম ঘোষণায় প্রণতিদির নামটি শুনে আমাদের অর্থাৎ তাঁর ছাত্রছাত্রীদের যে পরিমাণ আনন্দ হয়েছিল মনে হয় পুরস্কার প্রাপকেরও অতটা নয়। জনকোলাহল থেকে নিজেকে সরিয়ে স্বেচ্ছাবন্দী হয়ে থাকা মানুষটিকে যখন আমরা বাংলা আকাদেমিতে সংবর্ধনা দিতে চাইলাম তাতে রাজি হয়েছিলেন শুধু আমাদের মুখ চেয়ে — আমরা আনন্দ পাব জেনে।

প্রতিটি দিনের সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আজও একই নিয়মে চলছে তাঁর পড়া ও লেখার কাজ — নীরবে নিভৃতে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে চর্চা, আর প্রিয় ছাত্রছাত্রীদের কাছে আলোচনা, তাদের জিজ্ঞাসু মনের উত্তর দিয়ে চলেছেন।

আমাদের দীনতাকে লঘু করে দিক এই গ্রন্থ

পার্থ বসু

ক্ষিতিমোহন সেনের জ্ঞান আর জিজ্ঞাসার পরিধি ছিল সীমাহীন। এক দিকে বেদ-উপনিষদের ব্যাখ্যান, অন্য দিকে বাউল-ভজনের সন্ধান, তার মাঝখানে মধ্যযুগের সন্তদের বাণী, সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি। এমনতর বিচিত্র বিদ্যাচর্চার মধ্যেও ক্ষিতিমোহনের জীবন আর বাণী কখনওই শুষ্ক সুকঠিন উদাসীন থাকেনি। এমনকী, গম্ভীর উপাসনা বা সুধী সমাবেশেও ক্ষিতিমোহনের ভাষণ ছিল আশ্চর্য রসাত্মক। প্রণতি মুখোপাধ্যায় অতীব দক্ষতার সঙ্গে ক্ষিতিমোহনের দীর্ঘ ফলবান আশি বছরের জীবনের প্রতিটি স্তরকে এক সশ্রদ্ধ ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে এই গ্রন্থে আবিষ্কার করতে পেরেছেন। আধুনিক কালের সন্তপ্রতিম সেই ব্যক্তিত্বের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আদর্শ এক আশ্রমকে তিনি মিলিয়ে দিতে চেয়েছেন। তবে মনে রাখতে হবে, সেই আশ্রম আমাদের প্রাচীন ভারতের শান্তরসাস্পদ তপোবন মাত্র ছিল না। সেখানেও সংঘাত আর সঙ্কট ছিল। ক্ষিতিমোহন যে মনীষাকে আয়ত্ত করেছিলেন, মনে হয়, তারই সৌজন্যে সেই সব বাধাবিপত্তি পেরিয়ে যেতে পেরেছিলেম। আসলে এই গ্রন্থপাঠের পর একটি ব্যাপার পরিষ্কার হয়, ক্ষিতিমোহন বিদ্যাকে অধীত পাঠ্য বিষয়ে বদ্ধ রাখেননি। সে জন্যই ক্ষিতিমোহনের মনস্বিতাকে পাণ্ডিত্য বললে খর্ব করা হয়, বিশেষ করে যেখানে 'পণ্ডিতি' শব্দে রবীন্দ্রনাথের ভীতি ছিল। সেই মননচর্চা ক্ষিতিমোহনকে এক ধরনের সতেজ ব্যক্তিত্ব দিয়েছিল।

'ব্রাহ্ম না হয়েও তিনি ব্রহ্মবাদী ছিলে, ব্রাহ্ম অসবর্ণ বিবাহে আচার্য হতেন, কিন্তু নিজেদের কন্যাদের কখনও সম্প্রদান করেননি।' সেই ব্যক্তিত্ব অন্য মাত্রা পেয়েছিল দ্রুতধী সরস সংলাপে। প্রণতিদেবী যৎকিঞ্চিৎ উল্লেখ করেছেন। এই প্রসঙ্গে সীতাদেবীর *পুণ্যস্মৃতি* উল্লেখযোগ্য। আরও অনেক স্থানে, অনেকের স্মৃতিতে ক্ষিতিমোহনের শুদ্ধ পূর্ববঙ্গীয় বাংলায় প্রবল রসস্নিগ্ধ আলাপ বিকীর্ণ হয়ে আছে। প্রণতিদেবীর উদ্দেশ্য ছিল, মনে হয়, এক মনস্বীকে স্বমহিমায় উপস্থিত করা। সেখানে অবশ্য তিনি সফল।

আর এক বিস্ময় এখানে পাওয়া গেল। শান্তিনিকেতনের সীমাবদ্ধ অলসমন্থর জীবনেও ক্ষিতিমোহন প্রতিটি মুহূর্তের কী ভাবে মূল্য দিয়েছেন। 'শান্তিনিকেতনে আসিয়াও আমি আমার প্রত্যেকটি ছুটি ও সর্বপ্রকারের অবসরকাল এই সব সন্ধানেই কাটাইয়াছি।' এটাই হল সার কথা। শুধু পুঁথিপাঠ নয়, দূরদূরান্তর প্রায় পদব্রজে ঘুরে বিচিত্র সংস্কৃতির সন্ধান করেছেন। তাঁর সেই সরল জীবন, পরিচ্ছদ, ভ্রমণ নিয়ে একদা আশ্রমিকদের মধ্যেও সন্দেহ প্রচলিত ছিল। এখনও অনেক রকম জনপ্রবাদ শোনা যায়। সেগুলি শুধুই কল্পিত; অন্তত এই গ্রন্থপাঠে সে সব হাস্যকর প্রবাদের উত্তর পাওয়া যায়। প্রণতিদেবীর রচনা অন্তত এই সংবাদ দিয়েছে বহতা নদীর মতো রমতা সাধু ক্ষিতিমোহনের দৃষ্টি ছিল বিস্তৃত এবং এমত পরিশ্রমী সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারেন।

গ্রন্থে বড় প্রীতিপ্রদ বিষয় হল, ক্ষিতিমোহন-কিরণবালার দাম্পত্য জীবন। ক্ষিতিমোহন ছিলেন দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে পুরুষোত্তম, তাঁর কণ্ঠস্বরেও আবহ কেঁপে উঠত, মেজাজে-বচনে কখনও-বা, আমার স্বল্প অভিজ্ঞতায় যেটুকু জেনেছি, কিছু দূরবর্তী, ভীতিকর। অন্য দিকে কিরণবালা দেবী ছিলেন ছোটোখাটো, সুকল্যাণী স্নেহময়ী নম্রবাক সংসারিণী। তার উপর, তিনি ছিলেন এক আশ্চর্য সেবাব্রতী। বিশেষ করে, তখনকার আশ্রমে সন্তানজন্মের সময় তাঁর শ্রম এবং অভিজ্ঞতা বহু প্রাণ বাঁচিয়েছে, লালন করেছে। প্রণতি মুখোপাধ্যায়ের লেখায় সেই পরিচয় পেয়ে এখনকার চিকিৎসকরাও চমৎকৃত হতে পারেন। এই দুই বিপরীত স্বভাবের চমৎকার সমন্বয় কিছু ঘটনায়, ক্ষিতিমোহনের পত্রালাপে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথ একাধিক বার ইউরোপ-আমেরিকায় ক্ষিতিমোহনকে পাঠানোর আগ্রহ দেখিয়েছেন, ক্ষিতিমোহনও প্রস্তুত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী হিসেবে চীন-জাপান ছাড়া কেন যে বিদেশে তিনি যেতে পারেননি, সেই বিষয়টি রহস্য থেকে গেল। বিধুশেখর শাস্ত্রীর আশ্রম-ত্যাগের কারণ আরও সন্ধানসাপেক্ষ। বিশেষ করে, এই দুজনেই তো ছিলেন অভিন্নহৃদয় বান্ধব, সেখানে অভিমানী এক সহকর্মী সমধর্মীর প্রস্থানে তাঁর বন্ধুর প্রতিক্রিয়া জানতে পারলে ভালো লাগত। দিনেন্দ্রনাথের শুধু নামোল্লেখ রয়েছে, সেই বেদনাদায়ক প্রস্থান উহ্য রইল। ক্ষিতিমোহনের পরমবন্ধু কালীমোহন ঘোষের সাময়িক কর্মত্যাগের বিবরণ প্রাসঙ্গিক হত।

প্রণতিদেবীর প্রভূত পরিশ্রমের ফল রয়েছে 'কয়েকটি গ্রন্থপ্রসঙ্গ' অধ্যায়ে এবং গ্রন্থপঞ্জি ও রচনাপঞ্জি প্রণয়নে। সেখানেই যথার্থ ভাবে এক মুক্তমনা তাপসের পরিচয় মেলে। প্রণতি মুখোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে ক্ষিতিমোহন কিছু পরিমাণে আমাদের শ্রদ্ধায় বৃত হলেন। কারণ, একটি দেশিকোত্তম, আর জগত্তারিণী পদক ছাড়া ক্ষিতিমোহন সেনের সমাদর মেলেনি। এই গ্রন্থ আমাদের সেই দীনতাকে লঘু করে দিক।

মোহনদাস প্যাটেল-এর কয়েকটি চিঠি প্রসঙ্গে

মোহনদাস মথুরভাই প্যাটেল গুজরাটের কাশীপুরা গ্রামের কৃষক পরিবারের সন্তান। জন্ম ৯ ফেব্রুয়ারী ১৯১৭। করুণাশংকর ভট্ট নামে এক আদর্শবাদী গান্ধীভক্ত মানুষ ছিলেন, পেশায় শিক্ষক, থাকতেন আমেদাবাদে। জীবিকার পরাধীনতা তাঁকে পীড়া দিত। প্রতিদিন খুব ভোরে সাবরমতী আশ্রমে গিয়ে গান্ধীজীর সঙ্গ করতেন, চরকা কাটতেন। গান্ধীজীর প্রেরণায় তিনি কোসিন্দ্রা-কাশীপুরা গ্রামে আশ্রম স্থাপন করেন। কৃষকদের উন্নততর চাষবাসের পথ দেখানো, তাদের সঙ্ঘবদ্ধ করা, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। সেইসঙ্গে তাঁদের ছেলেদের লেখাপড়া শেখানোও লক্ষ্য ছিল। মাস্টারজি করুণাশংকরের আশ্রমে মোহনদাসের পাঠ শুরু। মাস্টারজির বন্ধু ক্ষিতিমোহন সেন এই আশ্রমে আসতেন। ১৯২৬ সালে প্রথমবার যখন আসেন, আশ্রমের যে কীর্তনের দল তাঁর প্রত্যুৎগমন করেছিল, বালক মোহনদাস সেই দলে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে, শান্তিনিকেতনের সঙ্গে সম্পর্কের সেই সূচনা। মোহনদাস ১৯৩০ সালে শান্তিনিকেতনে এসে চার বছর বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। করুণাশংকরজি নিজে সঙ্গে করে যে কয়েকটি গুজরাটি ছেলেমেয়েকে নিয়ে এসেছিলেন, ইনি তার অন্যতম। পরের চার বছর তিনি কাশী বিদ্যাপীঠে পাঠগ্রহণ করেন। পরে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান পড়ে গ্রন্থাগারিক হন। গ্রন্থাগার উন্নয়নে তাঁর গভীর আনন্দ ছিল। তাঁর আর একটি নেশা বাংলা সাহিত্য মাতৃভাষায় অনুবাদ। ক্ষিতিমোহন সেনের *কবীর, হিন্দু মুসলমানের যুক্ত সাধনা, বলাকা-কাব্য পরিক্রমা, বাংলার সাধনা* অনুবাদ করেছেন। অনুবাদ করেছেন সোমেন্দ্রনাথ বসুর *তবে তাই হোক*, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের *শ্রীশ্রীসারদামণি*। *ক্ষিতিমোহন সেন* ও *অর্ধশতাব্দীর শান্তিনিকেতন* অনুবাদের কাজ শেষ হয়ে গেছে বেশ অনেকদিন হয়ে গেল। সম্ভবত বইটি এখনও প্রকাশিত হয়নি। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ সাধনাত্রয়ী সম্পাদনা করেন মোহনদাস। এখন কন্যাদের কাছে আমেরিকায় থাকেন।

প্রণতি মুখোপাধ্যায়ের *ক্ষিতিমোহন সেন ও অর্ধশতাব্দীর শান্তিনিকেতন গ্রন্থে* মোহনদাস প্যাটেলের উল্লেখ আছে বেশ কয়েকবার। ক্ষিতিমোহন-এর প্রত্যক্ষ ছাত্র হওয়ার সুবাদে খুব কাছ থেকে তাঁকে দেখেছেন; এমনকি আচার্যের অন্য কোনো কোনো ছাত্রের মতই মোহনদাসও শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ছুটিতে পূর্ববঙ্গের সোনারঙ্গে তাঁর গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। সে স্মৃতি এখনও তাঁর মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। প্রণতি মুখোপাধ্যায় ক্ষিতিমোহন-জীবনীতে লিখছেন :

> গুজরাতের ছাত্র মোহনদাস পটেলের এখনও ছবির মতো মনে পড়ে ক্ষিতিমোহনের সেই টিনের চাল দেওয়া মাটির বাড়ি, মনে পড়ে স্টীমারে যেতে দেখেছিলেন টুকরো বাঁশের মাথায় পাতার ঠোঙায় রসগোল্লা নিয়ে মিষ্টান্ন-বিক্রেতারা সাঁতার দিয়ে কাছে আসত।
>
> (পৃষ্ঠা ১৫২)

১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে ক্ষিতিমোহন গুজরাটে করুণাশংকর ভট্টের সঙ্গে দেখা করতে যান। বস্তুত তাঁর এই যাত্রার মূল লক্ষ্যই ছিল অন্তরঙ্গ এই বন্ধুর সঙ্গে সদ্যপ্রকাশিত *প্রান্তিক*-এর কবিতাগুলি নিয়ে আলোচনা করা। আগের বছর (১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭) শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ হতচৈতন্য হয়ে পড়েন। সুস্থ অবস্থায় ফিরে আসতে প্রায় ষাট ঘন্টা সময় লেগেছিল। কয়েকমাস পরের নববর্ষ-ভাষণে (১৩৪৫) তিনি বলেছিলেন, 'কিছুকাল পূর্বে আমি মৃত্যুগুহা থেকে জীবনলোকে ফিরে এসেছি।' 'মৃত্যুগুহা' থেকে 'জীবনলোকে' ফিরে আসার এই অভিজ্ঞতা থেকে পরের তিন মাসে যে-সব কবিতা লেখেন, তার সঙ্গে অনতিপূর্বে লিখিত কয়েকটি কবিতা নিয়ে *প্রান্তিক* প্রকাশিত হয় ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে। [দ্রষ্টব্য : পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত *রবীন্দ্র-রচনাবলী। ষোড়শ খণ্ড। গ্রন্থপরিচয়।* পৃষ্ঠা ৩৯৬।] এই কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে ক্ষিতিমোহনের অভিমত এবং তাঁর ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের গুজরাট ভ্রমণ বিষয়ে প্রণতি মুখোপাধ্যায় জীবনীগ্রন্থে লিখেছেন :

> এ কাব্য দুই সমমনস্ক বন্ধুর অন্তরঙ্গ একান্ত আলোচনার বিষয় হয়ে থাকেনি। এবার গুজরাটে বিভিন্ন স্থানে যে-সব আলোচনা করলেন ক্ষিতিমোহন, তার একটি মুখ্য ভাগ জুড়ে রইল *প্রান্তিক*-এর কবিতাগুলির পাঠ ও ব্যাখ্যা। *প্রান্তিক* ক্ষিতিমোহনের অত্যন্ত প্রিয় কাব্যগ্রন্থ। তিনি মনে করতেন রবীন্দ্রনাথ যে গত বছর প্রায় ষাট ঘন্টা অচৈতন্য ছিলেন, সেই সুষুপ্তি তাঁর রুগ্‌ণাবস্থা মাত্র ছিল না, সে ছিল তাঁর একটি অনুভূতিদর্শন বা উপলব্ধির অবস্থা, *প্রান্তিক*-এর কবিতাগুলিতে তারই যৎকিঞ্চিৎ প্রকাশ ঘটেছে। এই বই তাঁর আন্তর অনুভবের প্রকাশ বলেই বই বেরোনোর পরে সে সময় পর্যন্ত বাংলার কোনো সমালোচক এর সমালোচনা করতে সাহস করেননি। এ মতামতও তাঁরই। ক্ষিতিমোহন এই সময়কার অধিবেশনগুলিতে *প্রান্তিক*-এর এক থেকে চার ও ছয় থেকে চোদ্দো সংখ্যক কবিতার ব্যাখ্যা করেন। ক্ষিতিমোহনের *প্রান্তিক*-এর ভাষণগুলির কিকুভাই-কৃত অনুলিখন ও গুজরাতি অনুবাদ প্রথম মুদ্রিত হয় *সাধনাত্রয়ীতে*। তাই গ্রন্থসম্পাদক মোহনদাস পটেল সানন্দে মন্তব্য করেছেন : 'এই প্রকাশন যদি না হত তা হলে এই দুর্লভ বিবরণ আমরা পেতাম না।' (পৃষ্ঠা : ৩০০)

সাধনাত্রয়ী গ্রন্থটির উল্লেখ আছে *ক্ষিতিমোহন সেন ও অর্ধশতাব্দীর শান্তিনিকেতন* গ্রন্থের 'বৃদ্ধবয়সে' পরিচ্ছেদে। প্রসঙ্গক্রমে লেখিকা উল্লেখ করেছেন মোহনদাসের নামও :

> *সাধনাত্রয়ীর* পিছনের মলাটে ক্ষিতিমোহনের বৃদ্ধবয়সের একটা ছবি আছে, তাঁর পরিচিত মুখ সে ছবিতে শ্মশ্রুতে ঢাকা পড়েছে। শান্তিনিকেতনের পুরোনো ছাত্র মোহনদাস পটেল ১৯৫৬ সালে শান্তিনিকেতনে এসে এমনটিই দেখেছিলেন ক্ষিতিমোহনকে। যেদিন তিনি দেখা করতে গেলেন ক্ষিতিমোহন দুই পৌত্রের হাতেখড়ি দিচ্ছিলেন, সেই ছবি মোহনদাসভাইয়ের অন্তরে এখনও আঁকা আছে। (পৃষ্ঠা : ৪০১)

ক্ষিতিমোহন সেনের জীবনী রচনার জন্য তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ১৯৯৬-এ আমেদাবাদে মোহনদাস প্যাটেলের কাছে গিয়েছিলেন জীবনীকার। সঙ্গে ছিলেন তাঁর 'ফুলদি' (আরতি ঘটক)। গ্রন্থের 'উল্লেখপঞ্জি ও প্রাসঙ্গিক তথ্য'-তে (পৃ: ৫০৭) সে কথা জানিয়েছেন তিনি। বইটির ভূমিকাতেও মোহনদাস সম্পর্কে তাঁর সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন লেখিকা :

.... আমেদাবাদনিবাসী, গুজরাতের শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘের সম্পাদক শ্রীযুক্ত মোহনদাস প্যাটেলের কথাও ভুলতে পারব না কোনোদিন। তাঁর বাল্যকালে তিনি ক্ষিতিমোহন সেনকে ঘরের লোকের মতো জানতেন। তিনিও আমাকে উৎসাহিত করেছিলেন। তাঁরই উদ্যোগে আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে গুজরাতের শান্তিনিকেতন-অনুরাগী ক্ষিতিমোহন-গুণমুগ্ধ মানুষরা *সাধনাত্রয়ী* নামে একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করেন, মোহনদাস ভাই তার সম্পাদক ছিলেন। পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনের জীবিতকালে তাঁর যে তিনটি গ্রন্থ গুজরাতির ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলি এই স্মারকগ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত হয়। এ ছাড়া এতে তাঁর কিছু চিঠিপত্র ও তাঁর সম্বন্ধীয় কয়েকটি রচনা প্রভৃতির সমাবেশ ঘটেছিল। মোহনদাস ভাই এই চিঠিগুলি ও তাঁর নিজের রচনাটি আমাকে অনুবাদ করে দেন, ক্ষিতিমোহন সেনের ছাত্রকে লেখা কয়েকটি বাংলা চিঠির জেরক্স করে পাঠান। আর *তন্ত্রনীসাধনা* সম্পূর্ণ অনুবাদ করে দিয়েছিলেন। *চীনজাপাননী* যাত্রা যখন অনুবাদ করলেন, আমি তাঁর কাছেই ছিলাম। প্রতিদিন দু-বেলাই আমরা এই বইটা নিয়ে বসতাম। তিনি মুখেমুখে বাংলা অনুবাদ করে যেতেন, আমি লিখতাম।

এই সাক্ষাৎকার পরবর্তীকালে স্নিগ্ধ স্নেহপ্রীতি-নিষিক্ত সম্পর্কের সূত্রপাত ঘটিয়েছে। অশীতিপর মোহনদাসের সানন্দ স্বীকৃতির পুরস্কার লাভ করেছে এই গ্রন্থ। তার স্বাক্ষর আছে প্রণতি মুখোপাধ্যায়কে লেখা তাঁর কয়েকটি চিঠিতে। চিঠিগুলি যে কেবলমাত্র মোহনদাস প্যাটেলের ব্যক্তিগত অনুভূতি বা আনন্দের প্রকাশ এমন নয়, এর মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে রয়েছে ক্ষিতিমোহন-জীবনীর সমালোচনাও। পত্রে গ্রন্থটি সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যগুলিতে হয়তো ব্যক্তিসত্তার স্পর্শ আছে, তবে ব্যক্তিটি যে ক্ষিতিমোহন-এর প্রত্যক্ষ এবং ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসা এক নিবিষ্ট ছাত্র, এ কথা মনে রাখলে এই মন্তব্যগুলিকে আমাদের মূল্যবান মনে হতে পারে। যে চারটি পত্রের অনুলিপি আমাদের হাতে এসেছে তার মধ্যে প্রথম তিনটি আমেরিকার নিউইয়র্ক থেকে যথাক্রমে ২০০০ সালের ১৩ এপ্রিল, ২০মে এবং ১ আগষ্ট তারিখে লেখা। পরবর্তী চিঠিটির তারিখ ১ নভেম্বর ২০০২, লিখেছেন আমেদাবাদ থেকে। ২০০০ সালের প্রথম চিঠিটি জীবনীগ্রন্থ হাতে পাওয়া, আদ্যন্ত পাঠের অভিজ্ঞতা এবং সঞ্জাত আনন্দের অভিঘাতে লেখা একটি গ্রন্থসমালোচনা বলা যেতে পারে। কিন্তু চিঠিটি লিখছেন এক 'দাদা' তাঁর 'বোন'কে 'তুমি' সম্বোধনে। শেষে বইটি অনুবাদ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে লেখিকার কাছ থেকে অনুমতিও চেয়েছেন। ২০ মে তারিখের স্বল্পায়ত চিঠিটির বিষয়ও ক্ষিতিমোহন-জীবনী এবং এই পত্রেও তিনি গুজরাতি ভাষায় বইটি অনুবাদ করার অনুমতি চাইছেন। কিন্তু ভাষায় আবেগ অনেক সংহত, আর চিঠি লেখা হয়েছে লেখিকাকে 'আপনি' সম্বোধন করে। এ বিষয়ে কৌতূহল প্রকাশ করে পত্রপ্রাপিকার কাছ থেকে জানা গিয়েছিল যে 'অনুমতি প্রার্থনা'কে প্রথাগত রূপ দেওয়ার জন্য মোহনদাসভাই তাঁকে 'আপনি' সম্বোধনে চিঠিটি লিখেছেন। আলোচিত পত্রদুটি সন্ধিৎসু পাঠকের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হল।

অন্য দুটি চিঠিতেও ক্ষিতিমোহন ও ক্ষিতিমোহন-জীবনী প্রসঙ্গ এসেছে — বিশেষ করে অনুবাদ প্রসঙ্গ। ১ আগষ্ট ২০০০ তারিখের চিঠিতে মোহনদাস লিখছেন :

......প্রণতি, দিদি আমার; তোমাকে কত যে ধন্যবাদ দেব বুঝতে পারছি না। বইখানি পেয়েই যে কত খুশি, কত যে আনন্দ পেয়েছি — তা ভাবলে অভিভূত হয়ে যাই। অনুবাদের সময় আমি নতুন করে কৈশোরে চলে যাই। অতীত আবার বর্তমান হয়ে প্রত্যক্ষ অনুভূতি করায়। কত যে কথা মনে পড়ে! ধন্য তুমি! ধন্য তোমার জীবনী লেখার তপস্যা—সাধনা।

আমেদাবাদ থেকে ১ নভেম্বর ২০০২ তারিখে লেখা চিঠি থেকে জানা যাচ্ছে অনুবাদ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং অনুবাদগ্রন্থটি প্রকাশের উদ্যোগ চলছে।

......আমাদের রচিত বাবুজীর জীবনী গুজরাতি সাহিত্য একাদেমী প্রকাশ করবে। ভোলাভাই আমার কাছে এসে বইয়ের পাণ্ডুলিপি নিয়ে গেছেন। কখন প্রকাশ করবে এখনও কিছু বলেননি। বোধহয় নিরঞ্জনভাই-এর সঙ্গে কথা বলে ঠিক করবেন। নিরঞ্জন আমেরিকায়। এ মাসের মাঝামাঝি ফিরবেন। ওঁর সঙ্গে দেখা করব। এখানে এঁরা 'রবীন্দ্রভবন'-এর রচনার জন্য উদ্যুক্ত [উদ্যোগী] বলে মনে হয়। নিরঞ্জন এলে সব কিছু জানতে পারব। নিরঞ্জনের উৎসাহ বেশী। তিনি এখানকার গণ্য-মান্য কবি ও সাহিত্যিক। রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর টান প্রবল।

এই চিঠি থেকেই জানা যাচ্ছে যে ক্ষিতিমোহন সেনের দুটি গ্রন্থের মোহনদাস-কৃত অনুবাদ প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। *বাঙ্গালার সাধনা*-র অনুবাদটি তিনি ক্ষিতিমোহন-কন্যা অমিতা সেনকে উৎসর্গ করেছেন :

....'বাঙ্গালার সাধনা' এবং 'বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা' এখনও বের হয়নি। জানি না কবে বেরোবে। 'বাঙ্গালার সাধনা' অমিতাদিকে উৎসর্গ করেছি। তাঁর বয়স 92-93, তাঁর হাতে দিতে পারলে কাজটি সার্থক হবে।

শান্তিনিকেতন, ক্ষিতিমোহন সেন এবং অমিতা সেন সম্পর্কে তাঁর অসীম শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে ১ আগস্ট ২০০০ তারিখে নিউইয়র্ক থেকে লেখা চিঠিতে :

......অমিতাদি কোথায় আছেন? ইংল্যাণ্ডে, না এখানে বোস্টনে? যদি এখানে আসেন জানাবে। পারবে? কোন মাধ্যম আছে যাঁর কাছ থেকে তুমি খবর নিয়ে আমাকে জানাতে পার? যদি এখানে থাকেন আর যদি দেখা-সাক্ষাতের অনুমতি পাই, বড় জামাই এবং সাবিত্রীকে নিয়ে শান্তিনিকেতন-জ্ঞানে তাঁকে প্রণাম জানিয়ে আসব। অমিতাদির এবং তাঁর বাড়ির সবাই-এর [কাছে] সেই ছোটবেলার বয়সে যে স্নেহ-ভালবাসা পেয়েছি তা হয়তো এখন কেউই জানে না। ছোট একটি সীমান্ত-গ্রাম থেকে এত দূর এসে তাঁদের পেয়ে শান্তিনিকেতন-বাস সুখে আনন্দে ভরাভরা ছিল। সে সব স্মৃতি এখনও ভিতরকে অভিভূত করে দেয়। তাই বোধ হয় অমিতাদিকে প্রণাম করে আসবার এত তীব্র অভিলাষ।

মোহনদাস প্যাটেলের এই পত্রটিতে আর একটি মানুষ সম্পর্কে বিশেষ শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে; তিনি টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা, প্রাণপুরুষ, রবীন্দ্রচর্চায় নিবেদিতপ্রাণ অকালপ্রয়াত অধ্যাপক সোমেন্দ্রনাথ বসু। তিনি লিখছেন :

.... মাঝে মাঝে যখন 'তবে তাই হোক'-এর কথা বলি বা ভাবি তখন সোমেনদার প্রতি

এক বিশেষ ভাব ভিতরে জাগে। মনে হয় তিনি ছিলেন মহাপ্রাণ। তাঁর বক্তৃতা শুনে — যখন আমেদাবাদে এসেছিলেন — মনে হয়েছিল তাঁর সমস্ত Being-এ রবীন্দ্রনাথ ব্যাপ্ত। ধন্য করে গেলেন নিজের জীবন। পথ দেখিয়ে দিলেন উত্তরাধিকারীকে। মনে কি হয় জান? আমি যদি তোমার মতন তাঁর ছাত্র হতে পারতাম তা হলে তোমার সতীর্থ হয়ে যেতাম।

আলোচিত পত্রগুলির আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এগুলির ভাষা। মোহনদাস প্যাটেল তাঁর কৈশোরে মাত্র চার বছর শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন — এ তথ্য আমাদের জানা। তথাপি এই অশীতিপর মানুষটির লিখিত বাংলা ভাষা আমাদের বিস্মিত করে। দু-একটি ক্ষেত্রে নিরুপায় হস্তক্ষেপ ছাড়া প্রকাশিত পত্রগুলির ভাষা ও বানান অবিকৃত রাখা হয়েছে।

মোহনদাস প্যাটেল-এর চিঠি ১

Mohandas Patel
C/o Nandini Pandya
HUGHSON VILLE
N.Y. 1253 U.S.A.
13:4:2000

পরম কল্যাণীয়াসু
প্রণতি

তোমার 15:3:00 [তারিখের] চিঠি এই তো দিন তির-চার আগে পেলাম। কি হয়েছে জান? চিঠিতে INDIA দেখলেই পোষ্টওয়ালা চিঠিটি এখানকার ভারতীয় মন্দিরে ছেড়ে দিল। অরূপ[১] বন্ধুর সঙ্গে যখন মন্দিরে যায় তখন ওখানকার পুরোহিত অরূপকে চিঠি দিল। তাই অনেক দিন বাদে তোমাকে ওই চিঠির উত্তর দিচ্ছি। তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই — তোমার বাঁ হাতে লেখা[২] চিঠির জন্য। চিঠি পড়তে কোন অসুবিধে বোধ করিনি। কিন্তু প্রথমে ভাবলাম — প্রণতি কেন অন্যের হাতে চিঠি লিখাচ্ছে? একটু আগে পড়েই বুঝলাম বাঁ হাতের লেখা। কত আদর স্নেহ যত্ন করে তুমি চিঠি দিয়েছ! খুবই ভাল লাগল। তাই লিখে ফেললাম, 'ধন্যবাদ'। জানি কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু অনায়াসে না-ভাবা সত্ত্বেও যখন লিখে দি, তখন তার জন্য অন্যথা কিছু মনে করি না। সব মিলে এর মধ্যে তোমার প্রায় ছ-সাত[টি] চিঠি পেয়েছি। তোমার আর ফুলুর[৩] চিঠিও পেয়েছি। তার উত্তর দিয়েছি। চিঠি না লিখলেও তোমার চিঠির জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকি।

তুমি এ চিঠি পাও তার আগে হয়তো আমি তোমাকে ফোন করব। দেখি পারি কিনা। পোষ্টে পাঠান ক্ষিতিমোহনের জীবনী এখনও পাইনি। জানি না পাব কিনা। তবুও অরূপকে

মন্দিরে গিয়ে খবর নিতে বলেছি। হয়তো পাঠাতে পারেননি। খুবই ভাল হলো তুমি সঙ্গীতাকে[৪] অভীককে দিয়ে বইটি পাঠিয়ে দিলে। অভীককে স্নেহ আর ভালবাসা জানাবে। না-দেখলে না-জানলেও যেন তাকে চিনি, ভালবাসি — মনে হয়। হয়তো তোমার ছাত্র বলে। বই পাওয়া মাত্রই পড়তে শুরু করি। নন্দিনীর বাড়িতে থেকে যখন কল্যাণীর ওখানে যাই তখন বইটির পড়া শেষ করেছি তা 13 :3:2000। খুবই ভাল লাগল। যেন নতুন করে বাবুজীকে চিনতে পারছি। কত সব না-জানা কথা জানলাম। তুমি মনে করছো, ক্ষিতিবাবুর মনের যে বিশাল ব্যাপ্তি বা range তার সম্পূর্ণ নাগাল পাওয়া তোমার সাধ্যাতীত। যা পেরেছ তা'তে তাঁর বাহ্য এবং অভ্যন্তরের যে ছবি প্রকাশ পেয়েছে সে অপূর্ব। তুমি লিখছ 'শঙ্কা হয় আমার সীমাবদ্ধতার দ্বারা কতটা তাঁকে আড়াল করলাম'। সেটা ঠিক নয়। যা প্রকাশ করতে পেরেছ তাতে বেশ বুঝতে পারছি, এ কাজে তোমার তপস্যা, নিষ্ঠা, অপরোনাস্তি মনে করি। হয় তো [যদি] ক্ষিতিমোহনবাবু নিজে নিজের জীবনী লিখতেন, তিনিও সব কিছু লিখতে পারতেন না। তাই হয়। এ তো কিছু নতুন নয়। বোধহয় তাই* বলা হয় 'বিন্দুতে সিন্ধু' দেখতে পারলে কোন অভাব থাকে না।

প্রণতি, মনের একটা কথা বলি? বই পড়তে যখন শুরু করেছি — 'সোমেন্দ্রনাথ বসু স্মরণে' পড়েই পেন্সিলে লিখে দিলাম 'প্রণতিকে অনেক অনেক ধন্যবাদ'। তোমার এই লেখায় যখন মাঝে মাঝে ছোট ছোট দু-একটি কথা বল তখন খুবই ভাল লাগে। যেমন 'ও কথা আগে বলেছি।' 'এ বিষয়ে পরে বলা যাবে। এখন, যা বলছিলাম সেই সূত্রটি নিয়ে চলি।' এ ধরনের কথা পড়বার সময় মনে হয় যেন তোমার সঙ্গে পাঠকও রয়েছে — এবং সব শুনছে। লেখার ধরন-শৈলী, পাঠককে ধরে রাখে। মনে করে 'তারপর কি তারপর কি?' বই রাখতে পারে না। পড়েই যাচ্ছে। শৈলী কথকের মতো অনেক সময় মনে হয়।

প্রণতি, 'জীবনী' সঙ্গে নিয়ে বসেছি। মাঝে মাঝে দেখে নিই। খুবই ভাল লাগে। তথ্যপূর্ণ। লোককবিদের লোকবাণীতে লোকতীর্থের অন্তরমন্দিরে লোকেশ্বর পরমপুরুষের প্রতিষ্ঠান। তুমি হয়তো বুঝতে পারছো না তুমি কত বড় কাজ করেছো। যাঁরা লোকধর্মের উপাসক, সাধক তাঁদের কাছে এ জীবনী কল্পতরু। শ্রীমান অমর্ত্য সেনের মুখবন্ধ-এর শেষ কথা নিজের মতন করে বলতে পারি —: 'বাবুজীর স্নেহধন্য মার্থা* হিসেবে তোমার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ অবধি নেই।'

[*বাবুজী যখন শেষবারের মতন 1940 সালে আমেদাবাদে এসেছিলেন তাঁর সেবা-শুশ্রূষার পরম-বাঞ্ছনীয় অবসর পেয়েছিলাম। করুণাশঙ্করজীর বাড়িতে এক ঘরে বাবুজী এবং করুণাশঙ্করজী শুয়ে ছিলেন। মশারি লাগিয়ে দিলাম। আমি বাবুজীকে জিজ্ঞেস করলাম — বাবুজী এবার মশারি একটু গুঁজে দি? তিনি বললেন 'মোহন, দেখছি তুমি এখনও বাংলা ভোল নি।' করুণাশঙ্করজীকে বললেন 'মাস্টারজী, মোহন হচ্ছে আমাদের মার্থা'। 'মার্থা' কে

তা জানতাম না। পরে জানলাম যীশুখ্রিস্টের নিকটতম সেবিকা।]

যাই হোক্ আবার ফিরে আসি — তুমি লিখেছ 'বাবুজী আপনার অতিপরিচিত আপনজন।' কিন্তু তা হচ্ছে অনেকটা বাইরের। ভেতরের কতো তা জানি না। তুমি তাঁকে পেয়েছ অক্ষর অক্ষর দেহে। তাই তুমি আমাদের কৃতজ্ঞতার সর্বতোভাবে দাবিদার। রবীন্দ্রনাথ এবং ক্ষিতিমোহনের গবেষণায় নিজেকে উৎসর্গ করতে পেরেছ — তাই তুমি ধন্য। তোমার এই জীবনীর বই পেয়ে আমার মত অনেকে নিজেকে ধন্য মনে করবে। 'ক্ষিতিমোহন সেন ও অর্ধশতাব্দীর শান্তিনিকেতন'-এর অনুবাদ করার অনুমতি দেবে?

প্রণতি, ভাবতে পারি নাই যে এতো বড় চিঠি লিখব। যদি জানতাম বড় কাগজ নিতে পারতাম। অনেক বাকি রয়ে গেল।

তোমার দাদা

১. মোহনদাস প্যাটেল-এর দৌহিত্র, অরূপরতন পাণ্ডিয়া, কন্যা নন্দিনীর পুত্র।
২. সেই সময় দুর্ঘটনায় হাত ভাঙায় বাঁ হাত দিয়ে লিখেছিলেন।
৩. প্রণতি মুখোপাধ্যায়ের 'ফুলদি', আরতি ঘটক, সাহিত্যিক প্রাণতোষ ঘটকের স্ত্রী।
৪. বর্ত্তমানে মোহনদাস ভাইয়ের প্রতিবেশিনী, তখন এ দেশে এসেছিলেন। খড়গপুরে বইটি তাঁর কাছে পৌছে দিয়েছিলেন অভীক দে, প্রণতি মুখোপাধ্যায়ের ছাত্র।

মোহনদাস প্যাটেল-এর চিঠি ২

শ্রী প্রণতি মুখোপাধ্যায়
25/4 অনাথনাথ দেব লেন
কলিকাতা- 700037 : ভারত

বিনয়সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন

আপনার লেখা 'ক্ষিতিমোহন ও অর্ধশতাব্দীর শান্তিনিকেতন' গ্রন্থ পড়ে অভিভূত হয়ে গেলাম। অপূর্ব লেখা। সকল মনুষ্য এবং তথ্য প্রচুর। সেই পুরাতন যুগের দেবেন্দ্র-রবীন্দ্র-এর একান্ত সাধনা-ভূমি আর তাঁর সহযোগবৃন্দের পরিবেশ অনুভব করেও ধন্য হলাম - পবিত্র হলাম। গ্রন্থখানি আদ্যন্ত পড়ে মন-প্রাণ পরিপূর্ণ। তাই আপনাকে এই চিঠি লিখছি।

এক যুগের প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে আমি আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ না জানিয়ে থাকতে পারছি না। এই ক্ষিতিমোহনবাবুর বিশ্লেষণের সাধনার মহনীয় অদ্ভুত রূপ পেয়েছে এই গ্রন্থটিতে। আমার অনুরোধে সম্ভবত আমি এই গ্রন্থের অনুবাদ গুজরাটী করি। আপনার অনুমতি প্রার্থনা করি। ভেবেছিলাম ক্ষিতিবাবুর 'দাদু' অনুবাদ করি। কিন্তু এই গ্রন্থটি দেখে মনে হল যেন এই সর্বপ্রথম ক্ষিতি-দাদু-বন্ধু-প্রভৃতি প্রকাশিত হয়ে যাবে।

অনুবাদের জন্য অনুমতির অপেক্ষায় থাকলাম। ইতি ২০ মে '৯০

ভবদীয়
মোহনদাস প্যাটেল

M. M. Patel
C/o Nandini Pandya
PO BOX 378
Hughson Ville
N.Y. 12537
U.S.A

‘শান্তিনিকেতনে আশ্রমকন্যা’ অমিতা সেনের একটি সাক্ষাৎকার ও একটি চিঠি

অসীম দাশশর্মা

গত বছরের গোড়ায় যখন (১৬ জানুয়ারী, ২০০৩) আমরা ক্ষিতিমোহন-কন্যা অমিতা সেনের একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য শান্তিনিকেতনে যাই, যথেষ্ট সংশয় ছিল মনে — কী জানি কেমন হবে সেই অভিজ্ঞতা। শুনেছি নোবেলজয়ী পুত্র অমর্ত্য সেনের বাড়ি দেখার আগ্রহে অতি-উৎসাহী দর্শনার্থীদের ভিড় ঠেকানোর জন্য সিকিউরিটির প্রবল প্রতাপ সেখানে। তা ছাড়া যাঁর কাছে যাচ্ছি তাঁরও তো বয়স নব্বই-অতিক্রান্ত। তিনি শরীরে-মনে কেমন আছেন তার উপরেও নির্ভর করছে আমাদের সাফল্য। অবশ্য কলকাতা থেকে দিন-সাতেক আগে ফোনে যোগাযোগ করে তাঁর সঙ্গে কথা বলে আমাদের উদ্দেশ্য জানিয়েছিলাম। দিন-কয়েকের মধ্যেই ‘প্রতীচী’তে আসছেন তাঁর ভারতগৌরব পুত্র অমর্ত্য সেন। ফোনে অমিতাদি বললেন, ‘বাবলু চলে যাবে পনের তারিখ। তার পর এসো।’ ঠিক হল সতের তারিখ তাঁর কাছে যাব। এ কথাও হল যে অনুলেখকের সাহায্য নিয়ে আমাদের কাঙ্ক্ষিত বিষয়ে কিছু লিখেও রাখবেন তিনি।

১৫ জানুয়ারী রবীন্দ্রসদন-প্রাঙ্গণে লিট্‌ল ম্যাগাজিন মেলার মঞ্চ থেকে প্রণতি মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ক্ষিতিমোহন সেন রচনা সংকলন-এর প্রথম খণ্ড *সাধক ও সাধনা* প্রকাশ করলেন অমর্ত্য সেন। একই অনুষ্ঠানে বাংলা আকাদেমির সচিব সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রকাশ করলেন অমর্ত্য সেনের জীবন কর্ম ও অর্থনৈতিক তত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ *অমর্ত্য সেন*, লেখক স্বপন মুখোপাধ্যায়।

পরদিন শান্তিনিকেতনে পৌঁছলাম দুপুরে, সঙ্গী গোপা — টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন ছাত্রী। বিকেলে প্রথম কাজ অমিতাদিকে ফোন করা। আমাদের ফোন পেয়ে তিনি অবাক — ‘তোমাদের আসবার কথা ছিল নাকি! আমার নাতনির আবার আসার কথা ১৮ তারিখ। ঠিক আছে। কালই এসো।’ সুতরাং লিখিত কিছু পাওয়ার আশা ত্যাগ করতে হল।

১৭ জানুয়ারি সকাল সাড়ে দশটায় ‘প্রতীচী’তে’ পৌঁছে সহজেই প্রবেশ করলাম, সিকিউরিটি-জনিত কোনো দুর্ভোগ আমাদের হয়নি। শুনলাম অরবিন্দবাবু তখনও আসেননি। অরবিন্দ নন্দী রোজ দুবেলা এসে এই নবতিপরা বৃদ্ধার দেখাশোনা করেন, তাঁর লেখাপড়ার কাজে সহায়তা করেন, অতিথি-অভ্যাগতদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের মাধ্যমও তিনিই। আর, তিনি *১৪০০ সাহিত্য* নামে একটি লিট্‌ল ম্যাগাজিনের উৎসাহী পরিচালক। পরে অবশ্য তাঁর সহায়তা আমরা পেয়েছিলাম।

অমিতাদির কাছে পৌঁছে দেখলাম, পিছনের ঘেরা বারান্দায় চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছেন তিনি। আপাদবক্ষ একটি চাদরে ঢাকা। শান্তিনিকেতনে তখন শৈত্যপ্রবাহ চলছে।

গ্রিলের ফাঁক দিয়ে শীতের রোদ্দুর এসে পড়ছে তাঁর গায়ে। তাঁর বুকের উপর গতকাল প্রকাশিত *অমর্ত্য সেন* এবং সামনের টেবিলে *সাধক ও সাধনা*। আগে তাঁকে বহুবারই দেখেছি রবীন্দ্রচর্চাভবনে, বক্তৃতামঞ্চে। পৌষমেলায় টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের বইয়ের স্টলে নিয়মিত আসতেন — ঋজু টানটান শরীরে সপ্রতিভ চলাফেরা, কথাবার্তাও তাই — যেন ঠোঁটের ডগায় কথা প্রস্তুত হয়েই আছে। আগেও দু-একবার এই বাড়িতে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছি। তাঁর সে উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের স্মৃতি আমাদের মনে এখনও সমুজ্জ্বল। সমীহ করতাম সকলেই, এমনকি সোমেনদাও (সোমেন্দ্রনাথ বসু) যেন একটু তটস্থ হয়ে থাকতেন। আরও শীর্ণ হয়েছেন, বয়সের একটা অনিবার্য প্রভাব পড়েছে নিশ্চিতভাবেই। আমরা প্রণতি মুখোপাধ্যায়ের ছাত্রছাত্রী শুনেই প্রাথমিক দূরত্ব সরিয়ে ফেলে অত্যন্ত সহজ হয়ে গেলেন। বললেন, 'কি জানতে চাও বলো।'

বললাম — আপনি শ্রীমতী অমিতা সেন, আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের সুযোগ্যা কন্যা, নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ শ্রী অমর্ত্য সেনের গর্বিতা মাতা, রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্যা আশ্রমকন্যা। লেখিকা হিসাবে আপনার খ্যাতি যথেষ্ট — আপনার শান্তিনিকেতনের স্মৃতি নিয়ে লেখা তিনটি* বই খুব প্রশংসা পেয়েছে। আপনার পিতা ঋষিপুরুষ আচার্যের জীবনীরচনার সূত্রে প্রণতিদি রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেছেন। *গুরুজন সংবর্ধনা* স্মারক গ্রন্থে প্রকাশের উদ্দেশ্যে আপনার একটি সাক্ষাৎকার আমরা নিতে চাই। আমরা আপনাকে কয়েকটি প্রশ্ন করব যার উত্তর আপনার কাছ থেকে জানতে পারলে আমাদের অনুসন্ধিৎসা তৃপ্ত হবে।

এটুকু শুনেই যেন একটু তুষ্ণীভাব অবলম্বন করলেন। তাঁর কথায় অসন্তোষ ঝরে পড়ল :

> তোমরা আমার যে পরিচয় দিলে তার মধ্যে বেশ অসম্পূর্ণতা দেখা যাচ্ছে। তার কারণ আমি আশ্রমকন্যা ঠিকই, রবীন্দ্রনাথের আশ্রমে আমি জন্ম থেকেই, কিন্তু ওই খড়ের চালের মাটির বাড়ি থেকে যিনি আমাকে বেছে তাঁর জীবনসঙ্গিনী করে নিয়ে গেলেন, তাঁরই সাহচর্যে আমি আজকে যা হয়েছি — অমিতা সেন। আমার বাবা-মা আমার জন্মদাতা, তাঁদের কাছ থেকে আমি অনেক পেয়েছি। কিন্তু আজকে আমি যা হয়েছি তার পিছনে আমার স্বামী। একটা কথা আমি তোমাদের বলি। আমাদের বিয়ের পরে উনি তো ডেলিগেশনে অক্সফোর্ড গেলেন, সঙ্গে আমি। International Soil Science Congress-এর জন্য ভারতের প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিলেন। সেই প্রথম আমার বিদেশ যাওয়া। ধনীর ঘরে বিয়ে হয়েছিল আমার। ওঁরা ধনী, আমার বাবা দরিদ্র, তাই জানতাম। অক্সফোর্ডে বাবার দেওয়া পরিচয়পত্রের জোরে যে ঘরে থাকতে দিল সে ঘরে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ছিলেন। নানা সময়ে যে ঘরে উইন্টারনিৎজ, লেস্‌নি, এমিল জোলা থেকেছেন সেই সব ঘরে থেকেছি। তারপর যখন ফিরে আসছি, আমার স্বামী আমায় আদর করে বললেন — 'আর নিজেকে গরিবের মেয়ে বোলো না, তোমাকে হোটেলে রাখতে আমার সমস্ত পুঁজিপাটা শেষ হয়ে গেছে। এই ঘরেই রবীন্দ্রনাথ ছিলেন। আমি একটা সস্তার হোটেলের খোঁজ করতে পারলাম না এই দরিদ্র ঘরের কন্যার জন্য।'

শান্তিনিকেতনে আশ্রমকন্যা, আনন্দ সর্বকাজে ও চলে যায় দিন

শান্তিনিকেতনের আশ্রমকন্যা যে কী ধন নিয়ে স্বামীগৃহে গিয়েছিলেন এবং তার যথাযোগ্য মর্যাদা পেয়েছিলেন, সে-কথা অনুভব করে একটু চুপ করে রইলাম।

এই কথোপকথনের সূত্রে তাঁকে আরও একবার উষ্মা প্রকাশ করতে দেখেছিলাম তাঁর একটি গ্রন্থের নব-সংস্করণে লেখিকার পরিচয় দেওয়ার প্রসঙ্গে। লেখা হয়েছিল — উনি অমর্ত্য সেনের মা। এ নিয়ে তাঁর ক্ষোভের প্রকাশ শোনা যাক তাঁরই ভাষায় :

> ওঁরা আমার প্রশংসা করেছিল। লিখেছিল আমার পরিচয় কি? না, উনি অমর্ত্য সেনের মা। আমি বললাম, তোমরা অমর্ত্য সেনের নাম দিলে আর রবীন্দ্রনাথের নাম দিলে না! আর ছেলে কৃতী বলে শুধু ছেলের নাম লিখলে! লেখা উচিত ছিল ওঁর দুটি সন্তান- অমর্ত্য আর সুপূর্ণা।

জানা গেল অমিতাদির বকাবকিতে শেষ পর্যন্ত তাঁরা সেই লেখিকা-পরিচয় অংশটা আবার নতুন করে ছাপতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই ব্যক্তিত্বময়ী বর্ষীয়সী নারীকে নতুন করে চেনা হচ্ছিল আমাদের।

আমরা যে নিতান্তই ভুলবশত তাঁর স্বামী স্বনামধন্য বিজ্ঞানী আশুতোষ সেন-এর নাম উল্লেখ করিনি সে কথা বিনীতভাবে স্বীকার করে সেই ভুলের জন্য ক্ষমা চেয়ে নিলাম। এইটুকুতেই মেঘ কেটে গেল, তিনি অত্যন্ত সহজ হয়ে গেলেন। এর পরে আমরা তাঁর সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেছিলাম — আমাদের শিক্ষিকা প্রণতি মুখোপাধ্যায়, তাঁর প্রণীত ক্ষিতিমোহন-জীবনী, গ্রন্থটি রচনায় লেখিকার প্রেরণা, গ্রন্থটির সার্থকতা ও অপূর্ণতা ইত্যাদি বিষয়ে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন তাঁকে করেছিলাম। তিনি প্রসন্নচিত্তে সে সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন। বয়সের অনিবার্য প্রভাবে হাঁটা-চলা বা লেখালেখি করা তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছে ঠিকই, কিন্তু বয়স তাঁর স্মৃতিতে ধূসরতা লেপন করতে পারেনি ততটা। কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝে কথার খেই হারিয়ে অন্য প্রসঙ্গে চলে যান, মাঝে মাঝে একই কথা আবার বলেন, এইটুকুতেই তাঁর বয়সটা যেন খানিকটা ধরা যায়। কিন্তু মনের তারুণ্য বিস্ময়কর। পরদিন ১৮ জানুয়ারি ফিরে আসার আগে আমরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই। সেইসঙ্গে তাঁর কয়েকটি ছবি তোলার ইচ্ছাও ছিল। সেই ইচ্ছা প্রকাশ করতেই তিনি বললেন, 'ছবিতে বয়স কমিয়ে তোমাদের মতো তরুণ করে দিতে পারবে? তা যদি পারো তা হলে তোলো।' আর একবার কোনো একটি প্রসঙ্গে বলেছিলেন — 'তোমাদের মতো বয়স থাকলে আমি এ নিয়ে মারামারি করতাম।'

তাঁর কথার মধ্যে বারেবারেই নানা ভাবে ঘুরে-ফিরে এসেছে তাঁর পিতা আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন এবং মা কিরণবালা দেবীর কথা। আর, অবশ্যই প্রণতি মুখোপাধ্যায়ের কথা। ছড়িয়ে যাওয়া সেই কথাগুলিকে আমাদের শুধু একটু গুছিয়ে নিতে হয়েছে। প্রণতিদির কথা উঠতেই তিনি তাঁর এক সহায়িকা বললেন *আনন্দ সর্বকাজে* বইটি নিয়ে আসতে। আমাদের বললেন,

> 'ওঁর সম্পর্কে আমি এই বইটাতে লিখেছি। প্রণতিকে আমি আস্তে আস্তে চিনলাম। বাসে করে সেই পাইকপাড়া থেকে রোজ সকালে আসত আমার নিউ আলিপুরের বাড়িতে।

এ কি সহজ কথা! ফিরতি পথে অনেক সময় বাসে উঠতে পারত না, ট্যাক্সি পেত না। শেয়ার-ট্যাক্সিতে আমি তুলে দিতাম।'

এর মধ্যে *আনন্দ সর্বকাজে* বইটি এসে পৌঁছালে তিনি বইয়ের পাতা উল্টে 'আশ্রমকন্যার নিবেদন' শীর্ষক অংশটি খুঁজে বার করলেন। বললেন, 'এতে বোধহয় আছে।' আমরা পড়ে দেখলাম :

> জীবন-সায়াহ্নে সেকালের আনন্দ-স্মৃতিচারণে আপন বেগে আমার কলম চলে, রুখতে আর পারি না তাকে। লেখাটি যেদিন শেষ হল, সেদিন মনে প্রশ্ন এল, এই বই ছাপবে কে? 'আশ্রমকন্যা' বইটির কল্যাণে প্রখ্যাত এক পাব্লিশার আগ্রহে এগিয়ে এলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে গেলেন তাঁরা। তাঁদের মতে বৃহত্তর পাঠকবর্গের কাছে এই বইয়ের আবেদন থাকবে না। যুক্তিযুক্ত কথা। সেকালের আশ্রমকন্যার আবেগের মূল্য আজ কিছু আছে কি? মূল্য কিন্তু দিলেন কলকাতার টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে খুঁটিনাটি সকল তথ্যই ভাবীকালের জন্য সযত্নে রক্ষা করতে আগ্রহী তাঁরা।
>
> টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সম্পাদিকা প্রণতি মুখোপাধ্যায় প্রতিদিন উত্তর কলকাতার এক প্রান্ত থেকে আমার দক্ষিণ কলকাতার আবাসে চলে আসে। পাণ্ডুলিপি নিয়ে বসি দুজনে, প্রেসকপি তৈরি করতে। আমার সোমেনভাই — টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সর্বজনপ্রিয় সোমেন বসুর নির্দেশ, বইকে দুশো পৃষ্ঠার মধ্যে বাঁধতে হবে। শক্ত কাজ, তবু নির্মম হাতে কেটে চলি, বইটির কল্যাণ কামনায়। 'না না এটা কাটবেন না অমিতাদি। এটাতেই তো আশ্রমকন্যার মনের সহজ ভাবটি ফুটে উঠেছে।' 'না না ওটাও কাটবেন না, সাধারণের চোখে রবীন্দ্রনাথ, সে যে বড় মূল্যবান।' 'হ্যাঁ, এটা বরঞ্চ কাটুন। এটা শুধুই আপনার ভাবের উচ্ছ্বাস। কিছু উচ্ছ্বাস তো রেখেছি।' 'অমিতাদি, ওঁর সম্বন্ধে আর কটা লাইন লিখবেন কি? সাহিত্যিক হিসেবে ইনি সুপরিচিত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছাকে, তাঁর স্বপ্নকে রূপ দিতে ইনি যেভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে নিরলস কাজ করে চলেছেন তার খবর ক'জন রাখেন।' এই ভাবে বর্জনে রক্ষণে প্রণতির সহায়তায় আমার সোমেনভাইয়ের নির্দেশ অনুযায়ী বইটিকে সংযত পরিমাপে বাঁধা হল। শুধুই কি কাটা ছাঁটা? 'ও অমিতাদি, ভাষাটা এখানটায় যেন কেমন কেমন লাগছে। দাঁড়ান, দাঁড়ান অত ব্যস্ত হবেন না, আপনার ভাষাই থাকবে, ভয় পাবেন না।' বই আমার ছাপা হোক না হোক, বই বিক্রি হোক না হোক — দুর্লভ এমন আন্তরিক সুরের কথায় আমার মন ভরে যায়। রবীন্দ্রসূত্রে লাভ করা এই সব ছোটো ভাই বোনদের ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়ে দূরে সরিয়ে দিতে তো মন চায় না। চিরকাল ওরা এমনিভাবে আমার আপনজন হয়ে থাক, শুধু এই প্রার্থনা করি।

আমাদের পড়া হয়ে গেছে বুঝে হেসে বললেন :

> আমি বলেছিলাম, আমার লেখা বাছা মানে তোমার রেশনের চালে কাঁকর বাছা। তাতে তখন হেসেছিল, বিশ্বাস করেনি। কিন্তু কাজটা করতে গিয়ে দেখল অমিতাদি কিছু বাড়িয়ে বলেননি।
>
> প্রণতিকে আমি প্রথম দেখি টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটে 'শান্তিনিকেতনে আশ্রমকন্যা' বক্তৃতা দেওয়ার সময়। প্রথম দেখাতেই ও আমাকে আপন করে নিল।

তারপর ওই বইয়ের কাজটা করার সময় ঘনিষ্ঠতা হল। এবার বাবার জীবনী লেখার সময় আমার কাছে এল। আমি ওকে দু-একজনের সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলাম। প্রথমেই গেল সত্যেন রায়ের কাছে, আমি বলেছিলাম। উনি বললেন, ক্ষিতিমোহন খুব বিতর্কিত মানুষ। আর একজন, অনাথনাথ দাস, তিনি বললেন — খুব হিসেবী মানুষ। এখন, যাঁর যেটা মনে হয়। আমার বাবা কৃপণ ছিলেন না, হিসেবী ছিলেন নিশ্চয়ই। তাঁর অর্থ ছিল না বলেই তাঁকে হিসেবী হতে হয়েছে। কোনোদিন ইন্টার ক্লাসে চড়িনি ..... ইচ্ছে করত লাল টিকিটে..... কিন্তু আমরা বরাবর হলদে টিকিটে .... কুলি করিনি। কোনো জায়গায় পেতাম তো চিঁড়ে ভিজিয়ে খেতাম, পাঁউরুটি এরকম করে ছিঁড়ে স্লাইস করে খেতাম। বাবা আমাকে পায়ে হেঁটে, গরুর গাড়িতে, হাতিতে, উটে চড়ে সমস্ত গুজরাট রাজপুতানা-সব দেখিয়েছিলেন। সত্যি, উটে চড়াটা কষ্টকর। আমার মনে আছে, বাবা আমাকে দেখালেন সেই জায়গাটা — 'একা কুম্ভ রক্ষা করে নকল বুঁদি গড়'। সে সব গল্প আমি প্রণতির কাছে করেছি। তারপর সেই কবীর বট, সুরাটের এক কবীরতীর্থ। এ ঘটনাটা বলতে বলতে বাবা বিভোর হয়ে যেতেন। সেখানে এক সাধু এসেছিলেন কবীরের সঙ্গে দেখা করতে। দুজনের কেউ কারো ভাষা বোঝেন না। দুজনে সারা রাত হাতে হাত রেখে বসে রইলেন। আর তাতেই পরস্পরকে তাঁদের বোঝা হয়ে গেল। প্রণতি কিন্তু এ সব কথায় খুব মগ্ন হয়ে গেল।

আমার মায়ের কথা বলি। মা কোনোদিনও থালায় ভাত বেড়ে খেতেন না, ডালের বাটিতে ভাত, তরকারির বাটিতে ভাত। মাছটাছ খেতেন না, নিরামিষ। আমরা তো গরিব ছিলাম, কিন্তু মামাবাড়ি খুব বড়লোক। মা যখন মামাবাড়িতে যেতেন দিদিমার কাছে, তিনি তখন মা কী খেতে ভালোবাসেন — নিজে বসে খাওয়াতেন। অথচ মা কেন যে মামাবাড়িতে থাকতে চাইতেন না, চলে আসতেন! আমি বলতাম, তোমার মা তোমায় এত ভালোবাসেন, মামাবাড়িতে এত আরাম, তবু তুমি সেখানে থাকতে চাও না কেন? ক্ষিতিমোহন সেনের জীবনে কিরণবালার অবদানও কম নয়। যে কথা বলেছিলাম, বাবা কৃপণ ছিলেন না। তাঁর অর্থ ছিল না। তাই তাঁকে হিসেবী হতে হয়েছিল। আমার বাবা ভ্রমণ করতে খুব ভালোবাসতেন, বলতেন — 'বৈরাগীর পথে শিক্ষা'। সেটাই তাঁর আদর্শ ছিল। প্রণতি আমার কাছে এসে কাজ করতে করতে এটা আরও ভাল করে বুঝতে পারল যে কী অসম্ভব রকম কষ্ট করে আমরা মানুষ হয়েছি। আমার অমর্ত্যর তো গুরু ছিলেন আমার বাবা-ই। আজ যে আমি অমর্ত্য সেনের মা, বছর বছর বিদেশ যাচ্ছি, বাবার আদর্শে মানুষ না হলে সেটা কি সম্ভব হত?

প্রণতি কিভাবে ক্ষিতিমোহন সেনের জীবনী লেখার অনুপ্রেরণা পেয়েছিল আমি জানি না, আমি তো আর তাকে লিখতে বলিনি। কিন্তু লিখছে বলেই আমার কাছে এসেছিল। এখন কঙ্কবদার (আমার দাদা ক্ষেমেন্দ্রমোহন সেন) কাছেও গিয়েছিল তারপর এসে আমাকে বলল — 'কঙ্করদা আমাকে বাজিয়ে দেখেননি। উনি তো আমাকে চেনেন না, আপনার কথাতেই বোধহয় কাগজপত্র সমস্ত আমায় দিয়ে দিলেন। বললেন, তোমার যা মন চায় করো।' প্রণতি তার সদ্ব্যবহার করেছে।

আমার বাবার হাতের লেখা ভাল ছিল না, প্রণতি পড়তে পারছিল না। আমাব মাকে লেখা বাবার চিঠি সব আমি ওকে পড়ে শোনাতাম।

এই যে প্রণতি ক্ষিতিমোহন-জীবনী লিখল, এটা অতি পরিশ্রমসাধ্য কাজ। এর আগে তাঁকে নিয়ে এরকম বিস্তারিতভাবে কেউ লিখেছে কিনা জানি না। হ্যাঁ, হীরেনবাবুর (হীরেন্দ্রনাথ দত্ত) একটা বইয়ে একটু আছে। বাবা এক জায়গায় বলেছেন — 'আমরা ছিলাম কাদার তাল', কিন্তু হীরেনবাবু বলেছেন, 'কাদার তাল ছিলেন না, ক্ষিতিমোহনবাবু ছিলেন সোনার তাল।' কিন্তু প্রণতি যে জীবনীটা লিখল সেটা একেবারে ঠিক আমার বাবার। একটাও অসত্য তথ্য, বানানো তথ্য একটাও নেই, বরঞ্চ দু-একটা বাদ গেছে হয়ত।

সেই সময়ের ইতিহাস হয়ে উঠেছে কিনা জানতে চাইছ? ইতিহাসই তো লিখেছে। সেটা অনেকটাই পেরেছে। আমার তো অনেক সময় মনে হয় প্রণতির সঙ্গে প্রমথ বিশীর যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারলে বোধহয় ভালো হত। তিনি তো বাবার ছাত্র ছিলেন। আমি এ বইয়ের কোনো অপূর্ণতা দেখতে পাইনি। ঠিক ধরতে পেরেছে আমার বাবাকে। বরং অবাক হয়েছি যে প্রণতি এতটা কি করে করতে পারল! একটা কথা অবশ্য উঠতে পারে। যদি আমি এখন বলি, আমি তো সমস্ত জায়গায় বাবার সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছি। সে সব কথা তো আর প্রণতির লেখায় নেই। অবশ্য সে সব কথা আমি আমার লেখায় দিয়েছি কিছু কিছু।

কথা বলতে বলতে তিনি প্রসঙ্গান্তরে চলে গেলেন, বললেন :

মোহনদাসভাইয়ের কাছ থেকেও প্রণতি অনেক সাহায্য পেয়েছে এই বইয়ের ব্যাপারে। মোহনদাস লোকটা একেবারে গ্রামের লোক। ওদের গ্রামের নাম কোসিন্দ্রা কাশীপুরা। মাঝখানে কোপাই নদীর মতো একটা নদী পড়ে। কোসিন্দ্রা-কাশীপুরা গ্রামে আমি গেছি। আশ্রমে নীচের তলায় গরু-বাছুর-ছাগল, আর ওপরতলায় আমরা শুতাম। তখন বাবা ওই হরিণী (হরনি) নদীর ধারে বসে গান করতেন। আমার মনে আছে, সেখানে আমি আর বাবা একসঙ্গে 'আর নাইরে বেলা, নামল ছায়া' গানটি গেয়েছিলাম। আমি তো অমিতা সেন (খুকু)-এর মতো গায়িকা ছিলাম না! কিন্তু বেসুরে গাই না। বাবা খুব ভাল গাইতেন। তোমরা শুনলে অবাক হয়ে যাবে, 'ম্যয়নে চাকর রাখো জী' গানটা দিলীপকুমার রায় শিখেছিলেন বাবার কাছ থেকে। বাবার আলোচনা থাক, এখন প্রণতির কথা শোনো।

প্রণতিকে আমার মনে হয় সাধারণের থেকে একটু ভিন্ন ধরনের মানুষ। প্রণতির মতো মেয়েকে আমি যে এইরকম নিকটে, কন্যাস্থানে পেয়েছি, সে আমার পরম সৌভাগ্য। প্রণতি যেটা করে তার একেবারে গভীরে যায়। রসকষহীন মোটেই নয়, খুব সরস। কোনো কিছুতেই রাগ করে না। আমি একবার ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তুমি কি কোনোদিন রাগ করো নি? ওর মধ্যে কি সাধারণ মানুষের মতো সাধারণ অনুভূতিগুলো ছিল না? সবই ছিল। কিন্তু ও যে নিজেকে কী অসম্ভব রকমের সংযত করে সুন্দর কল্যাণ পথে হেঁটে চলেছে! প্রণতিকে তাপসী বা সাধিকা বলা যায়। ফুল বিছানো পথ পায়নি, কাঁটা পেয়েছে। সোমেনের ভাবশিষ্যা হয়ে রবীন্দ্রচর্চা করেছে। আমি তো বলি, সোমেনকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল ও, কারণ সব পিছুটান পিছনে ফেলে ও এসেছিল, নিজেকে dedicate করেছিল। আবার সোমেনের মৃত্যুর পর সব ফেলে চলে এল। সোমেনকে আমি খুব মিস্ করি। কলকাতায় যখন ইনস্টিটিউট থেকে আমার কাছে

ইনস্টিটিউট অব কালচারের গেস্ট হাউসে আসত, পাঞ্জাবিতে এখানে-ওখানে নোংরা। আমি বলতাম, ইনস্টিটিউট থেকে আসছ বোধহয়? আর যেদিন তোমাদের ফাংশন হত, সেদিন সব ধোপদুরস্ত। ... কী করে ওর প্যান্‌ক্রিয়াসে কী যে হল! ওর মৃত্যুটা এত লোকসান! সেই সময় আমি বিলেতে ছিলাম। ওর মৃত্যুর কথা অনেকদিন মেনে নিতে পারিনি।

প্রণতি একেবারে একাগ্র — সেই অর্জুন যেমন লক্ষ্য ছাড়া আর কিছুই চোখে দেখেনি, সেইরকম। যখন যা করে তখন সেটাই। এখন ক্ষিতিমোহনের রচনা সংকলন করছে। এর মধ্যে শুনলাম, ও নাকি বসুমতী-র কি সব কাজ করছে। আমি ওকে বললাম, তুমি কি বাবার সংকলনের কাজটা ছেড়ে দিলে? ও বলল, ' সে কী! ছেড়ে দেব কেন! কিন্তু অমিতাদি, বসুমতী যে আমার পরিবারের। ...আমি সবই করব।'

আমরা জিজ্ঞেস করলাম — গত পরশু ১৫ জানুয়ারি ২০০৩ আপনার সুযোগ্য পুত্র অমর্ত্য সেন ক্ষিতিমোহন সেন রচনা সংকলনের প্রথম খণ্ড *সাধক ও সাধনা* প্রকাশ করেছেন কলকাতার লিট্‌ল ম্যাগাজিন মেলার মঞ্চে, প্রণতিদিও উপস্থিত ছিলেন। বইটা তো আপনার হাতেই রয়েছে। দেখেছেন কি?

এখনও দেখা হয়নি। অমর্ত্য কিন্তু প্রণতিকে খুব শ্রদ্ধা করে।

ক্ষিতিমোহন-জীবনীর ম্যানাসক্রিপ্টটা নিয়েছিল, খুব তাড়াতাড়িই ফেরত দিল। আমি প্রণতিকে বলেছিলাম, বাবলু নিশ্চয় পড়েনি। প্রণতি আমায় দেখাল — প্রত্যেকটি লাইন পড়েছে, আণ্ডারলাইন করেছে— একেবারেই পল্লবগ্রাহী নয়।

তোমরা, প্রণতির ছাত্রছাত্রীরা প্রণতি সম্পর্কে লিখছ, এতে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। আমার আশীর্বাদ রইল। আমার কাছে যা সাহায্য চাও পাবে।

দিদি, আপনি যদি আরও কিছু বলেন ....

প্রণতির মতো কন্যারত্ন এ যুগে পাওয়া যায় না। আমি তো এমন দেখিনি।

তা হলে আজকের মতো শেষ করি?

শেষ করো। শেষ করে এখনকার মেয়েদের আশীর্বাদ করে বলি, প্রণতিকে আদর্শ করে মেয়েরা যদি নিজেদের গড়তে পারে তার মতো সৌভাগ্য আর হয় না।

আমরা আমাদের শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা প্রণাম জানালাম।

আশীর্বাদ করে অমিতাদি বললেন :

প্রণতিকে তোমরা ফুটিয়ে তোলো। যথেষ্ট বললাম, তবু মনে হচ্ছে কিছুই বলিনি।

এই সাক্ষাৎকারের মাসখানেক পরে আমাদের কাছে অমিতাদির স্বাক্ষর করা একটি চিঠি আসে, অনুলেখক : অরবিন্দ নন্দী। তাঁকেও আমাদের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সেই চিঠিটা প্রকাশ করছি।

অমিতা সেন **প্রতীচী**
শ্রীপল্লী। শান্তিনিকেতন ৭৩১২৩৫

কল্যাণীয়/কল্যাণীয়া
অসীম দাশশর্মা
গোপা দাশশর্মা
'নবার্ক', কলকাতা- ৪৫।

কল্যাণীয়েষু,

তোমাদের দেওয়া দশটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে কী প্রণতি মুখোপাধ্যায়কে আমি তাঁর স্বমহিমায় তুলে ধরতে পারবো? সে তো সহজ কাজ নয়। আমার 'শান্তিনিকেতনে আশ্রমকন্যা' বইটি অনুলিখনের সময় থেকে তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্কের শুরু। আজ তিনি আমার অতি আদরের আপনজন। এখন সর্বদা তাঁকে আমি সাধিকা বলে থাকি। তাঁর সঙ্গে লেখাপড়ার কাজ করতে করতে আজ মনে হচ্ছে তিনি যেন আমার ধরা ছোঁয়ার বাইরে। এমন একটি আত্মীয়তার সূত্রে তাঁর সঙ্গে বাঁধা পড়ে গেছি — সে বন্ধন কোনদিন এতটুকু শিথিল হবে না — দিনে দিনে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হচ্ছে, হবে। তাই তোমাদের দেওয়া দশটি প্রশ্নের জালে সাধিকা প্রণতিকে তাঁর সার্বিক পরিচয়ে তুলে ধরতে সক্ষম হ'ব কী?

তোমরা প্রশ্ন লিখে দিয়েছ, পর পর উত্তর দিতে গেলে মনে হয় আবার যেন এই একানব্বই বছর বয়সে ম্যাট্রিক, আই.এ, বি.এ. পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর দিতে বসেছি — প্রণতির বিষয়ে লেখা মানে তো পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের উত্তর নয়, সে যে স্বতস্ফূর্ত অমৃতধারা।

লিখতে বসে প্রণতির নানা গুণের স্নিগ্ধ ছটার জালে আমি জড়িয়ে পড়ি — কোনটা ছেড়ে কোনটা লিখব। প্রণতির সম্বন্ধে লিখতে হলে নিজেকে সংযত করে অনেক উর্ধ্বে উঠতে হবে এবং মনকে সত্য ও স্বচ্ছতায় ধরে রাখতে হবে।

লেখার সূত্রে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায় আমি তাঁর পরিচয় পেতে শুরু করেছি — আমার মতো সাধারণ একজন গৃহিনীর সঙ্গে কাজ করার যে ধৈর্য ধরা সে তো সহজ কাজ নয়! প্রণতির চলাফেরা, কথাবার্তা, আলোচনা, মতামত এত সাধারণ যে এই সাধারণের মধ্যে অমূল্যের যে উৎস রয়েছে তা বুঝতে সময় লাগে । রবীন্দ্রনাথের প্রতি আকর্ষণ সে তো সকলেরই সমভাবে আছে। প্রণতিরও সে আকর্ষণ গভীরভাবে ছিল। প্রণতি 'রবীন্দ্রচর্চা'য় আবদ্ধ ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও 'রবীন্দ্রচর্চা'র প্রতি তাঁর এত আর্কষণ শুধুই কী রবীন্দ্রচর্চা—তার চেয়েও বেশি আরও বেশি আকর্ষণ কি ছিল না? সেটা ছেড়ে দিয়ে এর

উত্তরে মনে হয় রবীন্দ্রনাথের গানের কলি — 'মরি লো মরি আমায় বাঁশিতে ডেকেছে।' সাধিকা প্রণতির কানেও পৌঁছেছিল সেই স্বর্গীয় বাঁশির ধ্বনির আহ্বান; কিন্তু তাঁকে উতলা করে নি — করেছিল ধীর, স্থির, সাধিকা। আজও তিনি সুরের মূর্চ্ছনায় সাধনার পথে এগিয়ে চলেছেন। আমরা ভাগ্যবতী, সেই সাধিকার মনের সেই স্পর্শটি অনুভব করতে পেরেছি।

আমার মনে অনেক কিছু চাপা অনুভূতির মধুর সুর বেজে ওঠে — তাকে সংযত করবার শক্তি এই একানব্বই বছরের আশ্রমকন্যা আমার নেই। আমার পিতৃদেব আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের জীবনালেখ্য লেখার সূত্রে আজ তিনি আমাদের পরিবারেরই একজন। শান্তিনিকেতনবাসী বিদ্বৎসমাজে কারো কারো কাছে ক্ষিতিমোহন 'অতি হিসেবী মানুষ', কারো কারো কাছে 'বিতর্কিত মানুষ', আবার হীরেন দত্ত মহাশয়ের মতো মানুষের কাছে ক্ষিতিমোহন ছিলেন 'সোনার তাল'। প্রণতির 'ক্ষিতিমোহন সেন ও অর্ধশতাব্দীর শান্তিনিকেতন' গ্রন্থটিতে সাধক ক্ষিতিমোহনকে ধরা যায়। লেখিকা প্রণতি নিজেই সাধিকা বলে ক্ষিতিমোহনের সঠিক পরিচয় তাঁর পক্ষে পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

তোমাদের 'গুরুজন সংবর্ধনা স্মারক গ্রন্থ'-এ আমার এই বক্তব্যটি যদি তোমরা প্রকাশ করো তবে সেটাই হবে তোমাদের সঙ্গে আমার আদরের প্রণতিকে স্নেহার্ঘ্য দান, তাতেই হবো আমি তৃপ্ত। ইতি

‘পাখি তোর সুর ভুলিস নে’

প্রণতি মুখোপাধ্যায়

গত ১১ জুলাই ২০০২ ‘গুরুজন সংবর্ধনা’ অনুষ্ঠানে ‘আমার কথা’ শীর্ষক লিখিত প্রতিভাষণে আপনি সংক্ষেপে আপনার শৈশব ও পরবর্তী জীবনের কিছু গভীর উপলব্ধির কথা বলেছিলেন। আমাদের আরও কিছু কৌতূহল নিরসনের জন্য কয়েকটি প্রশ্ন করছি।

প্রশ্ন। আপনার পিতামহ উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। বাংলার সারস্বত সাধনায় বসুমতী এবং বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের অবদান বহুবিদিত। আপনার পিতা সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও বহুকাল বসুমতীর সেই ধারা বহন করে চলেছিলেন। আমরা আপনার কাছ থেকে তাঁদের সম্পর্কে, আপনার মাতাপিতা ভাইবোন সম্পর্কে জানতে আগ্রহী। আপনার শৈশব ও পরবর্তী জীবনে, আপনার রবীন্দ্রচর্চায় তাঁদের প্রভাব কতখানি সক্রিয় বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর। আমি জন্মেছিলাম পিতামহ উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর অনেক পরে। পিতা সতীশচন্দ্রও আমার বাল্যকালে গত হন। এঁদের কোনো প্রত্যক্ষ প্রভাবের ধারণা আমার নেই। বংশগত বা জিনঘটিত প্রভাব তাঁদের নিশ্চয় কাজ করেছে আমার ভিতরে অলক্ষিতে, সে খবর তো রাখিনি। এইটুকু জানি, এই দুটি মানুষের কঠিন পরিশ্রমের অন্নে আমি প্রতিপালিত। এঁরা রক্ষণশীল, সনাতন হিন্দুধর্মের প্রচারে ও প্রসারে বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের আগ্রহ ও উদ্যোগ সর্বজনবিদিত। উপেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৃহী শিষ্য, সতীশচন্দ্র স্বামী শিবানন্দের আশ্রিত। রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে বসুমতী পরিবারের অচ্ছেদ্য যোগের কথা অনেকেই জানেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীমায়ের শরণাগতিতে কৃতার্থতা বোধ আমাদের রক্তে, রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতি সশ্রদ্ধ আনুগত্য আমাদের সহজাত। ঠাকুর ও মায়ের নামের পাথেয় সম্বল করে আমার পিতামহী ‘বসুমতী-মা’ তাঁর শোকদীর্ণ সুদীর্ঘ জীবন দিব্য আনন্দে কাটিয়ে গেলেন। ছয় ভাইবোন আমরা। সব প্রথমে দিদি, তাঁর নাম ছিল দীপ্তি। আমি তাঁরই কাছে মানুষ। তার পরে দাদা রামচন্দ্র, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সোনার মেডেল পাওয়া ছেলে। শুনেছি ছোড়দি প্রীতিও খুব গুণের মেয়ে ছিল। তার পরে রাঙাদি ভক্তি আর ফুলদি আরতি এবং শেষে আমি।

রক্ষণশীল পরিবারের সন্তান হয়েও অচলায়তনে বাস করার দুর্ভাগ্য আমাদের হয় নি। বাড়ির আবহাওয়া একশ ভাগই এ দেশীয় এবং সাহিত্য-সংগীতের চর্চা সেখানে অবাধ ছিল। বিশ-তিরিশের দশকে কলকাতার আবহাওয়ায় রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সৃষ্টির যে অনুচ্চকিত কিন্তু অনিবার্য প্রভাব প্রসারিত ছিল, আমার মা এবং ভাইবোনদের অন্তর দূর থেকে হলেও তার দ্বারা নন্দিত এবং স্পন্দিত হয়েছে। নিজেদের ঘরোয়া পরিবেশে দাদা-দিদিরা রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠ করত, তাঁর গান গাইত। সকলকে বসবার ঘরে জড়ো করে তাঁর নাটক পড়ে শোনাত দাদা। অন্য সাহিত্যিকদের কারো কারো লেখাও পড়তে কখনও।

উত্তরে মনে হয় রবীন্দ্রনাথের গানের কলি — 'মরি লো মরি আমায় বাঁশিতে ডেকেছে।' সাধিকা প্রণতির কানেও পৌঁছেছিল সেই স্বর্গীয় বাঁশির ধ্বনির আহ্বান; কিন্তু তাঁকে উতলা করে নি — করেছিল ধীর, স্থির, সাধিকা। আজও তিনি সুরের মূর্চ্ছনায় সাধনার পথে এগিয়ে চলেছেন। আমরা ভাগ্যবতী, সেই সাধিকার মনের সেই স্পর্শটি অনুভব করতে পেরেছি।

আমার মনে অনেক কিছু চাপা অনুভূতির মধুর সুর বেজে ওঠে — তাকে সংযত করবার শক্তি এই একানব্বই বছরের আশ্রমকন্যা আমার নেই। আমার পিতৃদেব আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের জীবনালেখ্য লেখার সূত্রে আজ তিনি আমাদের পরিবারেরই একজন। শান্তিনিকেতনবাসী বিদ্বৎসমাজে কারো কারো কাছে ক্ষিতিমোহন 'অতি হিসেবী মানুষ', কারো কারো কাছে 'বিতর্কিত মানুষ', আবার হীরেন দত্ত মহাশয়ের মতো মানুষের কাছে ক্ষিতিমোহন ছিলেন 'সোনার তাল'। প্রণতির 'ক্ষিতিমোহন সেন ও অর্ধশতাব্দীর শান্তিনিকেতন' গ্রন্থটিতে সাধক ক্ষিতিমোহনকে ধরা যায়। লেখিকা প্রণতি নিজেই সাধিকা বলে ক্ষিতিমোহনের সঠিক পরিচয় তাঁর পক্ষে পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

তোমাদের 'গুরুজন সংবর্ধনা স্মারক গ্রন্থ'-এ আমার এই বক্তব্যটি যদি তোমরা প্রকাশ করো তবে সেটাই হবে তোমাদের সঙ্গে আমার আদরের প্রণতিকে স্নেহার্ঘ্য দান, তাতেই হবো আমি তৃপ্ত। ইতি

শুভার্থিনী

আশ্রমকন্যা অমিতা সেন
১১/২/২০০২

অনুলিখন :
অরবিন্দ নন্দী
'প্রতীচী', ১৯/২/২০০৩

‘পাখি তোর সুর ভুলিস নে’

প্রণতি মুখোপাধ্যায়

প্রতিভাষণে আপনি সংক্ষেপে আপনার শৈশব ও পরবর্তী জীবনের কিছু গভীর উপলব্ধির কথা বলেছিলেন। আমাদের আরও কিছু কৌতূহল নিরসনের জন্য কয়েকটি প্রশ্ন করছি।

প্রশ্ন। আপনার পিতামহ উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। বাংলার সারস্বত সাধনায় বসুমতী এবং বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের অবদান বহুবিদিত। আপনার পিতা সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও বহুকাল বসুমতীর সেই ধারা বহন করে চলেছিলেন। আমরা আপনার কাছ থেকে তাঁদের সম্পর্কে, আপনার মাতাপিতা ভাইবোন সম্পর্কে জানতে আগ্রহী। আপনার শৈশব ও পরবর্তী জীবনে, আপনার রবীন্দ্রচর্চায় তাঁদের প্রভাব কতখানি সক্রিয় বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর। আমি জন্মেছিলাম পিতামহ উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর অনেক পরে। পিতা সতীশচন্দ্রও আমার বাল্যকালে গত হন। এঁদের কোনো প্রত্যক্ষ প্রভাবের ধারণা আমার নেই। বংশগত বা জিনঘটিত প্রভাব তাঁদের নিশ্চয় কাজ করেছে আমার ভিতরে অলক্ষিতে, সে খবর তো রাখিনি। এইটুকু জানি, এই দুটি মানুষের কঠিন পরিশ্রমের অন্নে আমি প্রতিপালিত। এঁরা রক্ষণশীল, সনাতন হিন্দুধর্মের প্রচারে ও প্রসারে বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের আগ্রহ ও উদ্যোগ সর্বজনবিদিত। উপেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৃহী শিষ্য, সতীশচন্দ্র স্বামী শিবানন্দের আশ্রিত। রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে বসুমতী পরিবারের অচ্ছেদ্য যোগের কথা অনেকেই জানেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীমায়ের শরণাগতিতে কৃতার্থতা বোধ আমাদের রক্তে, রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতি সশ্রদ্ধ আনুগত্য আমাদের সহজাত। ঠাকুর ও মায়ের নামের পাথেয় সম্বল করে আমার পিতামহী ‘বসুমতী-মা’ তাঁর শোকদীর্ণ সুদীর্ঘ জীবন দিব্য আনন্দে কাটিয়ে গেলেন। ছয় ভাইবোন আমরা। সব প্রথমে দিদি, তাঁর নাম ছিল দীপ্তি। আমি তাঁরই কাছে মানুষ। তার পরে দাদা রামচন্দ্র, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সোনার মেডেল পাওয়া ছেলে। শুনেছি ছোড়দি প্রীতিও খুব গুণের মেয়ে ছিল। তার পরে রাঙাদি ভক্তি আর ফুলদি আরতি এবং শেষে আমি।

রক্ষণশীল পরিবারের সন্তান হয়েও অচলায়তনে বাস করার দুর্ভাগ্য আমাদের হয় নি। বাড়ির আবহাওয়া একশ ভাগই এ দেশীয় এবং সাহিত্য-সংগীতের চর্চা সেখানে অবাধ ছিল। বিশ-তিরিশের দশকে কলকাতার আবহাওয়ায় রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সৃষ্টির যে অনুচ্চকিত কিন্তু অনিবার্য প্রভাব প্রসারিত ছিল, আমার মা এবং ভাইবোনদের অন্তর দূর থেকে হলেও তার দ্বারা নন্দিত এবং স্পন্দিত হয়েছে। নিজেদের ঘরোয়া পরিবেশে দাদা-দিদিরা রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠ করত, তাঁর গান গাইত। সকলকে বসবার ঘরে জড়ো করে তাঁর নাটক পড়ে শোনাত দাদা। অন্য সাহিত্যিকদের কারো কারো লেখাও পড়তে কখনও।

বাড়ির ছোটরাও জ্ঞানে-অজ্ঞানে তারই আভাস-মাখা পরিবেশে বাস করেছে।

রাঙাদি-ফুলদি বলে, ওরা 'চিত্রাঙ্গদা' অভিনয় দেখেছিল। মঞ্চের একধারে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বসেছিলেন। অভিনয়-শেষে মঞ্চের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মন্ত্র আবৃত্তি করেছিলেন, সে ওদের বেশ মনে পড়ে। আমার অবশ্য এ-হেন সৌভাগ্য হয়নি। দাদার সঙ্গে একবার সকলে নিউ এম্পায়ার হলে 'নটীর পূজা' নাটকের অভিনয় দেখতে গিয়েছিল, আমিও ছিলাম সেই দলে। ঘটনাটা সম্ভবত ১৯৪৩ সালের। পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষে সাহায্যকল্পে শান্তিনিকেতনের উদ্যোগে অভিনয়ের আয়োজন হয়েছিল বলে শুনেছি। ভূমিকালিপির কয়েকটি নাম : রাণী লোকেশ্বরী—সুজাতা মুখোপাধ্যায়; শ্রীমতী—নন্দিতা কৃপালনী; রত্নাবলী—কণিকা মুখোপাধ্যায় (বন্দ্যোপাধ্যায়); ভিক্ষুণী উৎপলপর্ণা—সুপ্রিয়া মুখোপাধ্যায় (আচার্য)। অন্যান্য রাজকুমারীদের মধ্যে সুচিত্রা মুখোপাধ্যায় (মিত্র) ছিলেন। বোধহয় উপালি হয়েছিলেন শান্তিদেব ঘোষ। দলবদ্ধ বৌদ্ধভিক্ষুর কণ্ঠে শোনা গিয়েছিল 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বি'। গায়কদের মধ্যে চারজনের নাম মনে পড়ছে— দেবব্রত বিশ্বাস, শান্তিদেব ঘোষ, সন্তোষ সেনগুপ্ত, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

আমার বোধহয় তখন বয়স ছিল বছর ছয়েক। জীবনের সেই প্রথম দেখা অভিনয় এখনও যেন স্বপ্নের মতো মনে পড়ে। সব কথা বুঝিনি নিশ্চয়, কিন্তু 'পূজারিনী' কবিতাটা তো জানতাম, কাহিনীটা বুঝতে কোনো অসুবিধা হয়নি। কে কোন ভূমিকায় অভিনয় করলেন তারও মর্ম বোঝবার সামর্থ ছিল না, পরে দিদিরা বলেছে।

জ্ঞান উন্মেষের ক্ষণ থেকেই রবীন্দ্রসংগীত শুনেছি। গান ভাসত বাড়ির বাতাসে, বাজত রেকর্ডে। রাঙাদি তো গান ছাড়া থাকতেই পারত না। বেশ কিছুদিন ওরা দুই বোন পঙ্কজকুমার মল্লিকের ভাই অম্বুজকুমার মল্লিকের কাছে গান শিখত। অজস্র গান তখন শুধু শুনিনি, শুনতে শুনতে প্রায় সব গানই আমার শেখাও হয়ে যেত অজান্তেই। সে-সব গানের সঙ্গে আজও আমার সেই দিনগুলোর স্মৃতি নিবিড় হয়ে জড়িয়ে আছে। আর একটু বড় হয়ে অন্ত্যাক্ষরী খেলেছি ওদের সঙ্গে। আমাদের খেলায় কেবলই রবীন্দ্রনাথের গান আর কবিতা ব্যবহার হত, আর কেবল যে প্রথম পঙক্তি থেকেই শুরু করতে হত, তা নয়। আবশ্যক মতো আদ্যক্ষরের তাগিদে আমরা গানের স্থায়ী অন্তরা সঞ্চারী আভোগের যে-কোনো কলি বেছে নিতাম, কবিতার যে-কোন স্তবকের যে-কোন পঙক্তি। তবে অর্ধপথে বিনা মিলে ছাড়া চলত না, অন্ত্যমিলের সর্তপূরণ হওয়া চাই-ই চাই। তাঁর গদ্যছন্দের কবিতা নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা ছিল না, সে-সব পড়িইনি তখন, মুখস্থ করা তো দূরস্থান। তখন বেশি নির্ভর ছিল কিছু গান আর *শিশু, শিশু ভোলানাথ, খাপছাড়া, কথা ও কাহিনী, গীতাঞ্জলি, সঞ্চয়িতা, চয়নিকা* — এই-সবের উপর।

চল্লিশের দশকের মাঝামাঝির মধ্যে কয়েকটি অকালমৃত্যু জীবনটাকে অনেকটাই পাল্‌টে দিয়েছিল। উনিশ বছর বয়সে ছোড়দি চলে গেল টাইফয়েডে, বছর তিনেক যেতে না যেতে একই রোগে দাদা, তখন তাঁর বয়স চব্বিশ। দাদার মৃত্যুর পরে শোকাহত বাবা ছিলেন মাস দেড়েক মাত্র, মা বছর দেড়েকের একটু বেশিই। তার মধ্যে তাঁর দুই কিশোরী কন্যার বিয়ে

দিয়েছিলেন তিনি। কাশীতে তাঁর জীবনাবসানের পর কলকাতায় ফিরে রাঙাদি-ফুলদি পাকাপাকি অধিষ্ঠিত হল তাদের শ্বশুরবাড়িতে এবং আমি ভর্তি হলাম বেথুন স্কুলে ক্লাস ফোরে। নতুন অধ্যায়ের শুরু হল। আমার ছেলেবেলাটা তাই নিতান্ত নিরানন্দ অনুজ্জ্বল, চোখের জলে ভিজে। বড় নিঃসঙ্গ ছিলাম। গল্পের বই সঙ্গী ছিল, সঙ্গী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। অনেক হারিয়েছিলাম, তিনি হারাননি। তখন তো জেনে-বুঝে চেষ্টা করে পেতে শিখিনি। আলো-হাওয়ার মতো চারপাশের পরিবেশ থেকে অনায়াসে যেটুকু পেয়েছি। স্কুলে দিনারম্ভের প্রার্থনায় সমস্বরে মন্ত্র উচ্চারণ করেছি 'ওঁ পিতা নোহসি'। কতকাল পরে এ-কথা জানা হল এ মন্ত্র রবীন্দ্রনাথের কত প্রিয়। মন্ত্রোচ্চারণের পরে এক-এক দিন এক-একটি গান হত সমবেত কণ্ঠে — 'আমারে দিই তোমার হাতে' 'অন্তর মম বিকশিত করো' 'তুমি আমাদের পিতা' 'বিশ্ব-সাথে যোগে যেথায় বিহারো' 'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে' 'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার'। রাঙাদির পতিগৃহ-অন্তর্ধানে বাড়িতেও গান একেবারে থেমে যায়নি। আর এক তরুণী আত্মীয়া ছিলেন, তিনিও পিয়ানো বাজিয়ে খোলা গলায় গান গাইতেন — 'তোমরা যা বলো তাই বলো' 'অমল ধবল পালে লেগেছে' 'গানের ঝরণাতলায় তুমি সাঁঝের বেলায় এলে'। শুনতে শুনতে কত গান শেখা হয়ে যেত। খুব নিয়মিত না হলেও একটু-আধটু গান শিখেছি। তাতে গাইয়ে হইনি, রবীন্দ্রনাথের দু-দশখানা গানের সঙ্গে অপরিচয় ঘুচেছে — 'সে গান আমার লাগল যে গো লাগল মনে'। বিংশ শতাব্দীর বাংলায় বাস করে কত কত অসাধারণ শিল্পীকণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের গান শুনলাম। চেনা গানের সঙ্গে আজও তো মনে মনে গলা মেলাতে পারি — সেই আমার অনেক — 'সেই বহু মানি'।

একাকী গায়কের নহে তো গান, মিলিতে হবে দুই জনে —
গাহিবে একজন খুলিয়া গলা, আরেক জন গাবে মনে।
তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ তবে সে কলতান উঠে,
বাতাসে বনসভা শিহরি কাঁপে তবে সে মর্মর ফুটে।

প্রশ্ন। আপনার ছাত্রজীবন — স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি, যে শিক্ষকেরা আপনাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছেন, এবং স্মরণীয় সহপাঠীদের কথা জানতে আমরা আগ্রহী। আপনার অধ্যাপক জীবনের স্মৃতি, স্মরণীয় সহকর্মীদের কথা যদি কিছু বলেন।

উত্তর। প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে এত সব কথা এসে পড়ল। কিন্তু নিজের কথা নিয়ে বেশি নাড়াচাড়া করে লাভ কি। আমার মতো মানুষের ব্যক্তিগত কথায় 'কার আছে কোন্ কাজ'। এ ব্যাপারে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের একটি কথা মনের মধ্যে আমি সার জেনেছি :

কথা যত আছে মনের তলায় তলিয়ে
ভুলেও কখনো সহসা তাদের নাড়ি নে।

আমার শিক্ষাজীবন-কর্মজীবনের দু-চার কথা বলতে বলা হয়েছে। সর্বনাশ। আমি কি শেষে আত্মজীবনী লিখবার তোড়জোড় শুরু করব নাকি। তবু প্রশ্নসূত্রে এ-কথাটা শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করি যে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক অধ্যাপক কালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক সোমেন্দ্রনাথ বসু। প্রথমজনের কাছে দর্শন পড়েছি, দ্বিতীয়জনের কাছে রবীন্দ্রনাথ।

সোমেনদাকে বেশিদিন দেখেছি , নানা পরিস্থিতিতে দেখেছি , কালীকৃষ্ণবাবুকে ততটা হয়তো নয়। তবু মানুষ হিসেবে এঁরা দুজনেই আমার কাছে অবিস্মরণীয়। শিক্ষকপ্রতিম আরও অনেকে মনের গভীরে ছাপ রেখে গেছেন। অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য, অধ্যাপক রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত, অধ্যাপিকা গৌরী আইয়ুব, অধ্যাপিকা আরতি সেনের মতো মানুষ খুব বেশি দেখিনি। মৈত্রেয়ী দেবীর প্রতি পূর্বমুগ্ধতা ছিল, তবু স্বপ্নভঙ্গ হয়নি। কাছ থেকেও তাঁর ব্যক্তিত্ব আমাকে বিশেষভাবেই আকর্ষণ করেছে। অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরীর কাছে অল্পদিনই রবীন্দ্রনাথ পড়বার সুযোগ পেয়েছিলাম, সেটুকু তেমন উল্লেখের দাবি হয়তো রাখে না। কিন্তু তাঁর সস্নেহ সম্পর্ক আমাকে ধন্য করেছে। ভুদেবদা সদ্যই চলে গেলেন। অধ্যাপক সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কোনোদিন আমার শিক্ষক ছিলেন না, তবু আমি তাঁর ছাত্রী। তাঁর কাছে যা শিখেছি, আজও শিখি, যে সাহায্য উপদেশ পরামর্শ পেয়েছি এবং আজও পাই, তার মূল্যের কোনো পরিমাপ করা যাবে না। একই কথা একই ভাবে বলতে চাই অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাস সম্পর্কে। এঁদের মতো মানুষের পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানচর্চার ব্যাপ্তি ও গভীরতার সম্যক ধারণা করার সাধ্যই আমার নেই। দিলীপদা বাড়ির কাছেই থাকেন, আপন জনের মতোই তাঁর কাছে মাঝে মাঝে যাই। কত সময় ঘা-খাওয়া মন নিয়ে গেছি। তারও আগে ইন্দিরা গান্ধীর করুণ অভাবিত মৃত্যুর পরে খুব বিচলিত মনে গিয়ে হাজির হয়েছিলাম, মনে পড়ে। এঁদের কাছে গেলে কখনও মনে হয় না অসময়ে এসে পড়েছি, হয়তো ব্যস্ত ছিলেন । মুহূর্তে নিজের কাজ সরিয়ে রেখে দীর্ঘ সময় গল্প করেন, অথবা যে প্রশ্ন নিয়ে গেছি তা নিয়ে আলোচনা করেন। এই অনায়াস প্রাপ্তি যে আসলে কত দুর্লভ তা হয়তো ভেবেও দেখি না।

আর একটি মানুষের কথা মনে পড়ছে , প্রফুল্লকুমার দাস, তিনি আর নেই। তিনি আমার শিক্ষক। একটা সময়ের পরে খুব নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে পারি নি। যোগ্যতার অভাবে যা তিনি অনায়াসে দিতে পারতেন, নিতে পারি নি তাও। তবু বলব, এই সংগীতসাধক, রবীন্দ্রসংগীতগবেষক অসাধারণ মানুষটির পরিচয়লাভের সুযোগ পেয়ে সম্পন্ন হয়েছি।

আর যাঁর কথা না বললেই নয় তিনি অমিতা সেন, আমার অমিতাদি। দিদি বলি বটে, মায়ের মতোই তিনি। দীর্ঘদিনের পরিচয়ে বুঝি-বা বিনা অধিকারেই তাঁর মনের কোণে আমিও একটুখানি ঠাঁই পেয়ে গেছি। কাঁরণে-অকারণে কতবার থেকেছি তাঁর কাছে। কী আশ্চর্য সুগৃহিনী ছিলেন। অথচ গৃহের ছোট বৃত্তে কখনোই বাঁধা পড়েন নি। কি দেশে কি বিদেশে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কোনো বই বেরোলে প্রায় সকলের আগেই পড়ে ফেলতেন। নতুন-পুরোনো অন্য নানা বিদেশী বইয়ের খবর জেনেছি তাঁর কাছে। বরাবর অমিতাদির মতামতও খুব স্পষ্ট এবং নিজস্ব। শান্তিনিকেতনের সত্যযুগে তাঁর বাল্য এবং কৈশোর কেটেছে। তারই স্মৃতিজলে নিত্য অবগাহন করে মন তাঁর সরস শ্যামল হয়ে থাকত, অথচ বাস্তবের শান্তিনিকেতনের সঙ্গেও যোগ হারাতেন না বলে একালের ছাত্রছাত্রীদের কথাটাও দরদ দিয়ে বুঝতেন। এখন নব্বই-পেরোনো দেহটা একটু দুর্বল হয়েছে, মস্তিষ্ক তবু আগের মতোই সতেজ, মন যেন আরও বেশি স্মৃতিচারী।

অমিতাদির দিদি লাবুদির (মমতা দাশগুপ্ত) কথাও খুব মনে পড়ে। এমন একটি স্বাতন্ত্র্য ছিল মানুষটির। আর কী যে আশ্চর্য ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল দুই বোনে। আর মনে পড়ে নেপালচন্দ্র রায়ের পুত্রবধূ কালীপদ রায়ের স্ত্রী কমলাবৌমার কথা। প্রথম যে-বছর টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট শান্তিনিকেতনে পৌষমেলায় বইয়ের স্টল করে, কালীপদদা তাঁর নিজের বাড়িতে আমাদের থাকতে দিয়েছিলেন বলেই সেটা করা সম্ভব হয়েছিল। সে-কথা ভোলবার নয়। পরে একবার দেখেছিলাম বৌমা ভোরবেলা পূর্ব আকাশের দিকে চেয়ে হাত জোড় করে আপন মনে উচ্চারণ করছেন :

রাত্রি প্রভাতিল, উদিল রবিচ্ছবি পূর্ব-উদয়গিরিভালে —
গাহে বিহঙ্গম, পুণ্য সমীরণ নবজীবনরস ঢালে।

আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। নতুন দিনের প্রভাতকে অন্তরে বরণ করে নেবার মন্ত্র হয়ে উঠতে পারে গানের এই দুই পঙক্তি, এ-কথা ভাবি নি। দেখেছি লাবুদি অমিতাদি বৌমার 'গুরুদেব' রবীন্দ্রনাথই এঁদের ধর্ম, শান্তিনিকেতন আশ্রমের আদর্শই এঁদের ধর্ম। কখনও বা রবীন্দ্রনাথের দু-চার লাইন কবিতা বা গান, আর ওখানকার দিগন্তব্যাপ্ত প্রকৃতি, রাত্রের তারা ভরা আকাশ — এ-সবের বাইরে আর কোনো আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজন হয়নি ওঁদের।

জীবনটা তা বলে শুধু প্রাপ্তি নয়। 'কভু মধুর রসে ভরে হৃদয়খানি / কভু নিঠুর বাজে প্রিয় মুখের বাণী' — সকলকেই এরই মধ্যে দিয়ে চলতে হয়। 'মান্ধাতারই আমল থেকে চলে আসছে এমনি রকম' — আর পাঁচজনের মতো আমিও নানা সুখে-দুঃখে অনেক দূর পথ চলে এলাম।

হায় রে, সত্য কঠিন ভারী,
ইচ্ছামত গড়তে নারি —
স্বপ্ন সেও চলে আপন মতে।
আমি চলি আমার শূন্য পথে।।

প্রশ্ন। ক্ষিতিমোহন সেন সম্পর্কে আপনার আগ্রহের সূচনা কিভাবে হল? আচার্য ক্ষিতিমোহন-এর জীবনী লেখার ইচ্ছা বা প্রেরণা কি আপনার স্বতপ্রণোদিত, না বাইরের কোনও তাগিদ অথবা অনুরোধ ছিল? সেই লেখার কী আদর্শ আপনার মনে ছিল?

উত্তর। কোনোদিন ভাবিনি পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনের জীবনী লিখব। বিশ্বভারতী প্রকাশিত বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালায় তাঁর যে-বইগুলি আছে , দু একটি তার পড়েছিলাম - — *ভারতের সংস্কৃতি, হিন্দুধর্মের স্বরূপ*। সোমেনদার (সোমেন্দ্রনাথ বসু) কাছ থেকে উপহার পাওয়া গিয়েছিল *ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা*। দাদুও তাঁর দেওয়া প্রেসিডেন্সি কলেজের রেলিং থেকে কেনা প্রথম সংস্করণ। এর অনেক আগে থেকেই অবশ্য তাঁর মুখে রবীন্দ্রপরিকরদের জীবনীরচনার প্রয়োজনীয়তার কথা শুনতাম।

ক্ষিতিমোহন সেন সম্পর্কে যেটুকু জানা হয়েছিল সে কেবল নানা জনের শান্তিনিকেতন স্মৃতিকথার মাধ্যমে, সবারই যেমন জানা হয়। তারপর অমিতাদির সঙ্গে পরিচয় হতে কথাপ্রসঙ্গে তাঁর স্বনামধন্য পিতার কথা শোনা হল — পারিবারিক জীবনের এটা-ওটা, তাঁর

পরিব্রাজক মন, তাঁর সরল জীবনযাপন। ১৯৮১ সালে টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটে যখন তাঁর শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান হল, সেই দুদিন ব্যাপী শতবার্ষিকী উৎসবে চমৎকার আলোচনা শুনেছিলাম। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ভূদেব চৌধুরী, সোমেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ বক্তারা ছিলেন। কিন্তু এ-সব কোনো সূত্রেই আমি নিজে হতে ক্ষিতিমোহন সেনের জীবনী রচনায় অনুপ্রাণিত হইনি।

এ কাজের দায়িত্ব আমাকে দেন পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি ১৯৯২ সালে। বেশ অনেকদিন থেকেই এই সংস্থা থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে বঙ্গদেশের কৃতী সারস্বত সন্তানদের জীবনী প্রকাশিত হচ্ছে। এটিও সেই প্রকল্পাধীনে প্রকাশিত হবার কথা। কিন্তু আমি প্রথম থেকেই যথাসম্ভব বিস্তারিত তথ্যসংগ্রহের দিকে ঝুঁকেছিলাম। জীবনীগ্রন্থও সেইমতোই রচিত হয়েছে। আমি কৃতজ্ঞ যে তা সত্ত্বেও আকাদেমি বই প্রকাশ করেছেন। প্রেরণার কথা যদি বলতে হয়, বাইরের প্রেরণা এসেছিল বাংলা আকাদেমির কাছ থেকে। আর ভিতরের প্রেরণা জুগিয়েছেন স্বয়ং ক্ষিতিমোহন। যতটুকু প্রবেশ করতে পেরেছি তাঁর জীবনের মধ্যে, যতটুকু দেখতে পেয়েছি জ্ঞানের আলোকে উজ্জ্বল, মানবিক অনুভবে স্নিগ্ধ-গভীর, গাম্ভীর্যে-রসবোধে আদর্শে-বাস্তববোধে মিশ্রিত তাঁর ঋদ্ধ ব্যক্তিত্ব, ততই আমি ধরা দিয়েছি তাঁর টানে।

এই লেখার কি আদর্শ আমার মনে ছিল, এই প্রশ্নের উত্তরে বলব এটি তথ্যের ভারবাহী মাত্র না হয় এই চেষ্টা ছিল আমার, একটি সুখপাঠ্য জীবনী রচনা করতে চেয়েছিলাম। যাঁর জীবনী তাঁর উপর নানা দিক থেকে আলো পড়বে। সেই আলোয় তাঁকে দেখে পাঠকরা যে যার মতো বিচার করে তাঁকে গ্রহণ করবেন। জীবনীকারের মতামত বা অহেতুক মন্তব্য ও টিপ্পনি পাঠকের স্বচ্ছন্দ পাঠকে বিঘ্নিত করবে না, এটাই আমার ভালো মনে হয়।

প্রস্তুতিপর্বে কয়েকটি জীবনীগ্রন্থ নাড়াচাড়া করে দেখেছিলাম। নীরদচন্দ্র চৌধুরীর ম্যাক্সমূলর-জীবনী *Scholar Extraordinary*-র কথা মনে পড়ছে। এই বিশিষ্ট এবং বিতর্কিত লেখকের সব বই পড়ি নি, যা পড়েছি তাও অনেক সময় নির্দ্বিধায় গ্রহণ করতে পারি নি। কিন্তু এই জীবনীটি আমার খুব ভালো লেগেছিল। নীরদচন্দ্রের বৈদগ্ধ্যের ছিটেফোঁটাও আমার নেই। তাছাড়া স্বভাবের নিয়মেই দুজন মানুষের গ্রন্থপরিকল্পনা ভিন্ন হতে বাধ্য। যে দুই ব্যক্তির জীবন নিয়ে কথা তাঁরাও তো আর অভিন্ন নন। সুতরাং পরিকল্পনার মিল সে-ভাবে খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু আমি ক্ষিতিমোহন সেনের মৃত্যুসংবাদ দিয়ে যে জীবনকথা শুরু করেছিলাম, সেখানে নীরদচন্দ্রের ম্যাক্সমূলর-জীবনীর রীতি অনুসরণের চিহ্ন আছে।

প্রশ্ন। উইলিয়ম উইনস্ট্যানলি পিয়র্সন এবং আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন — এই দুই মনীষীরই জীবনীগ্রন্থ আপনি রচনা করেছেন। দুটি রচনার মধ্যে বাহ্যিক, গুণগত বা পদ্ধতিগত কোনও পার্থক্য আছে কি? থাকলে তা যদি আমাদের বুঝিয়ে বলেন।

উত্তর। উইলিয়ম উইনস্ট্যানলি পিয়র্সন এবং ক্ষিতিমোহন সেন দুটি জীবনীর গুণগত পদ্ধতিগত মিল-অমিলের বিচারে আমি যেতে চাই না। জীবনী ছেড়ে জীবন দুটির দিকে তাকাতেই আমার ভালো লাগবে। দুজনে এক বয়সী বলতে গেলে। ক্ষিতিমোহন সেনের জন্ম

২ ডিসেম্বর ১৮৮০। পরের বছর ৭ মে জন্ম পিয়র্সনের। ১৯০৮ সালে রবীন্দ্রনাথ সনির্বন্ধে আহ্বান করে এনেছিলেন ক্ষিতিমোহনকে। সেই থেকে অর্ধশতাব্দীর বেশি একটানা শান্তিনিকেতনে কেটেছে তাঁর। তাঁর রচনা সংকলনের প্রথম খণ্ড *সাধক ও সাধনা*-র ভূমিকায় আবার তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছিলাম, 'সত্যই যেন ক্ষিতিমোহনের জীবনধারা নদীর মতো প্রবাহিত হয়ে গেছে শান্তিনিকেতনের উপর দিয়ে দীর্ঘ বাহান্ন বছর ধরে। রাবীন্দ্রিক শান্তিনিকেতনে বাস করে প্রাণরসধারার নিত্য বর্ষণে নিজে সঞ্জীবিত হয়েছেন যেমন, তেমনই সতত আপন প্রাণরসে নিত্য প্লাবিত ও উজ্জীবিত করেছেন শান্তিনিকেতনকে। শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতীকে কেন্দ্র করে তাঁর পাণ্ডিত্যের অধ্যাপনার বাগ্মিতার এবং হৃদয়গ্রাহী আলাপচারিতার খ্যাতি ছড়িয়েছিল বহুদূর।' রবীন্দ্রোত্তর শান্তিনিকেতনের আনুষ্ঠানিক আচার্য তিনি কোনোদিন ছিলেন না, 'কিন্তু শান্তিনিকেতন আশ্রমের প্রাত্যহিক জীবনে আচার্যের আসনে বাস্তবিক যাঁর অবিচলিত অধিষ্ঠান সবার মনেই স্বতঃগ্রাহ্য, তিনি ক্ষিতিমোহন সেন। খুব কম দিন নয়, রবীন্দ্র তিরোধানের পর থেকে তাঁর জীবনাবসান পর্যন্ত প্রায় বিশ বছর।'

জাতিতে ব্রিটিশ পিয়র্সন এক ভারতপ্রেমিক। জাত্যভিমানের বালাই ছিল না তাঁর। ১৯১২ সালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় হতে এণ্ডরুজের মতোই রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের টানে এখানে এসেছিলেন। ভালোবেসেছিলেন। শান্তিনিকেতনের ছেলেদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা কিংবদন্তী হয়ে আছে। দূর বিদেশে দুর্ঘটনায় আহত পিয়র্সন আসন্ন মৃত্যুর মুখে অর্ধচেতনে উচ্চারণ করেছেন, 'my one only love – India'। শান্তিনিকেতনেই তাঁর স্বভূমি জেনেছিলেন পিয়র্সন, কিন্তু একটানা এখানে তাঁর থাকা হয় নি। কখনও এণ্ডরুজের কাজের সঙ্গী হয়ে বিদেশে গেছেন, কখনও রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণসঙ্গী হয়ে তাঁর একান্ত সচিবের দায়িত্ব নিয়েছেন। বীরভূমের প্রখর গ্রীষ্মে স্বাস্থ্যও বড় রকমের সমস্যায় ফেলত। আবার ১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জাপানে গিয়ে ফেরার সময় একা সেখানে থেকে গিয়ে ভারতের হোমরুল আন্দোলন সমর্থন করে For India নামে বই লিখলেন। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করে ইংলণ্ডে পাঠিয়ে দিল। ম্যাঞ্চেস্টার শহরে স্বগৃহে অন্তরীণ হয়ে রইলেন। পাঁচ বছর পরে যদি বা তাঁর স্বপ্নের শান্তিনিকেতনে ফেরা হল, স্বাস্থ্যের কারণে আবার ফিরে গেলেন। শেষে সুস্থ হয়ে যখন ফেরার কথা ভাবছেন, মৃত্যু তাঁকে হঠাৎ ডেকে নিল অন্য এক শান্তিনিকেতনে। তখন তাঁর বয়স মাত্র বিয়াল্লিশ।

তাই ক্ষিতিমোহন যদি অটল বনস্পতি, পিয়র্সন তবে ফুটে-না-উঠতেই ঝরে পড়া একটি ফুল। ক্ষিতিমোহন যদি বিশাল মহানদ, একূল-ওকূল দেখা যায় না, পিয়র্সন তবে মরুপথে গতি হারানো ক্ষীণস্রোতা জলধারা। 'জীবনে যত পূজা' পিয়র্সনের বড় প্রিয় গান। ক্ষিতিমোহনের প্রিয় গানের সংবাদ নিতে গেলে কথার পিঠে কথা বেড়েই চলবে। দুটি জীবনের পার্থক্যের খতিয়ান নিতে গেলেও তথৈবচ। আর মিলের হিসাবে শান্তিনিকেতনের পথে তাঁরা সহযাত্রী, সহযোগী, সতীর্থ। সেই প্রেক্ষাপটে পিয়র্সনের বিয়াল্লিশ বছর বয়সে মৃত্যুই কেবল শোকাবহ নয়, ক্ষিতিমোহনের আশি বছর বয়সে মৃত্যুও তাই, সেও

অকালমৃত্যু। শান্তিনিকেতনের ভাবসত্যের রূপায়ণে যাঁরা ব্রতী হয়েছিলেন, তাঁদের অন্যতম এই দুটি মানুষের জীবন-কথা বলতে আমার 'লাগল ভালো, মন ভোলালো, সেই কথাটাই গেয়ে বেড়াই —'।

প্রশ্ন। রবীন্দ্রচর্চায় আপনার আগ্রহের সূচনা কিভাবে, প্রেরণা কে বা কি?

উত্তর। এই বঙ্গদেশে জন্মেছি। এখানকার আকাশ-আলো-মাটি-বাতাস-জলের অধিকার যেমন আমার, রবীন্দ্রনাথের অধিকারও তাই। এটা অবশ্য বলা যায় যে আমার ঘরের জানলাটা বড্ড ছোট, আলো-বাতাসের প্রবেশ তেমন অবাধ নয়। সে আর কি করা যাবে। আলো-বাতাসই হোক আর রবীন্দ্রনাথই হোক, যে যেমন অধিকারী সে তেমনই পাবে। আমার পাত্রখানা বড় নয়, কিন্তু সে ভেঙে-চুরে গেলেই বা কি। বলতে তো পারি 'আছে অঞ্জলি মোর প্রসাদ দিয়ে দাও না পুরে।' সহজ সুখের সুধাটুকু তো পেলাম। আর পাওয়া মানে — একেবারে মাতৃভাষায় পাওয়া। সেই ১৯১২ সালে লণ্ডনে সংবর্ধনার উত্তরে বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ : 'আপনাদের এই গৌরবান্বিত ভাষায় যদিও আমার সামান্য জ্ঞান আছে — তথাপি আমি কেবল আমার নিজের ভাষাতেই ভাবিতে পারি এবং অনুভব করিতে পারি। আমার বাংলাভাষা অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণা গৃহিনীর ন্যায় বরাবর আমার সমস্ত সেবা দাবি করিয়া আসিয়াছেন এবং তাঁর রাজ্যে আর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষের অনধিকার প্রবেশকে তিনি প্রশ্রয়মাত্র দেন নাই।'

এতবড় কথাটা যেন ভুলেই থাকি যে রবীন্দ্রনাথের সেই পরম মমতার ভাষাই আমারও ভাষা। ওই ভাষণের এক যুগ পরে এক ইংরেজি প্রবন্ধে বিদেশী শ্রোতার কাছে নিজের রচনার দৃষ্টান্ত মূল বাংলায় দিতে না পেরে বলেছিলেন,

> I wish I could reveal it more clearly through the narration of my own word in my own language. I hope that will be possible some day or other. Languages are jealous. They do not give up their best treasures to those who try to deal with them through the intermediary belonging to an alien rival

রবীন্দ্রনাথের আশা যে একেবারে সফল হয় নি তা নয়। তাঁর কবিতা পাঠের আগ্রহে কোনো কোনো বিদেশী তাঁর ভাষা শিখেছেন। তেমন কারও কারও নাম আমরা জানি। গ্রিয়ার্সন বাংলা জানতেন। সাম্প্রতিক কালে কবি উইলিয়ম রাদিচে মূল বাংলা থেকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন। এই সেদিন *রবীন্দ্রভাবনা-য়* স্পেনের ভিগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হোসে পাস রোদরিগেস নামে এক রবীন্দ্রানুরাগীর কথা পড়লাম। তিনি নিজের চেষ্টায় এবং ব্যয়ে বিশ্বের প্রায় সব ভাষায় অনূদিত রবীন্দ্রগ্রন্থের সংগ্রহাগার গড়ে তুলেছেন। এখন তিনি কলকাতায়। শিখছেন বাংলা এবং রবীন্দ্রসংগীত। রুশ রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ অধ্যাপক দানিল-চুকের কথা অনেকেরই মনে পড়বে। রবীন্দ্রনাথ ও সোভিয়েট রাশিয়ায় তাঁর স্থান সম্পর্কে তাঁর বৃহৎ গ্রন্থ যথেষ্ট স্বীকৃতি পেয়েছে। পরিষ্কার বাংলা বলেন এই অধ্যাপক।

আমাকে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পড়তে ভিন্ন ভাষাও শিখতে হয় নি, অনুবাদের আশ্রয়ও

খুঁজতে হয় নি। এ সৌভাগ্যের তুলনা নেই, আর সেইভাবে দেখতে গেলে তার সূচনা প্রেরণা আয়োজন কিছুই নেই। সেই অনায়াস অধিকারকে অনুশীলন-পরিশীলনে মেজে-ঘষে নেবার ইচ্ছায় আরও অনেকের মতো গিয়েছিলাম টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটে। আনন্দ পেয়েছি। সোমেন্দ্রনাথ বসুর মতো শিক্ষক পেয়েছিলাম। পাঠক্রমের সিংহভাগ তাঁর কাছেই পড়েছিলাম। শান্তিকুমার দাশগুপ্ত, ভূদেব চৌধুরী, ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী, দেবদাস জোয়ারদার, ঋষিকুমার চক্রবর্তী — এঁদের কাছেও পড়েছি। বয়সের বিচারে দেবদাসদা সামান্যই বড় আমার চেয়ে, ঋষি একেবারে সমসাময়িক। শিক্ষক-ছাত্রীর ব্যবধান ঘুচতে দেরি হয় নি।

রবীন্দ্র-সংশ্লিষ্ট নানা বিষয়ে সোমেন্দ্রনাথ তথ্যানুসন্ধানে উৎসাহ দিতেন সকলকে। আমাকে তিনি পিয়র্সন-জীবনী লেখার কাজ দিয়েছিলেন। দিল্লীর ন্যাশানাল আর্কাইভস্ থেকে তিনি পিয়র্সন-সম্পর্কিত পুলিশ-ফাইল সংগ্রহ করে এনেছিলেন। আমাকে দিয়ে বলেছিলেন পিয়র্সনের জীবনী লিখতে হবে। এর আগেও তিনি আমাকে দিয়ে কিছু কাজ করিয়েছিলেন। কিন্তু পিয়র্সন-জীবনীর পরেও যে-সব কাজ দিয়েছিলেন, সে আমি সব করতে পারি নি। তবে যেটুকু যা কাজ করেছি, তার মূলে সোমেন্দ্রনাথ বসুর একটি স্থায়ী প্রেরণা কাজ করেছে।

বলা বাহুল্য যে রবীন্দ্রচর্চা শব্দটা বহু ব্যাপক অর্থ বহন করে। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর পরিমণ্ডল এবং তারই সঙ্গে সংলগ্ন আরও বহুবিধ বিষয়ে অনুসন্ধান ও গবেষণা তার একটি ক্ষুদ্র অংশমাত্র। রবীন্দ্রচর্চার সঙ্গে রবীন্দ্রজীবনবোধের যোগ নিবিড়। এক সময় রবীন্দ্রচর্চা ও রবীন্দ্রচর্যা নিয়ে অনেক আলোচনা শুনেছি। কিন্তু অনেক সময় আশংকা হয়, এ শব্দ বহু ব্যবহারে মলিন হয়ে গেছে, অর্থগৌরব হারিয়েছে। যা অন্তরে অনুভব ও উপলব্ধির সামগ্রী বিজ্ঞাপনের বিষয় হতে হতে তার আলো নিভে আসে। অনেক বাড়ি অফিস বা প্রতিষ্ঠানে বড় বড় হরফে লেখা সব মহাপুরুষের বাণী দেওয়ালের শোভাবর্ধন করে থাকে। মস্ত পদাধিকারীর টেবিলের ঝক্‌ঝকে কাঁচের নীচে সুরক্ষিত থাকে। কিন্তু সে তো কবরের শীতল সুরক্ষা। 'রয়েছে দীপ না আছে শিখা এই কি ভালে ছিল রে লিখা' — রবীন্দ্রচর্চাই হোক, রবীন্দ্রবাণীই হোক, সে যদি কেবল মুখের কথামাত্র হয়ে থাকে, সে তো বৃথাই। লিখন যদি মর্মে প্রবেশ না করল তবে আর লিখে রেখে লাভ কি। কি লাভ যদি শুধুই রবীন্দ্রচর্চার নামাবলী গায়ে জড়াই, এবেলা-ওবেলা তার নক্‌সা পাল্‌টাই। সন্ত কবীর তাই বলেছেন 'মন ন রঙ্গায়ে রঙ্গায়ে জোগী কাপড়া'। আর সন্ত দাদূ বলছেন :

খংড খংড করি ব্রহ্মকৌ পখি পখি লিয়া বাঁটি।
দাদূ পূরণ ব্রহ্ম ত্যজি বংধে ভরম কী গাঁঠি।

চারপাশে চেয়ে এক এক সময় মনে হয় রবীন্দ্রনাথকেও তো আমরা এপক্ষে-ওপক্ষে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিয়েছি, নিচ্ছি নিত্যই। ভ্রমের গাঁঠরি ভারীই হয়ে উঠছে দিনে দিনে। বিভেদের অন্ত নেই, কোলাহলের বিরাম নেই।

তোমার কথা হেথা কেহ তো বলে না করে শুধু মিছে কোলাহল।
সুধাসাগরের তীরেতে বসিয়া পান করে শুধু হলাহল।

প্রশ্ন। আজকের যুগে রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রচর্চা কতটা প্রাসঙ্গিক?

উত্তর। আজকের যুগে রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রচর্চার প্রাসঙ্গিকতার প্রশ্নে সব প্রথমে একটা কথা বলি। 'আজকের যুগ' কোনো সুনির্দিষ্ট সীমায় বাঁধা কালখণ্ড নয়। নিয়তই আজ চলে যাচ্ছে গতকালের গহ্বরে, আগামীকাল এসে আসন বিছিয়ে বসছে আজকের দরবারে। সম্ভবত অনেকেরই মনে পড়বে ১৯৮৬ তে যখন যথাযোগ্য আন্তরিকতা ও সমারোহে রবীন্দ্রনাথের একশ পঁচিশতম জন্মোৎসব পালিত হল, তার ঠিক আগের ক'বছরে এই প্রশ্নটা নিয়ে যথেষ্ট সরব আলোচনা শোনা গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এ প্রশ্ন বার বারই আমাদের মনে দেখা দেয়, ভবিষ্যতেও দেবে। এটা স্বাভাবিক।

প্রাসঙ্গিকতার প্রশ্নে আমারও মনে একটা প্রশ্ন ওঠে, রবীন্দ্রনাথ কার পক্ষে প্রাসঙ্গিক। সব যুগের মতোই আজকের যুগের মানুষেরও ভিন্ন ভিন্ন রুচি ইচ্ছা প্রয়োজন তাগিদ। সমস্ত বা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ভাবিত প্রভাবিত আচ্ছাদিত আন্দোলিত হবেন, এমন কখনও হতে পারে না। তাঁকে বুঝতে গেলে, তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতে গেলে কিছুটা শিক্ষা এবং চর্চারও প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন আছে মনোযোগের। এদেশে জন্মেছে বলেই কেউ তাঁকে ভক্তিতে ভয়ে প্রথাবদ্ধতায় বা অন্ধতায় গ্রহণ করবে, রবীন্দ্রনাথ নিজে তো এরকমটা কখনই চাইতেন না। তিনি তো দেখি বলছেন :

> আমরা কবিরা কেবল সাধকদের জন্যে লিখি নে, বিশেষ রসের রসিকদের জন্যেও না। আমরা লিখি রূপদ্রষ্টার জন্যে — তিনি বিচার করেন সৃষ্টির দিক থেকে — যাচাই করে দেখেন রূপের আবির্ভাব হলো কিনা। আমার রূপকার বিধাতা সেইজন্যে আমাকে নানা রসের নানা ভাবের নানা উপলব্ধির মধ্যে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ান - ....আমি কবিতা লিখি, গান লিখি, গল্প লিখি, নাট্যমঞ্চে অভিনয় করি, নাচি নাচাই, ছবি আঁকি, হাসি, হাসাই, একান্তে কোনো একটিমাত্র আসনেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে বসবার উপায় রাখিনে। যারা আমাকে ভক্তি করতে চায় তাদের পদে পদে খটকা লাগে। ..... তুমি আমার লেখা পড়তে চেয়েচ পোড়ো — কিন্তু কবির লেখা বলেই পোড়ো।

আর এ কথাটাও তো তিনি কবেই বলে রেখেছেন তাঁর গান তারই জন্যে যে তাকে সম্মান দিতে পারে, যোগ্য সমাদর করতে পারে। কবি বলেন,

> তুমি কি শুনেছ মোর বাণী,
> হৃদয়ে নিয়েছ তারে টানি?
> জানি না তোমার নাম,
> তোমারেই সঁপিলাম
> আমার ধ্যানের ধনখানি।।

সুতরাং মন বলে, তাঁকে পেতে গেলে আমাদেরই সজাগ হতে হবে, দিতে হবে হৃদয় পেতে। শ্রবণযন্ত্র উৎকর্ণ না হলে তো তাঁর বাণী শোনা যাবে না। 'যখন অন্ধ নয়ন শ্রবণ কালা', যখন চিত্ত অচেতন, তখন তিনি অপ্রাসঙ্গিক।

রবীন্দ্রনাথের যুগ তাঁকে গ্রহণের জন্য প্রস্তুত ছিল না, কোনোদিনই সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে উঠতে পারে নি। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন, *সন্ধ্যাসংগীত* প্রকাশিত হলে নিজহাতে ফুলের মালা

পরিয়ে বরণ করেছিলেন তাঁকে। প্রবীণ চন্দ্রনাথ বসু *ক্ষণিকা* পেয়ে রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন :

> তোমার সহিত পথ চলিবার সামর্থ্য আমার নাই। তোমার গতি এতই দ্রুত এতই বিদ্যুৎবৎ! তোমার প্রতিভার পরিমাণ নাই— উহার বৈচিত্র্যও যেমন প্রভাও তেমনি। আমি তোমার প্রতিভার নিকট অভিভূত। *কণিকা কথা কল্পনা ক্ষণিকা* — বলিতে গেলে চারিমাসের মধ্যে চারিখানা — পারিয়া উঠিব কেন? প্রকৃতপক্ষেই পারি নাই। *কণিকা ছাড়িতে না ছাড়িতে কথা আসিল, — কথা দিয়া তুমি আমার হাত হইতে কণিকা কাড়িয়া লইলে* — কণিকার ভোগও আমাকে পূর্ণ করিতে দিলে না। এমনি করিয়া *কল্পনা দিয়া কথা কাড়িয়া লইয়াছিলে* — আমার ভোগে আবার বাধা দিয়াছিলে। এবার *ক্ষণিকায়* চমকিত করিয়াছ। আবার ভোগে বিবাদী হইয়াছ। আমি ক্ষুদ্র — সুতরাং আমার গতি বড় ধীর — আমি তোমার সঙ্গে পারিয়া উঠিতেছি না। পিছাইয়া পড়িতেছি — কিন্তু তোমার গতি দেখিয়া চমৎকৃত হইতেছি — ......

তবে এগুলি অনেকাংশেই ব্যতিক্রমী। জীবনের স্বাভাবিক নিয়মেই রবীন্দ্রনাথ দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত এবং বঙ্গভাষা ও সাহিত্যপ্রেমী মানুষের কাছে বা পত্রপত্রিকায় অপ্রাসঙ্গিক হয়ে থেকেছেন। তীব্র সমালোচনা ও ব্যঙ্গের শরে নিত্য বিদ্ধ হয়েছেন। যুগের পর যুগ পার হয়েছে। এক সমালোচকের কাল শেষ হয়েছে, সমালোচনার ধারা অব্যাহত থেকেছে। জীবনের শেষ দশকেও এ ধারা কোথাও কোথাও বেগবান দেখতে পাই। তার কারণ তাঁরা তাঁকে বোঝেন নি, বোঝেন নি নিজেদের গ্রহণের অক্ষমতাকে, প্রস্তুতির অভাবকে।

প্রথম দিককার সমালোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন : 'আপনার মধ্যে থেকে যা প্রকাশ পাচ্ছিল, সে আমার কাছেও ছিল নূতন এবং আন্তরিক।'

ছিন্নপত্র-এর একটি চিঠিতে (৩০ আষাঢ় ১৩০০) *সোনার তরী*-র অনাদৃত কবিতাটির ব্যাখ্যা করেছিলেন। তার শেষটায় আছে :

> বোধ হচ্ছে এই কবিতাটি যিনি লিখেছেন, তিনি মনে করছেন তাঁর গৃহকার্যনিরতা অন্তঃপুরবাসিনী জন্মভূমি, তাঁর সমসাময়িক পাঠকমণ্ডলী তাঁর কবিতাগুলির ঠিক ভাবগ্রহ করতে পারবে না; তার যে কতখানি মূল্য তা তাদের জ্ঞানগোচর নয়; অতএব, এখনকার মতো এ-সমস্ত পথেই ফেলে দেওয়া যাচ্ছে — তোমরাও অবহেলা করো, আমিও অবহেলা করি, কিন্তু এ রাত্রি যখন পোহাবে তখন 'পস্টারিটি' এসে এগুলি কুড়িয়ে নিয়ে দেশে বিদেশে চলে যাবে। কিন্তু তাতে ঐ জেলে লোকটার মনের আক্ষেপ কি মিটবে? যাইহোক, 'পস্টারিটি' যে অভিসারিণী রমণীর মতো দীর্ঘ রাত্রি ধরে ধীরে ধীরে কবির দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং হয়তো নিশিশেষে এসে উপস্থিত হতেও পারে, এ সুখকল্পনাটুকু কবিকে ভোগ করতে দিতে কারও বোধহয় আপত্তি না হতেও পারে।

কবির এই সুখকল্পনা যে বিফল হয়নি তার দীর্ঘ ইতিহাস আজ আমাদের জানা। তাঁর জীবিতকালেই দেশে-বিদেশে স্বীকৃতি সম্মান শ্রদ্ধা সংবর্ধনা তিনি অজস্র পেয়েছেন, তার উল্লেখের প্রয়োজন নেই। কিন্তু ব্যক্তি মানুষের জীবনে ও মনে তাঁর প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠার ইতিবৃত্ত সংকলিত হলে, তার আয়তন কোনো সীমার বাঁধন মানবে না। আমি এখানে শুধু সে-সবের মধ্যে থেকে একটি বরং আপাততুচ্ছ দৃষ্টান্ত বেছে নিচ্ছি। *নৈবেদ্য* প্রকাশের অনেক

দিন পরে, জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রনাথের কাছে এক দর্শনার্থী এসেছেন। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তখন উপস্থিত সেখানে। তিনি লিখেছেন,

কবি তাঁকে আসতে অনুমতি দিলেন।

যিনি এলেন, দেখলাম তিনি বৃদ্ধ ও অন্ধ, অপর একজন তাঁর হাত ধরে নিয়ে আসছে। তিনি এসে জিজ্ঞাসা করলেন — 'আমি কি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মশায়ের কাছে এসেছি?'

কবি বললেন — 'হ্যাঁ, আমি রবীন্দ্রনাথ'।

বৃদ্ধ ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে বললেন —'আমি অন্ধ, আমার এক মেয়ে সম্প্রতি বিধবা হয়েছে। কিন্তু বিধবা হয়ে সে কয়েকদিন কান্নাকাটি করে হঠাৎ চুপ করে গেল। আমার কৌতূহল হলো জানতে যে তার কি হলো যে হঠাৎ কান্না বন্ধ হয়ে গেল। তাকে ডেকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম। সে বল্লে — আমি রবিবাবুর *নৈবেদ্য* বই পড়ে তা থেকে পরম সান্ত্বনা পেয়েছি, আর আমার শোক দুঃখ কিছু নেই। আমি তাকে বললাম — দারুণ শোক তাপ দূর হয়ে যায় এমন যে বই তুমি পেয়েছ, তা আমাকেও প'ড়ে শোনাও। মেয়ে আমাকে সে বই পড়ে পড়ে শোনালে। আমি তা শুনে মুগ্ধ হয়ে গেছি, আর বড় সান্ত্বনা লাভ করেছি। এই কথাটি বলে আপনাকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যাবার জন্য আমি কলকাতায় এসেছি।'

এই কথা বলে অন্ধ আবার কবিগুরুকে প্রণাম করে ধীরে ধীরে চলে গেলেন।

একটু দুঃখ হয় এ-কথা শুনে রবীন্দ্রনাথ কি প্রতিক্রিয়া জানালেন, তা জানা যায় না বলে। মন প্রশ্ন করে আনন্দময়ী উচ্ছলা কিশোরী কি শোকবিধুরা বিধবা, কিংবা গৃহকোণে ব্যস্ত কল্যাণী বধূ — যে মূর্তিতেই হোক না কেন, তাঁর দেশের এই-সব অতি সাধারণ মেয়েরাই কি কবির অজানিতে রূপ নিল তাঁর পাঠিকা-য়, কথা বলল তার নিজের জবানিতে?

বহিছে হাওয়া উতল বেগে,
আকাশ ঢাকা সজল মেঘে,
ধ্বনিয়া উঠে কেকা।
করি নি কাজ পরি নি বেশ
গিয়েছে বেলা বাঁধি নি কেশ,
পড়ি তোমারই লেখা।

ওগো আমারই কবি,
তোমারে আমি জানি নে কভু,
তোমার বাণী আঁকিছে তবু
অলস মনে অজানা তব ছবি।
বাদলছায়া হায় গো মরি
বেদনা দিয়ে তুলেছ ভরি,
নয়ন মম করিছে ছলোছলো।
হিয়ার মাঝে কী কথা তুমি বল!

সশস্ত্র লড়াই ও ব্যক্তিহত্যার পথে দেশের পরাধীনতার বন্ধন ছিন্ন করার সংকল্প কোনোদিন সমর্থন পায় নি রবীন্দ্রনাথের। প্রথম থেকেই তিনি এর বিরোধী। অথচ যেমন *গীতা*, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী, বঙ্কিমচন্দ্রের *আনন্দমঠ* এই-সব জীবন-পণ-রাখা দুর্দান্ত বিপ্লবী তরুণদের সাহস ও প্রেরণা দিয়েছে, তেমনই দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁদের হৃদয়ের মধ্যে বসে কথা বলেছেন তিনি। শোনা যায় বিপ্লবী উল্লাসকর দত্ত বিচার চলা-কালে অথবা হয়তো রায় ঘোষণার দিন বিচারকক্ষে দাঁড়িয়ে গলা ছেড়ে গান গেয়েছিলেন 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে'। আবার দেখা গেল স্বাধীন ভারতে বা তার আগে থেকেই কোনো কোনো বিপ্লবী রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পিত গ্রামসেবার কাজে সবার চোখের আড়ালে আত্মমগ্ন হয়ে রইলেন আজীবন। 'উদয়ের পথে শুনি কার বাণী ভয় নাই ওরে ভয় নাই/ নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই' কেন তাঁদের অনুপ্রাণিত করেছে সেটা বোঝা যায়। কিন্তু অন্য ধরনের কবিতা বা গান যে কত বিপ্লবীর কাছে বিশেষ অর্থবহ হয়ে উঠেছে সে-কথা জেনে অবাক হই। দীনেশ গুপ্ত যেমন ফাঁসির আগে লেখা একটি চিঠিতে 'আমার দিন ফুরালো ব্যাকুল বাদল সাঁঝে' গানটি স্মরণ করেছিলেন। লিখেছিলেন 'কিছুদিন আগে একটি গান শুনেছিলাম। আজ তার পদগুলো বারে বারে মনে পড়ছে—'। অনেক সময় কবির সৃষ্টির প্রাসঙ্গিকতা কবির অভিপ্রায়কে বহুদূর ছাড়িয়ে যায়। একই কথা মনে হবে বিদেশের কথা ভাবলে, কত ঘটনার বিবরণ আমরা পেয়েছি, কত ব্যক্তির জীবনের কথা জেনেছি, রবীন্দ্রনাথ যেখানে আশ্চর্যজনকভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছেন। ১৯২০র বড়দিনের সময় হেলেন কেলারের বাড়িতে তিনি তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। কবি *Gitanjali* ও *Gardener* থেকে হেলেনের প্রিয় কয়েকটি কবিতা পড়লেন, বাংলায় পড়লেন 'খাঁচার পাখি ছিল'। গান গাইলেন 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে'। কবির ঠোঁটে ও কণ্ঠে আঙুল রেখে সেই পাঠ ও গান অনুভব করলেন হেলেন। কবিকে উপহার দিলেন নিজের লেখা বই *The World I live in*, তাতে লিখলেন — 'কক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার সে কথা যে যাই পাসরি'। রবীন্দ্রভবনে সে বই আছে, তার উপহারপত্রে লেখা :

To Rabindranath Tagore
Yes, Master, I Forget,
I ever Forget that the Gates are
shut everywhere in the house
where I dwell alone!

Helen Keller

একটা খবর জেনে আশ্চর্য হয়ে গেছি। ব্রিটিশ রাজনীতিক ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচারের স্বামী সম্প্রতি ইহজীবন সমাপ্ত করেছেন। তিনি মৃত্যুর আগে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, তাঁর সমাধিকালে তাঁদের পুত্র যেন *Farewell my Friend*-এর শেষ কবিতাটি পাঠ করেন। তাঁর ইচ্ছা পালিত হয়েছে। ১৯৫৬ সালে *শেষের কবিতা*-র অনুবাদ করেন কৃষ্ণ কৃপালনী, সেই অনুবাদের নাম *Farewell my Friend*। তার শেষ কবিতা সবারই চেনা —'কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও তারই রথ নিত্যই উধাও'।

সুতরাং রবীন্দ্রনাথ যে কখন কার জন্য কতটা প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠবেন তা বলা যায় না। তাঁর গান তো সর্বদাই তার সীমানা পেরিয়ে যাচ্ছে। সিনেমা-টিনেমায় জায়গা মতো প্রয়োগের তাগিদে অর্থসংকোচও ঘটানো হয় বিস্তর। আবার ব্যক্তিজীবনের ছোট বৃত্তেও বিশেষ এক-একটি ক্ষণে সে আশ্চর্য দ্যুতিময় হয়ে উঠতে পারে। আমার পনেরো বছরের রাঙাদি তার বিয়ের বাসরে গেয়েছিল 'আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে'। আগের ফাল্গুনে দাদা চলে গেছে, বৈশাখে বাবা। শ্রাবণ মাসের দশ তারিখে ওর বিয়ে হল। সেদিন পূর্ণিমা ছিল না, তার কাছাকাছি কোনো তিথি ছিল। পরে বহুবার আমি সবিস্ময়ে ভেবেছি এ গানের প্রতিটি পঙক্তি কী আশ্চর্য প্রাসঙ্গিক ছিল সেদিন ওর জীবনে।

এ-সব কথার শেষ নেই। এ-কথাটাও পুনর্বার স্বীকারে কোনো দ্বিধা নেই যে রবীন্দ্রনাথ কোনোদিন সর্বার্থে সর্বজনের পক্ষে সদা-প্রাসঙ্গিক ছিলেন না, এখনও নন। কোনো কালেই কোনো বড় কবি বা মনীষী সেই অর্থে প্রাসঙ্গিক থাকেন না। যুগ তাঁকে তার নিজের গরজে ফিরে ফিরে আবিষ্কার করে। এ যুগের তাঁকে প্রয়োজন আছে কিনা সেটা তাকেই বুঝতে হবে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেমন তাঁকে জমি প্রস্তুত করতে হয়েছে, নিজের হাতে কাটা পথ অতিক্রম করে আবার নতুনতর পথ কাটতে হয়েছে, সেখানে যেমন তিনি একা, দেশ-গঠনের প্রশ্নে, স্বাধীনতা আন্দোলনের পথনির্ধারণের প্রশ্নেও তিনি চিরদিন একা। কোনো প্রলোভনেই কোনো যুক্তিহীন অন্ধ বিশ্বাসের কাছে নতিস্বীকার করা সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে। যা বিশ্বাস করেছেন, বিচারবুদ্ধি প্রয়োগে যে সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন, সেই রাস্তাতেই চলেছেন। কোনো সম্প্রদায়ের রঙ তাঁকে স্পর্শ করেনি, তাঁর বিবেক কথা বলেছে তাঁর কণ্ঠে। সাম্রাজ্যবাদ, সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ, দুর্বলের প্রতি ক্ষমতাদর্পী প্রবলের অত্যাচার প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর বক্তব্য কখনও বা তাঁর বিদেশী বন্ধুদেরও বিমুখ করেছে তাঁর প্রতি। দেশে তাঁর অতিসম্মানিত নোবেলজয়ী কবি-গৌরব সত্ত্বেও সমালোচনা ও বিদ্রূপবর্ষণের পরিমাপ ছিল না। একবার বিদেশ থেকে এণ্ডরুজকে লিখেছিলেন (৮ ফেব্রুয়ারি ১৯২১) :

> ভয় হচ্ছে, ভারতে ফিরলে পরে সবাই আমাকে ত্যাগ করবে। মাতৃভূমিতে ফিরে একাকী নির্বাসন আমার অদৃষ্টে লেখা আছে। এখন আমার দেশের লোকের মনের যে অবস্থা — আমাকে তারা সহ্য করতে পারবে না। কারণ, আমি যে আমার দেশের চেয়ে বিশ্বদেবতাকে বড় বলে মানি।

অল্পদিনের ব্যবধানে আবার লিখেছেন,

> পুবের দিকে মুখ ফিরিয়ে চলেছি ভাবতেই আনন্দে আমার বুক ভরে উঠছে। আমার প্রাচ্য কবিরই প্রাচ্য। রাজনীতিবিদ বা জ্ঞানীর প্রাচ্য নয়।।

কখনও আবার লেখেন,

> আমি ভারতবর্ষকে ভালবাসি কিন্তু এই ভারতবর্ষ কোনো ভৌগোলিক সত্তা নয়, সে একটি ভাবময় রূপ। তাই আমি প্রকৃতপক্ষে স্বদেশবৎসল নই, কারণ সারা পৃথিবী জুড়েই আমি আমার স্বদেশীয়দের সন্ধান করে বেড়াব। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন আপনি।

আজকের যুগ কি এই মানুষকে বুঝতে চেষ্টা করবে? এ-কথা স্মরণে রাখবে যে উগ্র

স্বাজাত্যের বোধ না-থাকা বিশ্বনাগরিক এই মানুষ বিদেশী অধীনতাপাশে আবদ্ধ স্বদেশের বেদনা ও অপমানে ক্ষুব্ধ হয়ে যত প্রবন্ধ, যত প্রতিবাদপত্র লিখেছেন, বিশ্বে স্বদেশের প্রকৃত পরিচয় তুলে ধরতে যা করেছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে তার তুলনা মিলবে না? জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পর ১৯১৯ সালে লর্ড চেমসফোর্ডকে লেখা তাঁর নাইটহুড প্রত্যর্পণের চিঠিতে বিশ্বের সব দেশের নিপীড়িত মানুষের সুতীব্র প্রতিবাদ ভাষা পেয়েছিল? অন্তত বাঙালি তাঁকে সম্পূর্ণ ভুলে থাকতে পারবে না, তিনি এমনই আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছেন। আর তাঁর জীবনী পড়লে তাঁর সম্পর্কে তথ্য অনেক জানা যেতে পারে। কিন্তু তাঁর সত্য? তাঁর সমগ্র? আমাদের মাপ-মতো কেটে-ছেঁটে তাঁকে ছোট করে নিই, কখনও আধখানা দেখি, কখনও সিকিখানা, কখনও আরও আরও আরও কম। তাতেই কাজ চলে যায়, বরং সেটাই নিরাপদ। রবীন্দ্রচর্চা করছি ভেবে আত্মপ্রসাদে বিভোর হই।

ক্ষিতিমোহন সেনের লেখায় পড়ি, মহাসাধকরা আসেন মানবসাধনার 'বরিয়াত' অর্থাৎ বরযাত্রা চালিয়ে নিয়ে যেতে। বজ্রের আঘাতে সকলকে জাগিয়ে বজ্রাগ্নির মশাল হাতে দেন সবার। তাঁদের মন্ত্র ও বাণী সেই মশাল। কিন্তু সে-সব জ্বলন্ত মন্ত্র ও অগ্নিময়ী বাণী কেউ নিজের নিজের ভাণ্ডারে সঞ্চয় করে রাখতে পারে না। তাই সঞ্চয়ব্রতী অনুবর্তীর দল সেই জ্বলন্ত মশাল নিভিয়ে নিরাপদ করে নেয়। সম্প্রদায় গড়ে ওঠে, আকাশভেদী মঠের চূড়া শোভা পায়। সাধকের হাতের মশাল নিরুত্তাপ পড়ে থাকে, আলোর উদ্ভাস আর চোখে পড়ে না।

'আমি শুধু এক কবি' — বলেন রবীন্দ্রনাথ, সহস্রবার বলেন তিনি সাধক নন। তবু তাঁর ভিতরে জ্বলছে ওই মশালের আগুন। 'এই শ্রাবণের বুকের ভিতর আগুন আছে।' 'সেই আগুনের পুলক ফুটে' আমাদের চিত্তের কদম্ব-বন যদি যথার্থই রঙিয়ে ওঠে, মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ প্রাসঙ্গিক না অপ্রাসঙ্গিক এই প্রশ্নটাই অবান্তর হয়ে যাবে।

প্রশ্ন । রবীন্দ্রচর্চার আদর্শ ও লক্ষ্য কী হওয়া উচিত বলে আপনার মনে হয়? এই লক্ষ্যে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলি কতখানি নিবিষ্ট বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর। রবীন্দ্রচর্চার আদর্শ ও লক্ষ্য কি হওয়া উচিত, এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজসাধ্য নয়। এত বিচিত্র অর্থদ্যোতক এই শব্দ, এমন অতলান্ত এর ব্যঞ্জনা, প্রকৃত অধিকারীর হাতের কলমেই হয়তো বা তার সকল দিকস্পর্শী আলোচনা সম্ভব হতে পারে। আমার মতো অনধিকারী এই নিয়ে কী বা কথা বলবে। রবীন্দ্রসৃষ্টির মহাবিশ্বের আকার-প্রকার, গতি-প্রকৃতি সম্যক জানাটাই এক জীবনব্যাপী কাজ। এর এক-একটি ক্ষুদ্রাংশ নিয়ে এক এক বিশিষ্ট মনস্বীর চিন্তা-অনুসন্ধান-বিশ্লেষণের ক্ষেত্র সুদীর্ঘকালে সম্প্রসারিত হয়ে যায়। যাঁরা নিরলস সাধনায় তাঁর সংগীতের বিশাল ভুবনে প্রবেশলাভ করেছেন, তাঁরা আর-একভাবে রবীন্দ্রচর্চার ব্রত উদ্‌যাপন করেছেন, এখনও করছেন। গত শতাব্দীর চল্লিশের দশক থেকে বেশ কয়েকজন রবীন্দ্রসংগীত-শিল্পীকে আমরা পেয়েছি, যাঁরা শিল্পী হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি অর্জন করেছেন, শিক্ষকতাতেও যাঁরা সার্থক হয়েছেন। আরও কয়েকজন ছিলেন, হয়তো শিল্পীর মর্যাদা তাঁরা লাভ করেননি, কিন্তু তাঁরা ছিলেন অসামান্য শিক্ষক, বহু শিল্পী

সৃষ্টি করেছেন তাঁরা। এ রকম মানুষ এখনও ছড়িয়ে আছেন এদিকে-সেদিকে, পাদপ্রদীপের আলোয় সর্বদা দেখা যায় না তাঁদের, অন্তরের তাগিদে সাচ্চা শিক্ষার্থী তাঁদের খুঁজে নেন। এই-সব মানুষের প্রদর্শিত পথে নতুন প্রজন্মের জন্য নিত্য গতি সঞ্চারিত হচ্ছে। স্খলন-পতন-ত্রুটি সব ক্ষেত্রেই আছে, কিন্তু এটা আশা এবং আশ্বাসের কথা যে রবীন্দ্রসংগীত চর্চার ক্ষেত্রটি এখনও পর্যন্ত নিরন্তর সুফলপ্রসূ দেখতে পাই। অর্ধশতাব্দীর অধিককাল ধরে রবীন্দ্রচর্চার আদর্শ ও লক্ষ্যের একটি সুপথ নির্মিত হয়ে উঠেছে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে চালাকির দ্বারা বা নিছক চমক সৃষ্টির চেষ্টার দ্বারা এই ভুবনের ক্ষতি কেউ করতে পারবে না বলে আমার বিশ্বাস। কিন্তু গান ছাড়াও প্রয়োগ-সম্ভাবনার যে বিপুল মজুত-ভাণ্ডার রবীন্দ্রসৃষ্টিতে আছে, সেখানে বর্তমান সময়ের রবাহুত অনুপ্রবেশ কোনো ইতিবাচক তাৎপর্য বহন করছে না বলেই আমার ধারণা। শিল্পবোধ, যোগ্যতা, পরিশ্রম, নিষ্ঠার দৈন্য প্রকট। রবীন্দ্রনাথকে পণ্য করে চট্‌জলদি বাজারদখল করার লুব্ধতা প্রকটতর।

যে-কথা দিয়ে এই প্রসঙ্গ শুরু করেছিলাম, সেই রবীন্দ্র-অন্বেষার কথাটায় ফিরে আসি। আমার কেবলই মনে পড়ছে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের 'রবীন্দ্র চর্চার ভবিষ্যৎ' নামে একটি প্রবন্ধের কথা। ১৯৮৭ সালে তিনি রবীন্দ্রচর্চাভবনে দুটি অবিস্মরণীয় লিখিত ভাষণ দিয়েছিলেন, এটি তারই একটি। এই প্রবন্ধের প্রায় গোড়াতেই লেখক বলেছেন:

> রবীন্দ্রচর্চার ইতিহাস আমাদের পক্ষে এক গৌরবজনক ইতিহাস এমন কথা বলা সম্ভব বলে মনে করি না। রবীন্দ্রনাথ যত বড় কবি তাঁর সম্বন্ধে আমরা তত বড় কাজ করতে পারিনি একথা স্বীকার করবার সময় এসেছে। পৃথিবীর সাহিত্যে এমন বিশাল প্রতিভার আবির্ভাব বড় বেশি হয়নি। একথা আমরা বুঝেছি বলে মনে হয় না। আজকাল আমার অনেক সময় মনে হয় যে রবীন্দ্রনাথ যদি গান না লিখছেন তাহলে আমাদের জীবনে তাঁর স্থান দুর্নিরীক্ষ্য হয়ে উঠত। আর কবির গানের মর্মও যে আমরা বড় উপলব্ধি করি, তাও মনে হয়না।

ভারত সরকারের তত্ত্বাবধানে যে ভাবে মহাত্মা গান্ধীর তারবার্তাটি পর্যন্ত যুক্ত হয়ে প্রায় শতখণ্ডে তাঁর রচনাবলী প্রকাশিত হয়েছে, 'কোনো ভারত সরকার রবীন্দ্রনাথের যথার্থ সমগ্র রচনা প্রকাশের কোনো প্রকল্প আজ পর্যন্ত করেননি।' এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক দাশগুপ্ত নির্দ্বিধায় বলেছেন,

> রবীন্দ্রনাথের ন্যায় কবির সমগ্র রচনা বলতে কি বোঝায় তাই আমরা জানি না। জর্মান কবি গ্যেটের রচনাবলী প্রকাশ করতে সময় লেগেছিল ৩১ বছর এবং এ কাজ আরম্ভও হয়েছিল কবির মৃত্যুর ৫৫ বছব পর। গ্যেটের এই সমগ্র রচনা ১৩৩ খণ্ডে সম্পূর্ণ। ৫৫ খণ্ড কাব্য, ১৩ খণ্ড প্রবন্ধ, ১৫ খণ্ড ডায়ারি এবং ৫০ খণ্ড চিঠিপত্র। এর সঙ্গে পরে আরও ১০ খণ্ড যুক্ত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনা ১৫০ থেকে ২০০ খণ্ডে সম্পূর্ণ হবে বলে ধরে নিতে পারি। এ কাজ শুরু হয়নি। এমন কাজের কোনো প্রকল্পও আছে বলে জানি না। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ গ্রন্থবাণিজ্যে পটু। রবীন্দ্রনাথ যে গ্রন্থ লেখেননি এমন অনেক গ্রন্থ এই সংস্থা প্রকাশ করে লাভবান হয়েছেন। বিশ্বভারতী রবীন্দ্রচর্চার পথ প্রশস্ত করবার কোনো উদ্যোগ এখন পর্যন্ত করেননি। রবীন্দ্ররচনার এক সাধারণ পাঠক

হিসেবে কোনোদিন এমন বস্তু হাতে পাইনি যা দেখে মনে হয় সমগ্র রবীন্দ্রবস্তুর ভাণ্ডারী এক কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় তা প্রকাশ করেছেন।

যখন এ-সব কথা লিখছেন অধ্যাপক দাশগুপ্ত, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে তখন পঞ্চাশ বছর পার হতে খুব আর দেরি নেই। রবীন্দ্রনাথের মতো কবি ও মনীষীর যে কোনো গ্রন্থেরই সম্পূর্ণ একটি সংস্করণ প্রকাশের জন্য সেটি সম্পাদনার কাজ কী ভাবে হওয়া উচিত বলে মনে করেন অধ্যাপক দাশগুপ্ত, এই প্রবন্ধে তার কিছু ইঙ্গিত আছে। যেমন, তিনি বলেছেন,

> রবীন্দ্রনাথের কোনো গ্রন্থের facsimile edition হয়নি। Eliot-এর মৃত্যু হয় ১৯৬৫ সালে। ১৯৭১-এ বের হয় Wasteland-এর facsimile edition। এতে আছে এই কাব্যের পাণ্ডুলিপির photo copy, প্রথম সংস্করণের photo copy এবং সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য। *গীতাঞ্জলি* এক বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থ। বিশ্বভারতী এর এক facsimile সংস্করণ প্রকাশ করতে পারতেন। *ইংরেজি গীতাঞ্জলির* পাণ্ডুলিপি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের Houghton লাইব্রেরিতে দেখেছি। একদিকে রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরের বাংলা কবিতা, অন্যদিকে তাঁর হস্তাক্ষরের ইংরেজী অনুবাদ। এই পাণ্ডুলিপির আর এক খণ্ড ও বিশ্বভারতীতে রক্ষিত। Macmillan facsimile edition ছাপার অনুমতি নিশ্চয় দিতেন। এমনকি বিশ্বভারতীর অনুরোধে Macmillanও এই বই ছাপতে পারতেন। কৃষ্ণকৃপালনী এক দীর্ঘ ভূমিকায় এই কাব্যগ্রন্থের রচনার ইতিহাস উপস্থিত করতে পারতেন। এই গ্রন্থে *গীতাঞ্জলি* সম্বন্ধে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সমালোচকদের সমালোচনার নির্বাচিত অংশ উপস্থিত করা যেত। বিভিন্ন ভাষায় এই কাব্যগ্রন্থের অনুবাদের একটি তালিকা এ রকম একখানি বইতে থাকবেই। গ্রন্থের সংযোজন অংশে আর থাকত কবির নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির ইতিহাস এবং রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধ ও *গীতাঞ্জলি* সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ। *ঋগ্বেদ* থেকে আরম্ভ করে বাউল গান পর্যন্ত ভারতীয় ধর্মসংগীতের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের স্থান কোথায় এবং এই হিসেবে *গীতাঞ্জলির* অপূর্বতা কোথায় তা, এই দ্বিতীয় প্রবন্ধে দেখানো যেত। রবীন্দ্রনাথের *শান্তিনিকেতন, মানুষের ধর্ম,* Religion of Man এবং ইংরেজী এবং অন্যান্য গ্রন্থ থেকে কবির উক্তি উদ্ধৃত করে তাঁর আধ্যাত্মিক অনুভূতির সঙ্গে তাঁর ধর্মমতের যোগ কোথায় তাও দেখানো যেত। গীতাঞ্জলির এই সংস্করণ বিশ্বসাহিত্যের এক শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে গণ্য হত।

এই জাতীয় কাজ এখনও পর্যন্ত হয়নি, সে কথা বলাই বাহুল্য, তবে ইংরেজী *গীতাঞ্জলি* প্রকাশের একানব্বই বছর পরে এবং *গীতাঞ্জলির* কবির নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির নব্বই বছর পরে ২০০৩ সালে *গীতাঞ্জলির* একটি দৃষ্টিনন্দন অলংকৃত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্বভারতীর সহযোগে সেটি প্রকাশ করেছেন UBS Publishers' Distributors Pvt. Ltd. অধ্যাপক দাশগুপ্ত কল্পিত সংস্করণের এটি একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র। তাঁর কথার পুনরাবৃত্তি করে বলি সমগ্র রবীন্দ্রবস্তুর ভাণ্ডারী এক কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বে সংস্করণটি প্রস্তুত হয়েছে, এমন মনে হল না। কোনো সুযোগ্য পরিশ্রমী লেখনী-প্রসূত মননশীল দীর্ঘ ভূমিকা এতে নেই, যে ভূমিকা অধ্যাপক দাশগুপ্ত পাবার আশা করেছিলেন কৃষ্ণ কৃপালনীর কাছ থেকে। বইটির ডানদিকের পৃষ্ঠায় Gitanjali Song Offerings-এর কবিতাগুলি ছাপার হরফে মুদ্রিত হয়েছে, কবির হস্তাক্ষরে নয়। বাঁদিকের পৃষ্ঠায় তার মূল বাংলা গান বা কবিতা

কবির নিজের হাতের লেখায় পাওয়া যাচ্ছে। ইংরেজী ফরাসী পর্তুগিজ জাপানী *গীতাঞ্জলির* ভূমিকা বা তার নির্বাচিত অংশ এতে ছাপা হয়েছে। একটি *গীতাঞ্জলি* বিষয়ক জার্মান লেখার ইংরেজি অনুবাদও দেওয়া হয়েছে সেই সঙ্গে। অন্য লেখাগুলিতে লেখকের নাম আছে, কিন্তু এ লেখাটি যে কার, কবে কোথায় এটি বেরিয়েছিল, তার কোনো উল্লেখ নেই। ২৬ মে ১৯২১ রবীন্দ্রনাথ স্টকহোমের সুইডিশ আকাডেমিতে যে ভাষণ দেন, সেই ভাষণটি এই গ্রন্থে The Nobel Prize Acceptance Speech নামে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু ১৯১৩ সালে যে পুরস্কার পেলেন, কি কারণে ১৯২১ সালে সেটি প্রাপ্তির উত্তর-ভাষণ দিলেন কবি, তার ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করা হয়নি। যেন এমনটা হওয়াই স্বাভাবিক। যেন মানুষ পুরস্কার পাবার সাত বছরেরও বেশি সময় পরে হামেশাই তার জন্য ধন্যবাদসূচক ভাষণ দিয়ে থাকেন। ঘটনা হল, রবীন্দ্রনাথকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হবে, সুইডিশ আকাডেমিতে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ১৩ নভেম্বর ১৯১৩। সেইদিনই ঘোষিত হয় এই সংবাদ : 'The Nobel Prize for literature for 1913 has been awarded to the Indian Poet Rabindra Nath Tagore.' কলকাতায় এ খবর আসে পরদিন। স্টকহোমে পুরস্কারপ্রদান অনুষ্ঠান হয় ১০ ডিসেম্বর ১৯১৩। আমন্ত্রণ এলেও রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকা সম্ভব হয়নি। সুইডেনের রাজার হাত থেকে তাঁর হয়ে পুরস্কারের সোনার মেডেল ও ডিপ্লোমা গ্রহণ করেন সেখানকার ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত। ২৯ জানুয়ারী ১৯১৪ কলকাতায় গভর্নর হাউসে আয়োজিত একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে বাংলার গভর্নর লর্ড কারমাইকেল রবীন্দ্রনাথের হাতে এই পুরস্কার অর্পণ করেন। রবীন্দ্রনাথ কোনো ভাষণ দিয়েছিলেন বলে জানা যায় না। পুরস্কারের অর্থমূল্য বাবদ প্রাপ্য চেকটি Nobel Foundation — এর পক্ষ থেকে তাঁকে সরাসরি পাঠানো হয়।

কিন্তু বিধি অনুসারে সুইডিশ আকাডেমিতে প্রত্যেক পুরস্কারপ্রাপকের একটি ভাষণ দেওয়ার কথা। সেটি বাকি থেকে গিয়েছিল। ১৯২০ সালে রবীন্দ্রনাথ ইউরোপ-আমেরিকা ভ্রমণে যান। ইংলণ্ড থেকে সুইডেন যাবার কথা ভেবেছিলেন, কিন্তু প্রথমটায় সে ইচ্ছা বাধাগ্রস্ত হয়। পরে আমেরিকা ঘুরে, আবার কয়েকদিন লণ্ডনে কাটিয়ে পরের বছর এপ্রিলের মাঝামাঝি তিনি ইউরোপে এলেন। ২৩ মে তাঁরা ডেনমার্কের কোপেনহেগেন থেকে রওনা হয়ে পরদিন সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে আসেন। স্টেশনে বিপুল জনতা তাঁকে স্বাগত জানায়। তাঁকে অভ্যর্থনা করতে এসেছিলেন সুইডিশ আকাডেমির সেক্রেটারি Dr. Erik Axel Karlfeldt এবং বিশিষ্ট কয়েকজন সাহিত্যিক ও অন্যান্য মানুষ। যে কয়দিন স্টকহোমে ছিলেন ভোজের নিমন্ত্রণে, বক্তৃতাপ্রদানের আমন্ত্রণে, বহু বিশিষ্ট মানুষের সঙ্গে সাক্ষাতে ও আলোচনায় খুব ব্যস্ততার মধ্যে কাটে। তারই মধ্যে ২৬ মে ১৯২১ বিকেলে সুইডিশ আকাডেমিতে নোবেল বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এই ভাষণই Nobel Prize Acceptance Speech নামে ওই বইয়ে ছাপা হয়েছে।

যাইহোক, এ কথাটাও স্বীকার্য যে, রবীন্দ্রচর্চার পক্ষে অপরিহার্য যে-সব কাজ, যার কিছু কিছু ইঙ্গিত অধ্যাপক দাশগুপ্ত এই প্রবন্ধে দিয়েছেন, ইতিমধ্যে তার অন্তত আংশিক অভাবপূরণ হয়েছে প্রকাশিত বেশ কয়েকটি আকরগ্রন্থে। সেগুলির বিস্তৃত পরিচয় দেবার স্থান এ নয়।

সবগুলির সংবাদ জানিও না হয়তো। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের চার খণ্ডে প্রকাশিত রবীন্দ্রজীবনী-র উল্লেখ করেছেন অধ্যাপক দাশগুপ্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে। সম্প্রতিকালে এ প্রবন্ধ লিখতেন যদি, স্নেহ ও মান্যতার সঙ্গে নিশ্চয় তিনি প্রশান্তকুমার পালের রবিজীবনী-রও উল্লেখ করতেন, যার নয়টি খণ্ড এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্র-জীবনের পঞ্চষষ্টি বৎসরের কূল দেখা গেল বলে। এই তন্নিষ্ঠ লেখকের শৃংখলাবোধ ও তথ্যনিষ্ঠার তুলনা নেই।

'রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কি কাজ হতে পারত, কিন্তু হয়নি' এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক দাশগুপ্তের প্রবন্ধে বেশ কয়েকটি প্রস্তাব আছে। সবগুলির আলোচনা এখানে করা সম্ভব নয়। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের *রবীন্দ্রবর্ষপঞ্জী* গ্রন্থটির নাম করেছেন তিনি। ১৯৬২ সালে প্রকাশিত এই বইয়ের মূল্য স্বীকার করলেও তাঁর বক্তব্য :

> কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জীবনের ঘটনাপঞ্জীর বস্তু এবং আকার হওয়া উচিত এর কমপক্ষে বিশগুণ। রবীন্দ্রনাথ বেঁচেছিলেন আশি বছর। মিল্টনের আয়ু ৬৬ বছর ছাড়ায়নি। মিল্টনের জীবনপঞ্জীর আকার-প্রকার ভিন্ন। ৫ খণ্ডের এই বইয়ের নাম *The Life Records of John Milton*। ১৯৪৯ থেকে ১৯৫৮ সালে ছাপা ২৩১১ পৃষ্ঠার এই বৃহৎ গ্রন্থখানি প্রস্তুত করেছেন John Milton French। এই বইখানিতে শুধু মিল্টনের জীবনের ঘটনার উল্লেখ এবং তার তারিখ নেই, সেই ঘটনা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় এতে সংগৃহীত। অধ্যাপক French যদি *Life Records of Rabindranath Tagore* বলে এক বিরাট বই লিখতেন, তাহলে তিনি শুধু বলতেন না ১৯১৯-এর ৩০শে মে কবি তাঁর Knighthood পরিত্যাগ করেন। তিনি কখন কোথায় বসে বড়লাটের কাছে চিঠিখানা লিখলেন, চিঠিখানা বড়লাট কবে পেলেন, পেয়ে কি করলেন না করলেন, এই বিষয়ে সরকারী নোট কি কোথায় আছে, মূল চিঠিখানি কোথায় বা কোথায় কোথায় ছাপা হয়েছে, এই ঘটনার পর ইংলণ্ডে ইউরোপে ভারতবর্ষে কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, এই সব কথা এবং এই সংক্রান্ত সমস্ত দলিল তিনি গ্রন্থভুক্ত করতেন। এবং এ বিষয়ে কোথায় কি আলোচনা হয়েছে তার সমস্ত খবর দিতেন। ইংরেজের চোখে কবি যে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত একজন নাইট ছিলেন তাও প্রমাণসহ বুঝিয়ে দিতেন। এ খুব পরিশ্রমের কাজ, নিরলস অনুসন্ধানের কাজ। .....*The Life Records of John Milton*-এর মতো রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করবার সময় এসেছে।

আশা করি, এ নিয়ে কারো মনে সংশয় দেখা দেবে না যে অধ্যাপক দাশগুপ্তের এই প্রবন্ধ রবীন্দ্রগ্রন্থ সম্পাদনার, রবীন্দ্রগবেষণার লক্ষ্য ও আদর্শ কি হওয়া উচিত, এ প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পেরেছিল। সে-কথা জেনেই এই শ্রদ্ধাস্পদ সুপ্রবীণ প্রাবন্ধিকের প্রবন্ধ নিয়ে এতটা বিস্তৃত আলোচনা করেছি। এককালে সাময়িক পত্রিকাও অত্যন্ত সদর্থক ভূমিকা পালন করে এই প্রশ্নের কিছু কিছু উত্তর দিয়েছে। সে-সব অনেক পত্রিকার এখন আর অস্তিত্বই নেই। অনতি-অতীতেও রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত পত্রগুচ্ছ প্রকাশিত হয়েছে পত্রিকার পাতায়, নাম-করা লেখকদের বহু মূল্যবান মননশীল প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। নতুন আবিষ্কৃত তথ্যসমাবেশও কম হয়নি। ইদানীং কালের কোনো পত্রিকায় কতটা হয়ে থাকে ঠিক জানি না। তবে নানা পত্রপত্রিকার কবিপক্ষীয় বিশেষ সংখ্যায় বহু শিরোনামের মধ্যে সাধারণত

চর্বিতচর্বণ অতিক্রম করে তেমন কিছু চোখে পড়ে না।

বহু বিজ্ঞাপিত ঐতিহ্যগর্বী নামী পত্রিকারও এখন পছন্দ বিতর্কমূলক প্রবন্ধ। কেননা তাতে পরবর্তী অনেকগুলি সংখ্যায় চিঠিপত্র বিভাগে পক্ষে-বিপক্ষে পাঠকদের অভিমত ছাপা যায়। তাতে পত্রিকার জনপ্রিয়তার, পাঠক সমাজের সচেতনতার যাচাই হয়। কিন্তু এই-সব প্রবন্ধ বা তৎসংশ্লিষ্ট আলোচনা রবীন্দ্রসৃষ্টি বা রবীন্দ্রব্যক্তিত্বকে সত্যার্থে জানতে, অথবা রবীন্দ্রচর্চার নব নব দিগন্ত উন্মোচন করতে কতটুকু সহায়ক হতে পারে, তা নিয়ে প্রশ্নের অবকাশ থেকেই যায়। এ ধরনের পত্রিকার লক্ষ্য বাণিজ্য, অনেক উপলক্ষের মধ্যে রবীন্দ্রনাথও একটা। সম্পাদক-লেখক সকলেরই দৃষ্টি যেন সমকালীনতার বেড়া দিয়ে ঘেরা।

সম্প্রতি অরূপরতন ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ থেকে *বিশ্বপরিচয় পাঠপরিবর্তন ও রচনার পটভূমি* নামে *বিশ্বপরিচয়* বইটির একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। বইটি এখনও দেখবার সুযোগ হয়নি আমার, তবে ৩১ মে' ০৩ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় তার যে আলোচনা পড়েছিলাম, বর্তমান প্রসঙ্গে সেটি মনে পড়ছে। এ বই সম্পাদনার প্রশংসা করেছেন আলোচক বিশ্বজিত রায়। তারপর একজায়গায় বলেছেন,

> সম্পাদকমশাই-এর হয়ত সুযোগ ছিল না, এ ক্ষেত্রে আগ্রহী পাঠক রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানচর্চার বাংলা ভাষা নিয়ে আলাদা করে ভাবতে পারেন। বস্তুত বাংলা ভাষায় কেমন করে বিজ্ঞান লেখা হবে তা নিয়ে অনেকেই ভেবেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন *বিজ্ঞানরহস্য*। ১৯৩৭-এর ২৭ ডিসেম্বর প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের পঞ্চদশ অধিবেশনে প্রফুল্লচন্দ্র রায় যে অভিভাষণ পাঠ করেন তাতে বাংলায় বিজ্ঞানচর্চার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পায়। ইদানীং রবীন্দ্রবিদ্যা চর্চায় বড় অংশ দখল করেছে রবীন্দ্রনাথের কোন রচনায় কোন নারী কতটা ছায়া ফেলেছেন তার নিপুণ হিসেবপত্তর। এ-সবের বাইরে গিয়ে জ্ঞানচর্চার অন্য আদিকল্প (paradigm) থেকে রবীন্দ্ররচনার বিচার করলে মন্দ হয় না। *বিশ্বপরিচয়*-এর পাঠান্তর সংবলিত সংস্করণ এই সুযোগের উন্মোচন করল। প্রসঙ্গত, রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানবীক্ষণ নিয়ে অনেকেই আগ্রহী। জিতেন্দ্রনাথ মোহান্তির *The Self and the other philosophical essays* বইতে রবীন্দ্রনাথ ও আইনস্টাইনের সংলাপ নিয়ে চমৎকার একটি লেখা আছে।

রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানভাবনা ও তার প্রকাশোপযোগী ভাষাসন্ধান নিয়ে কি কাজ হয়েছে বা হতে পারে, সামান্য এই কটি বাক্যে তার চমৎকার ইঙ্গিত মেলে। এই লেখক আমার সবচেয়ে মনের মতো কথাটি বলেছেন রবীন্দ্রবিদ্যাচর্চায় বর্তমানের অতি-ঝোঁকের দিকটা নিয়ে। রবীন্দ্রগবেষণার নামে যুক্তির চেয়ে অনুমানের জোরে একপেশে সংকীর্ণ খাতে মাটিখননের অত্যুৎসাহটাই আজ বেশি চোখে পড়ে। কাকে কখানা চিঠি লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তার হিসাব-নিকাশ এবং সেই যোগবিয়োগ-নিরূপিত সম্পর্ক-বিচারে এঁরা খুব নিপুণ। বাইরের খুচরো তথ্যবিচারে অন্তরের সত্যকে যে জানা যায় না, এই সহজ কথাটা যে এঁরা বোঝেন না তা নয়, কিন্তু 'গন্ধবিচারের' মতো সংখ্যাবিচারটাই আধুনিক গবেষণার মুখ্য চরিত্রলক্ষণ বলে মনে করেন হয়তো।

তবে সকলেই তো আর 'মিছে কোলাহল' করেন না। এমন অনেক বিশিষ্ট এবং সার্থক রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞের লেখা আগ্রহী মানুষ পড়বার সুযোগ পেয়েছেন, এখনও কখনও কখনও পান, যাঁদের চিন্তা-চর্চা-গবেষণা রবীন্দ্রভুবনের নতুন নতুন পথের দিশা দেখিয়ে দিয়েছে, দেখিয়ে দিচ্ছে আজও। অপেক্ষাকৃত তরুণরাও এসে যোগ দিচ্ছেন এই দলে। রবীন্দ্রচর্চার আদর্শ ও লক্ষ্য কি হওয়া উচিত, তাঁদের কাজের দ্বারা এঁরা যে যাঁর মতো করে তার উত্তর দিয়েছেন, ভবিষ্যতেও দেবেন, আশা রাখি।

সর্বজ্ঞ নই, দূরদৃষ্টিরও একান্ত অভাব। রবীন্দ্র-প্রতিষ্ঠানের আদর্শ লক্ষ্য ও ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলতে নারাজ আমি। তবে প্রতিষ্ঠানের চেয়ে ব্যক্তি বড় এ-কথা আমাকে শিখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। সর্বশক্তিমান নেশন যে ব্যক্তিমানুষকে সর্বার্থে পিষে ফেলে মানবসভ্যতার ভয়াবহ বিপদ ডেকে আনছে, এ-কথা বলে শক্তিধর দেশগুলির কাছে অত্যন্ত অপ্রিয়ভাজন হয়েছিলেন। পরেও বহুবার বলেছেন সব ধরনের প্রতিষ্ঠানই তার বাধ্যবাধকতার দ্বারা ব্যক্তির স্বাধীনতা হরণ করে, তাঁর অন্তর্জীবনের স্বচ্ছন্দ প্রবাহ রুদ্ধ করে। আবার সেইসঙ্গে এ-কথাটাও মনে হয় যে, এই ব্যক্তিবিশেষ বা কতিপয় সমমনস্ক ব্যক্তি কোনো প্রতিষ্ঠানের অভিপ্রায়কে সজীব এবং সফল করে তুলতে পারেন। না হলে ওই কার্যনির্বাহী সভা আর বার্ষিক বিবরণীর কাগজের নৌকা কখনও তাকে গতি দিতে পারে না। তা যদি না হত, রবীন্দ্রনাথের নিজের প্রতিষ্ঠান রূপ নিত কেমন করে। সেই বিশ্বভারতীতেই, অন্যে পরে কা কথা, কানাই সামন্ত পুলিনবিহারী সেনের মতো রবীন্দ্রগ্রন্থপ্রকাশের আদর্শ নির্মাণে অবিসম্বাদিত মানুষকেও নানা প্রাতিষ্ঠানিক প্রশাসনিক বাধার ভিতর দিয়ে চলতে হয়েছে। অবশ্য ভিতরের কথা আমার জানা নেই, কিন্তু এক একটি বই বেরোতে, চিঠিপত্রের খণ্ডগুলি বেরোতে যে এক এক যুগ কেটে গেছে, তার পিছনে অনেক দ্বন্দ্বসমাসের অলিখিত বিবরণ লুকিয়ে আছে, এরকম শুনতাম।

আবার এও তো ঠিক যে আবু সয়ীদ আইয়ুব কিংবা শঙ্খ ঘোষের তুল্য রবীন্দ্রমনস্বী হয়ে ওঠার জন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের ছত্রছায়া প্রয়োজন হয় নি। অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য বা অধ্যাপক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো কারও কথা যদি ভাবি, রবীন্দ্রসৃষ্টির ব্যতিক্রমী বিশ্লেষণ পেয়েছি যাঁদের কলমে, তাঁদের তো কোনো প্রতিষ্ঠানের আশ্রয় নেই। তেমনই সম্পূর্ণ বিপরীত বিন্দু থেকেও বিষয়টা দেখা যেতে পারে। প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে যোগ্যতম ব্যক্তিটির উপর যদি দায়িত্ব অর্পিত হয়, সম্পূর্ণ স্বাধীন একাগ্রতায় কাজটি যদি তিনি সম্পন্ন করতে পারেন, তাহলে যে কী সম্পদের সৃষ্টি হতে পারে, সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত তেমন তিনটি গ্রন্থের উল্লেখ করা যেতে পারে। গত দশ বছরে প্রকাশিত হয়েছে এগুলি, সব কটিই সংকলন।

এক।। *রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ আনন্দবাজার পত্রিকা*। সম্পাদক চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশক আনন্দ পাবলিশার্স প্রথম খণ্ড নভেম্বর ১৯৯৩। দ্বিতীয় খণ্ড জানুয়ারি ১৯৯৫। তৃতীয় খণ্ড জানুয়ারি ১৯৯৬। চতুর্থ খণ্ড জানুয়ারি ১৯৯৮।

আনন্দবাজার পত্রিকার পক্ষ থেকে চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর এ দায়িত্ব অর্পিত

হয়েছিল। কাজ যখন শুরু হল তখনই তিনি যথেষ্ট প্রবীণ, শারীরিকভাবে অশক্ত, চোখের দৃষ্টি ক্ষীণতম, লেখাপড়ার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। স্বপ্না ঘোষ ছিলেন সহযোগী। চার খণ্ডেই অতি মূল্যবান ভূমিকা আছে সম্পাদকের, সুবিন্যস্ত বিষয়গুলির সঙ্গে যথোপযুক্ত টিকা আছে প্রতি খণ্ডে। এ ছাড়াও শেষ খণ্ডে 'রবীন্দ্রকালপঞ্জি' ও 'নির্বাচিত ব্যক্তিপরিচিতি' অমূল্য সংযোজন।

দুই।। *The English Writings of Rabindranath Tagore* Edited by Sisir Kumar Das. Published by Sahitya Akademi Vol 1 1994: Vol 11 1996: Vol 111 1996.

প্রতি খণ্ডে সম্পাদকের সুপরিকল্পিত ভূমিকা পাঠকের পক্ষে অপরিহার্য। সেগুলির মধ্য দিয়ে সম্পাদক সংহত আকারে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী রচনারম্ভের, বিদেশে কবি নাট্যকার গল্পকার ঔপন্যাসিক ও চিন্তাবিদ হিসাবে তাঁর স্বীকৃতির, বাংলা নাট্যচর্চার প্রেক্ষিতে তাঁর নাটক-গীতিনাট্য রচনার ও সফল মঞ্চপ্রয়োগের ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। খণ্ডগুলির শেষাংশে notes আছে। রচনাগুলির সময়কাল ও উপলক্ষ ছাড়াও সম্ভাব্য স্থলে বাংলা মূল লেখার উল্লেখ প্রভৃতি তথ্যগুলি একস্থানে পাওয়ার এতাবৎ দুর্লভ সুযোগ পাওয়া গেছে।

তিন।। *রবীন্দ্র রচনাবলী ষোড়শ খণ্ড গ্রন্থপরিচয়* প্রকাশক পশ্চিমবঙ্গ সরকার মে ২০০১/২৫ বৈশাখ ১৪০৮।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনাবলীর এই সংস্করণের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় মে ১৯৮০। সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন একটি সম্পাদকমণ্ডলী। বিশ বছর ধরে 'পঞ্চদশ ক' পর্যন্ত খণ্ডগুলি একে একে প্রকাশিত হয়েছে। এই দীর্ঘ সময় সম্পাদকমণ্ডলীর নামের তালিকা অনিবার্য কারণেই অপরিবর্তিত থাকেনি। চতুর্থ অর্থাৎ 'গান' খণ্ডে সম্পাদকদের মধ্যে শঙ্খ ঘোষের নাম ছিল। তারপরে এই নাম নিয়মিত অন্তর্ভুক্ত হয়েছে নবম খণ্ড থেকে। ষোড়শ খণ্ডে যথারীতি বর্তমান সম্পাদকমন্ডলীর নাম দেওয়া হয়েছে, সম্পাদকভূমিকাও নামহীন। তবে সকলেই জানেন যে এই গ্রন্থপরিচয় খণ্ড সম্পাদনা করেছেন শঙ্খ ঘোষ।

বইটিতে যে কী ভূরিপরিমাণ তথ্যের সমাবেশ হয়েছে, স্বল্প কথায় তাঁর পরিচয় দেওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণকাল থেকে ধরলে এমন একটি সম্পূর্ণ রবীন্দ্রগ্রন্থপরিচয়-সংকলন পেতে ষাট বছরের বেশি সময় লাগল। তবু যে পেলাম, এও অনেক।

তিনটি বই-ই বিরল প্রাপ্তি। প্রতিটি-ই অগাধ পরিশ্রমের ফসল। এমন বই হাতে পাওয়া শুধু বই পাওয়া তো নয়, বই কেমন হওয়া উচিত তার আদর্শকে পাওয়া।

প্রশ্ন। রবীন্দ্রচর্চায় টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক সোমেন্দ্রনাথ বসুর অবদান সম্পর্কে আপনার মতামত জানতে চাই।

উত্তর। ১৯৮৫ সালে যখন মাত্র আটান্ন বছর বয়সে হঠাৎ চলে গেলেন সোমেন্দ্রনাথ বসু, তাঁর সম্বন্ধে লিখতে বা বলতে গিয়ে অনেকেই এই কথাটার উপর সব-চেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন যে তিনি এই কলকাতায় টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট নামে এমন একটি সার্থক এবং দ্বিতীয়বিরহিত রবীন্দ্রচর্চাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পেরেছেন।

সোমেন্দ্রনাথের চেনা-পরিচিতের জগৎটা চিরকালই বিশাল, কিন্তু ইনস্টিটিউটের কাজের ব্যাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে এর সঙ্গে, রবীন্দ্রচর্চার সঙ্গে কাছের-দূরের সব মানুষই তাঁকে যেন একীভূত করে নিয়েছিলেন। এককালে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রপরিচয়সভা গড়ে উঠেছিল। ক্ষিতিমোহন সেনের সাপ্তাহিক রবীন্দ্রসাহিত্যপাঠের ক্লাসে বহিরাগতদেরও প্রবেশাধিকার ছিল। কলকাতাতেও রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালেই রবীন্দ্রপরিষদ যথেষ্ট উৎসাহের সঙ্গে কাজ করেছে। তারপর দীর্ঘ শূন্যতা। সোমেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে এক ভাষণে শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন সোমেন্দ্রনাথের সবচেয়ে বড়ো পরিচয় রবীন্দ্রচর্চার ক্ষেত্রে তাঁর উজ্জ্বল ভূমিকা। 'আমাদের পরম অবলম্বন, পরম ভরসা, পরম গৌরব রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু সেই রবীন্দ্রচর্চার আয়োজন ভারতবর্ষে বা বাংলায়, এমনকি তাঁর প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানেও বড়ো দীন, বড়ো নগণ্য, বড়ো লজ্জার।' যে দায়িত্ব সকলেরই ছিল অথচ পালিত হয়নি, 'সেই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন শুরু হয়েছে যাঁর জন্য তিনি শুধু আমাদের নমস্য বা শ্রদ্ধেয় পুরুষ নন, তিনি ইতিহাসে স্থান পেয়েছেন। রবীন্দ্রচর্চাভবনকে তাই মনে করি এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব যা সোমেন্দ্রনাথের হাত দিয়ে রূপায়িত হয়েছে।' পরম আন্তরিকতায় এ-কথা উচ্চারণ করেছিলেন শুভেন্দুশেখর।

ইনস্টিটিউট গড়ে তুলতে সোমেন্দ্রনাথ বিশ বছর সময় পেয়েছিলেন। ১৯৬৫ সালে রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠক্রমের ক্লাস দিয়ে শুরু, দু-বছরের কোর্স। নিয়মিত রবীন্দ্রআলোচনাচক্র, রবীন্দ্রসাহিত্যসম্মেলন ইত্যাদির মাধ্যমে কর্মকাণ্ড প্রসারিত হতে খুব সময় লাগেনি। কয়েক বছরের মধ্যে যখন *সাময়িকপত্রে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ : সাহিত্য (১৯৭০), Deenabandhu Andrews Centenary Volume (১৯৭২), সাময়িকপত্রে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ : প্রবাসী (১৯৭৬)* একে একে প্রকাশিত হল, *Tagore Studies 1969* নামে বার্ষিক একটি সংকলনের প্রথম সংখ্যা বেরোল, কাজ যে কিছু হচ্ছে অনেকেরই নজরে পড়েছিল। তরুণ ছাত্রছাত্রীদের সাড়া পাওয়া গিয়েছিল প্রথম থেকেই এবং ক্রমে তার সংখ্যা বেড়েছে। প্রবীণরাও প্রত্যাশা এবং বিশ্বাস নিয়ে এসেছেন।

যাঁরা সোমেন্দ্রনাথকে ইনস্টিটিউটের সূত্রপাত হবার অনেক আগে থেকে জানতেন, তাঁদের কারো কারো স্মৃতিচারণায় প্রতিষ্ঠান গড়ার নেপথ্য-কথা কিছু পাওয়া যায়। তাঁদের বলতেও শুনেছি নানা উপলক্ষে। সোমেন্দ্রনাথ নিজেও বলতেন। রবীন্দ্রনাথের শতবার্ষিকী উৎসবের আয়োজন এবং আড়ম্বরের মধ্যে কী একটা সমসাময়িক মানুষ একত্রিত হলেই সোমেন্দ্রনাথ তর্ক তুলতেন — ওদেশে যেমন শেক্সপীয়ার কোয়ার্টার্লি আছে, আমাদের দেশেও কেন সেই ধরনের রবীন্দ্রসাময়িকী প্রকাশিত হবে না। তাঁর উদ্যোগে বৈতানিক সংগীত-প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে *রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ* নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা বেরিয়েছিল শতবার্ষিকীর বছরেই। অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরীর মতে এই পত্রিকাই টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ভূমিকা রচনা করেছিল। 'ওখান থেকেই ইনস্টিটিউটের অঙ্কুর। শেক্সপীয়ার কোয়ার্টার্লির কথাতেই কথা হত। শেক্সপীয়ার তো কেবল কবি, জীবনের রূপকার। রবীন্দ্রনাথ জীবনের কর্ণধার। রবীন্দ্রনাথ একটি ব্যক্তি নন, রবীন্দ্রনাথ একটি 'বিশ্বাস'। সবার

মধ্যে, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সেই বিশ্বাস সঞ্চারের অঙ্গীকার নিয়ে যাত্রারম্ভ ইনস্টিটিউটের। সোমেন্দ্রনাথের নিজের মনের যে বিশ্বাসটা এই অঙ্গীকার রূপায়ণে মূল চালিকাশক্তি ছিল, ভূদেব চৌধুরীর লেখায় তার বিশ্লেষণ খুব স্পষ্ট। তরুণ বয়স থেকেই সোমেন্দ্রনাথ রাজনীতিকে জীবননীতি করেছিলেন, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর পথের দিশারী। তারপর স্বাধীন ভারতে রাজনীতির চরিত্রান্তর দেখে গুরু-শিষ্য উভয়েরই মোহভঙ্গ হল। ইনস্টিটিউটে পড়তে এসে আমরাও দেখেছি তখনও সোমেন্দ্রনাথ পার্টির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। রাজনৈতিক সভায় বক্তৃতা দিতেন, পার্টির কাজে গ্রামে যেতেন। বাঁধন কাটতে সময় লেগেছিল। রাজনীতির পথ ছেড়ে 'সংস্কৃতি'র জগতে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে মেতে ওঠা তাঁর পরিচিত অনেকের কাছেই তখন আত্মখণ্ডন বলে মনে হয়েছিল। ভূদেব চৌধুরী লিখেছেন,

> আজ ভাবি, যে সোমেন্দ্রনাথকে আমি জানতাম, একটাই ছিল তাঁর নেশা — দেশকে দেশের জীবনকে জাগিয়ে তোলা। রাজনীতি 'সংস্কৃতি'—আরো সব কিছু ছিল তার উপায় মাত্র। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সেই আশ্রয়টি দিয়েছিলেন — রবীন্দ্রচর্চা, তার ব্যাপক প্রসার একমাত্র ব্রত হয়েছিল তাঁর। সেই ব্রতের বেদীতে আত্মদান করলেন।

রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ প্রথম প্রকাশিত হয় আশ্বিন ১৩৬৮তে, সেটি একটি নমুনা সংখ্যা বলা যেতে পারে। কারণ, দেখা গেল প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার অভিধা পেয়েছে তিন মাস পরে প্রকাশিত পৌষ ১৩৬৮র সংখ্যাটি। প্রাক্‌প্রথম সংখ্যায় খুব ছোট একটি ভূমিকায় পত্রিকার লক্ষ্য কী বলেছিলেন সোমেন্দ্রনাথ। তারপর আনুষ্ঠানিক প্রথম সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর নামাঙ্কিত এই পত্রিকা সম্পর্কে অনেকটাই লিখলেন সম্পাদকের কলমে। বললেন,

> এই প্রবল ব্যক্তিত্ব ও এই আকাশ-ছোঁওয়া প্রতিভা আমাদের মুগ্ধ করেছে; তাই তার রহস্য উদ্‌ঘাটনের অসাধ্যসাধনেও আমাদের বিরাম নেই। যদিও জানি প্রতিভার কর্মপ্রক্রিয়াকে আজ পর্যন্ত কেউ কখনো জানেনি, এমনকি যারা প্রতিভার অধিকারী তারা নিজেরাও, তবু সীমার মধ্যে যে অসীমের ছোঁয়াটুকু লাগে তাতেই মনে অসীমকে জানবার ক্ষুধা জাগে - আমাদের সীমিত মনের জড়ভূমিতে অসীমের দান এটুকুই।
>
> *রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ* সেই অসীমের অনুধাবনে রত থাকবে। জানবার পরম আগ্রহে রবীন্দ্রচর্চা তার সাধনার বস্তু হবে। যে পরম সম্পদ অযাচিত ঐশ্বর্যের নানা অর্ঘ্য সাজিয়ে ধরেছে তারই রসাস্বাদনে *রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ* হয়তো সহায় হবে।

এই সংখ্যায় চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি প্রবন্ধ ছিল, পত্রিকার নামেই নাম। রবীন্দ্র-গবেষণার বেশ কয়েকটি প্রস্তাব দিয়েছিলেন তিনি, একটি রবীন্দ্রগবেষণাকেন্দ্র গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলেন, *রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ*-র মতো পত্রিকা যার মুখপত্র হবে। তার মাধ্যমেই চলমান রবীন্দ্রগবেষণাগুলির বিবরণ জানা যাবে। অনুমান করি, ভূদেব চৌধুরী শশিভূষণকুমার দাশগুপ্ত প্রমুখের মতো চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও আরও কোনো কোনো আগ্রহী বিদগ্ধ মানুষের সঙ্গে রবীন্দ্রচর্চার নানা দিক নিয়ে সোমেন্দ্রনাথ আলোচনা করতেন।

কয়েক বছর পরে ১৯৬৫ সালের মাঝামাঝি টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট নামক একটি রবীন্দ্র-অধ্যয়ন ও গবেষণাকেন্দ্র যে কাজ শুরু করেছে, তারও প্রথম খবর রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ-র পৃষ্ঠাতেই পাওয়া গিয়েছিল। তার প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানের বিবরণও এতে বেরোয়।

আরও পরে সোমেন্দ্রনাথের একান্ত উদ্যোগে ও সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত এই পত্রিকার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক থেমে গিয়েছিল, কিন্তু তিনি থেমে যাননি। ইনস্টিটিউট থেরে রবীন্দ্রচর্চা নামে পত্রিকা বেরিয়েছিল। এক বছর পরে রেজিস্ট্রেশনের নিয়মের জালে পড়ে তারই নাম হল *রবীন্দ্রভাবনা*।

পুরোনো রবীন্দ্রভাবনার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে নানা কথা মনে পড়ছিল। 'রবীন্দ্রচর্চাভবনের পনেরো বছর' নামে একটা লেখা পড়তে পড়তে মনে হল, সত্যি প্রথম বছরগুলোয় অর্থ, আশ্রয় কি নিয়ে সমস্যা ছিল না, কিন্তু আসল ভয় ছিল পাছে যথেষ্ট ছাত্রছাত্রী না আসে, পাছে রবীন্দ্রসাহিত্য পড়তে-আসা আগ্রহী মানুষের অভাব হয়। সোমেন্দ্রনাথের অবশ্য 'ভয় কারে কয় নাইকো জানা'। 'শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি' তাঁর দর্শন নয়। 'কেউ কেউ বলেছিল বৃথা চেষ্টা। রবীন্দ্রসাহিত্য পড়তে নিয়মিত কেউ আসবে না — কেনই বা পড়বে, আর্থিক লাভ তো কিছু নেই। কিন্তু দেখা গেল ভয় অমূলক।' নানা বাধা, তবু ইনস্টিটিউটের ক্লাসে মন বাঁধা পড়ত। 'দু এক বছরের মধ্যেই ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বাড়ল। একটা অপবাদ মিথ্যে করেই তারা যেন এল — কেউ তো বলতে পারবে না যে এদেশের ছেলেমেয়েরা রোজগারের ধান্দা ছাড়া কিছুই পড়ে না।' শুধু অল্পবয়সী ছেলেমেয়ে নয়, পরিণতবয়স্ক মানুষও আসতেন। রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণে এসে অনেকেই সোমেন্দ্রনাথের আকর্ষণে বাঁধা পড়তেন। আশ্চর্য ভালোবাসা ছিল তাঁর মধ্যে, মনের বৃত্তে সবারই জন্য জায়গা ছিল। লঘু-গুরু ভেদ না রেখে সবার সঙ্গে অবাধে মিশতেন, অনায়াসে মানুষকে কাছে টেনে নিতেন। ভালোবাসা পেয়েছেনও অজস্র। সেই প্রাপ্তির কথাটাই বেশি মনে থাকত। বলেছিলেন 'আমাদের সকলের হৃদয়ের মধ্যে একটা রাডার বসানো আছে। বাইরে কোথায় কি তরঙ্গ চলছে সে তরঙ্গ রাডারে সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে। কারও হৃদয়ের রাডারটা খুব শক্তিশালী, কারও কম। আমার মনে হয় আমার হৃদয়ের রাডারটায় জোর খুব বেশি। আমি বুঝতে পারি কে আমায় ভালোবাসছে, কে আমায় কাছে টানছে।'

কথায় কথায় বলতেন বাঙালির ছেলে যদি বাংলা জেনেও রবীন্দ্রনাথ না পড়ে তার মতো দুর্ভাগা আর কেউ নেই। প্রথম জীবনে তর্ক অনেক করেছেন। জোরগলায় বিরুদ্ধমত খণ্ডন করে স্বমত প্রতিষ্ঠার উৎসাহ যথেষ্ট প্রবল ছিল। প্রয়োজনে বা কোনো অভিঘাতের আলোড়নে সেই তার্কিক মনটাকে শেষদিন পর্যন্ত মুহূর্তেই সজাগ এবং সক্রিয় করে তুলতে পারতেন। কিন্তু ভিতরে ভিতরে তার অনেক আগে থেকেই সোমেন্দ্রনাথ অনেক বদলে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ আর তাঁর তর্কের বিষয় ছিলেন না, জীবনের মূলে তখন তিনি বাসা বেঁধেছেন। প্রথম বয়সের অসহিষ্ণু স্বভাব রবীন্দ্রনাথ পড়েই ক্রমশ বশে এসেছিল, এ-কথা তাঁর মুখেই শুনেছিলাম। তাঁর অন্তরের একান্ত ভালোবাসার সামগ্রী রবীন্দ্রনাথ। সেই পরম সম্পদ অন্যের সঙ্গে ভাগ করে নেবার ইচ্ছা দিনে দিনে বেড়েছে। কখনও বলেছেন ' সেই ভালোবাসা দিয়ে যদি আমি কাউকে রবীন্দ্রনাথের দিকে চোখ ফেরাতে পারি তবেই আমি বুঝব যে আমার চেষ্টা কিছুটা সফল হল, কিছুটা সার্থক হল। নানা উপলক্ষে কত ভাবে কত বারই ইনস্টিটিউটের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতেন। একবার বললেন 'আকাশের খুঁজিতে

কিনারা যে বলাকাপঙক্তি ডানা মেলে, তাদের যাত্রাপথের শেষ নিশানার মতোই রবীন্দ্রনাথকে জানারও শেষ সীমা বলে কোনো কথা নেই। রবীন্দ্রনাথ পড়ে দেশের ছেলেমেয়েদের মন একদিকে সুন্দরকে পাবে, ছন্দকে মানবে, অন্যদিকে স্বাধীন ও বীর্যবান হবে, এই আশা নিয়েই রবীন্দ্রচর্চাভবনে রবীন্দ্রসাহিত্যপাঠের আয়োজন। আমাদের ক্ষুদ্র সামর্থ্যের তুলনায় এ কাজের ক্ষেত্র বহুগুণ ব্যাপক। তবু যত দুর্বল হই, যত সীমিতসাধ্য হই, এই চেতনাটুকু অন্তত আমাদের আছে যে একটি অখণ্ড জীবনবোধে নতুন করে জাগ্রত হতে হবে। সেইখানেই এই ইনস্টিটিউট গড়ে তোলার সার্থকতা।

অসামান্য সুবক্তা ছিলেন। তাঁর ভাষণ শোনার আনন্দের তুলনা ছিল না। তিনি নিজেও খুব আনন্দ পেতেন। সে আনন্দ প্রকাশের আনন্দ, সৃষ্টির আনন্দ। এণ্ডরুজের জীবনকথা শোনাতে ভালোবাসতেন। তাঁর ত্যাগব্রতী কর্মসাধনা, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর শ্রদ্ধায় প্রীতিতে উচ্ছ্বসিত বন্ধুত্ব। যখন কঠিন সংকটের দিন এসেছে — স্বধর্মের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা সত্ত্বেও মিশনারির প্রথাবদ্ধ ধর্মাচারী জীবন অচলায়তনিক দেওয়াল হয়ে ঘিরেছে তাঁকে, সেই অন্ধকার থেকে সত্যের আলোয় বেরিয়ে আসতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনা করে পথের দিশা খুঁজেছেন এণ্ডরুজ। তাঁকে সমান শক্তি জুগিয়েছে *অচলায়তন* নাটকের পঞ্চক চরিত্র। তার সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করতেন এণ্ডরুজ, আর তাঁর 'প্রিয় গুরুদেব' রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'দাদাঠাকুর'।

সোমেন্দ্রনাথও এক পঞ্চক। তাঁর সত্তার গভীরে পৌঁছেছিল রবীন্দ্রনাথের ডাক। ওই এক দাদাঠাকুরের পায়ে তাঁরও মাথা নত। তাঁর মতো এমন টানে আর কেউ তাঁকে টানেনি। মালতী বলেছিল 'শ্রীমতী ডাক শুনেছে।' প্রকৃতি বলেছিল সেই মানুষটির জন্য তার সাধনা 'যে আমারে দিয়েছে ডাক/ বচনহারা আমারে দিয়েছে বাক্।' ক্ষিতিমোহন সেন স্মরণ করিয়ে দেন বাউলদের কথা। ওরা বলে 'ডাক থুইয়া যাওয়া'। মহাপুরুষরা নাকি উত্তরকালের জন্য ডাক রেখে যান। তাই হল মন্ত্র। শিমূলের বীজ যেমন তার ক্ষেত্র খুঁজে খুঁজে আকাশে ভেসে বেড়ায়, মন্ত্র তেমনি যোগ্য সাধকের চিত্তক্ষেত্রে স্থান পাবার অপেক্ষায় হয়তো বা যুগের পর যুগ ভাসতে থাকে। যিনি সেটি নিয়ে নিজের জীবনে প্রতিষ্ঠা করেন, 'তিনি মন্ত্রকেও সার্থক করেন, আপনাকেও ধন্য করেন।' ভাবের বীজ সার্থক হয়, কিন্তু নিঃশেষ হয় না। সে তবু নিরালম্ব হয়ে ভাসতেই থাকে, উর্বর মাটি খুঁজতেই থাকে। সোমেন্দ্রনাথের মনের জমিতে পড়ে রবীন্দ্রনাথ নামক ভাবসত্যের বীজটি সার্থক হয়েছিল। যেমন সে হয়েছে আরও কত মনোভূমিতে। নিশ্চয় ভবিষ্যতেও হবে। হয়তো সে-সব সার্থকতার প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন, মানবজমিন ভেদে সে ভিন্নতা স্বভাবসংগত।

কিন্তু সোমেন্দ্রনাথ যে এতখানি সফল হতে পেরেছিলেন, তার ভিতরের কথাটা কি? রবীন্দ্রসৃষ্টির জগতে, রবীন্দ্রবিশ্বাসের জগতে তাঁর সুপ্রবেশ? তাঁর সংকল্পের দার্ঢ্য? তাঁর সাংগঠনিক ক্ষমতা? এ-সবই তাঁর আনুকূল্য করেছে, সন্দেহ নেই। সেইসঙ্গে তিনি উত্তম শিক্ষক, সুবক্তা, মানবচরিত্র-অভিজ্ঞ, বাস্তববোধসম্পন্ন। তবু বলব, এর উপরেও আরও কিছু তাঁর ছিল। তার একটি সত্যাশ্রয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'জীবনে জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতসারে

অনেক মিথ্যাচরণ করা যায়, কিন্তু কবিতায় কখনও মিথ্যা কথা বলিনে —'। সোমেন্দ্রনাথের রবীন্দ্রচর্চার ক্ষেত্রটি সৃষ্টি করে তোলার কাজকে কবির এই স্বীকৃতির আলোয় দেখতে আমার দ্বিধা নেই। আমার যতদূর জানা আছে, এ কাজে তিনি কখনও মিথ্যার আশ্রয় নেননি, ফাঁকি দেননি, ভঙ্গি দিয়ে চোখ ভোলাননি, একে নিজের নামপ্রচারের উপলক্ষ করে তোলেননি। এই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কাব্য।

আর যে দুর্লভ গুণে তিনি জয়ী হতে পেরেছিলেন তার নাম ভালোবাসা। সে-কথা আগেই বলেছি। মানুষের প্রতি তাঁর অপর্যাপ্ত ভালোবাসা ছিল। যে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ ধন, সবার সঙ্গে তা ভাগ করে নিতে মানুষকে ডাক দিয়েছিলেন তিনি। কর্তব্যবোধে নয়, ভালোবেসে।

এ তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কাব্য বটে, তবে এ এমন কাব্য যা নিত্য সৃজ্যমানতার রসে জারিত হওয়া চাই। এ কাব্য সমাপ্ত করে কলম বন্ধ করবার সুযোগ ছিল না স্বয়ং স্রষ্টারও। ভবিষ্যৎকালেরও সুযোগ নেই দু'মলাটের ঘেরে এ কাব্যগ্রন্থ বাঁধিয়ে সোনার জলে নাম লিখে নিশ্চিন্ত হবার।

প্রশ্ন। আমাদের শিক্ষক অধ্যাপক অরুণকুমার বসু রচিত *নজরুল-জীবনী* গ্রন্থটি সম্পর্কে মতামত জানতে আমরা আগ্রহী।

উত্তর। নজরুল সম্পর্কে আমি খুব কমই জানতাম। সত্যি কথা বলতে কি, কোনোদিন বিস্তৃত জানার জন্য উদ্যোগীও হইনি তেমন। কবির জীবিতকাল থেকেই এপার-ওপার দুই বাংলায় যথেষ্ট নজরুলচর্চা হয়ে থাকে, জানি। কিন্তু তার মধ্যে যে এতদিন ধরে এত বড় একটা ফাঁক রয়ে গেছে, এ পর্যন্ত কোনো সম্পূর্ণ এবং প্রামাণ্য নজরুলজীবনী প্রকাশিত হয়নি, এ আমার ধারণার বাইরে ছিল। ড. অরুণকুমার বসুর *নজরুল-জীবনী* সেই অভাব পূরণ করেছে। অর্ধশতাব্দীর বেশি সময় ধরে নজরুলের জীবনীর বহু মূল্যবান উপাদান নাকি বিনষ্ট হয়ে গেছে। তথ্যাদি আড়ালে চলে যায়, বহুসন্ধান-সাপেক্ষ হয়ে পড়ে, সে তবু একরকম। কিন্তু এ যাবৎ নানাজনের স্মৃতিকথা ও অন্যান্য রচনায় এত তথ্যবিকৃতি হয়েছে, এত বিভ্রান্তির জট পাকিয়েছে জেনে বোঝা গেল এ-সবের ভিতর থেকে সত্যের সন্ধান ও প্রতিষ্ঠা কত কঠিন কাজ। জানুয়ারি ২০০০ সালে প্রকাশিত, দু হাজার দুই সালের নজরুল পুরস্কারে সম্মানিত বইটি পড়ে ভালো লাগল বলতে দ্বিধা হয়, এমন জীবনের পরিণতি বিষণ্ণ করে। এ বই পড়ে মনে হল এর সবচেয়ে বড় মূল্য এইখানে যে জীবনীকার নজরুলের জীবনের ছড়ানো-ছিটানো বহুবিচিত্র উপকরণগুলিকে খোলা মনে বিচার করে সত্যাসত্য নির্ণয় করেছেন এবং সেগুলির সুপরিকল্পিত বিন্যাসের দ্বারা বহুজনের হাতের নাগালে এনে দিয়েছেন। এর দ্বারা নজরুলচর্চার ক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালিত হল। দ্বিতীয়ত, এক প্রলয় ঝড়ের মতো বয়ে-যাওয়া এই বিদ্রোহী কবির জীবন। একদিকে তার সাহিত্যিক-সাংগীতিক প্রতিভার দীপ্তি, অন্যদিকে বিচিত্র ঘটনা, খেয়ালী মনের অবিবেচনা, স্বভাবজ আত্মখণ্ডনের নানা দিকের অভিঘাতে আলোড়িত তার স্রোত-প্রতিস্রোতের টানাপোড়েন। এমন জীবন-অভিযানের গতিপথ চিহ্নিত করতে অরুণকুমার বসুর মতো একজন দক্ষ কুশলী

নাবিকেরই প্রয়োজন ছিল। এ এমন এক ব্যতিক্রমী জীবন, বয়স চল্লিশ পেরোতে না পেরোতে যার গতি রুদ্ধ হয়ে গেছে, তবুও যাত্রীটি নৌকায় আসীন আরও চৌত্রিশ বছর। সেই উত্তর-পর্বের ইতিহাসও সম্পূর্ণ করে তোলার দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে জীবনীলেখককে। নজরুলপ্রেমিক মানুষ কৃতজ্ঞ থাকবেন তাঁর কাছে। তাঁদের কৌতূহল আগ্রহ ও প্রয়োজনের পরিপোষণে এ বই নির্ভরযোগ্য মাত্রা যোগ করেছে।

প্রশ্ন। 'আমার কথা'য় আপনি আমাদের উদ্দেশ্যে বলেছেন - 'আত্মদীপো ভব। আপনাকে দীপ করে জ্বালো'। তবুও আমাদের (ছাত্রছাত্রীদের) জন্য আপনার বাণী প্রার্থনা করি।

উত্তর। 'পাখি, তোর সুর ভুলিস নে—'

প্রণতি মুখোপাধ্যায় রচনাপঞ্জি ও গ্রন্থপঞ্জি

গোপা দাশশর্মা

অধ্যাপিকা প্রণতি মুখোপাধ্যায়ের অধ্যয়ন অধ্যাপনা ও গবেষণা মূলত রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রপরিমণ্ডলকেন্দ্রিক। প্রায় পনের বছর কলেজে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপনার পরে পেশাগত অধ্যাপনা ত্যাগ করে তিনি টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের মুখপত্র *রবীন্দ্রভাবনা পত্রিকা* সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেছেন ১৯৭৭ থেকে ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারী সংখ্যা পর্যন্ত। ফলে তাঁর অগ্রন্থিত রচনাগুলির অধিকাংশই ছড়িয়ে আছে *রবীন্দ্রভাবনা*-র পাতায় পাতায়। রবীন্দ্রভাবনা-র পূর্বসূরী রবীন্দ্রচর্চা পত্রিকাতেও আছে বেশ কিছু লেখা। নানা বিষয়ে সমৃদ্ধ এই সব লেখাগুলির মধ্যে আছে বহু প্রবন্ধ যার অনেকগুলিতেই রচয়িতার নাম অনুপস্থিত, আছে সম্পাদকীয়, গ্রন্থ সমালোচনা এবং প্রতিবেদন।

প্রণতি মুখোপাধ্যায়ের রচনাপঞ্জি প্রস্তুত করতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলে অনামে প্রকাশিত যে প্রবন্ধগুলির সম্পর্কে নিঃসংশয় হওয়া গেছে কেবলমাত্র সেগুলিকেই এই তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। কিছু প্রতিবেদন বা প্রতিবেদনের মুখবন্ধ স্বয়ংসম্পূর্ণ বা স্বতন্ত্র প্রবন্ধের মর্যাদা দাবি করে। একই কথা বলা চলে কিছু সম্পাদকীয় এবং গ্রন্থসমালোচনা সম্পর্কেও। এই লেখাগুলিকেও পঞ্জিভুক্ত করা উচিত বলে আমাদের মনে হয়েছে।

১৯৯০ পর্যন্ত তাঁর পঠনপাঠন ও লেখালেখি টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটকে কেন্দ্র করেই ঘটেছিল। স্বভাবতই, তাঁর প্রথম জীবনের প্রায় সব গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট থেকে এবং রবীন্দ্রকেন্দ্রিক নানা বিষয়ক রচনা প্রকাশ পেয়েছে *রবীন্দ্রভাবনা পত্রিকায়*। ১৯৯০-এর পরবর্তী কালে প্রমথনাথ বিশী সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ ছাড়া আর কোনো লেখা *রবীন্দ্রভাবনা*-তে প্রকাশিত হয়নি বা টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটের কোনো গ্রন্থে সংকলিত হয়নি। এই পর্বের লেখা সংখ্যায় বেশি নয়, অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত। বর্তমান পর্বে প্রধান গ্রন্থ *ক্ষিতিমোহন সেন* ও *অর্ধশতাব্দীর শান্তিনিকেতন* প্রকাশ করেছেন পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি।

প্রণতি মুখোপাধ্যায়ের রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থগুলির একটি তালিকা প্রস্তুত করা গেল। তালিকাটি দীর্ঘ নয়, অথচ রবীন্দ্রচর্চা ও রবীন্দ্রপরিকর-চর্চার ক্ষেত্রে দৃষ্টান্তস্বরূপ। এ ছাড়া, তাঁর পরবর্তী কাজকর্মের মধ্যে রয়েছে বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত, যার কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে — আপাতত প্রকাশের অপেক্ষায়। সম্পাদিত গ্রন্থের মধ্যে ক্ষিতিমোহন সেন রচনা সংকলনের প্রথম খণ্ডটি *সাধক ও সাধনা* নামে প্রকাশিত হয়েছে। সম্ভাব্য পরবর্তী খণ্ডগুলির নাম যথাক্রমে *ভারত পরিক্রমা*, *বঙ্গমাতা* এবং *রবীন্দ্রনাথ*।

এ কথা আমাদের অনেকেরই জানা ছিল না যে তাঁর লেখক-জীবনের প্রারম্ভিক পর্বে তিনি একটি ইংরেজি উপন্যাসের অনুবাদ করেছিলেন যা *মাসিক বসুমতী* পত্রিকার বৈশাখ ১৩৭০ থেকে মাঘ ১৩৭১ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে বাইশটি পর্বে প্রকাশিত হয়েছিল— রচনাপঞ্জি দ্রষ্টব্য।

প্রকাশিত গ্রন্থ

১ বড়দাদা।। চার্লস ফ্রীয়ার এণ্ডরুজ রচিত দুটি প্রবন্ধের অনুবাদ।।
টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট।। ২৫ বৈশাখ ১৩৭৮।

২ Andrews Papers-Gandhiji on Andrews : From Young India and Harijan।। সোমেন্দ্রনাথ বসু-র সঙ্গে যুগ্মভাবে সম্পাদিত।। Deenabandhu Andrews Centenary Committee।। ১ ফেব্রুয়ারী ১৯৭১।

৩ A List of Writings by C.F. Andrews।
টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট।। ১৯ আশ্বিন ১৩৭৯।

৪ শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম (১৯০১-১৯০৩)।
টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট।। ২৫ বৈশাখ ১৩৭৮।

৫ রবীন্দ্রগ্রন্থ —কালানুক্রমিক সূচী।। রবীন্দ্রচর্চা ভবন।। ১৯৮৪।

৬ উইলিয়ম উইনস্ট্যানলি পিয়র্সন।। রবীন্দ্রচর্চা ভবন।। ১৯৮৪।

৭ দিনেন্দ্র শতবার্ষিকী গ্রন্থ (সম্পা.)।। রবীন্দ্রচর্চা ভবন।। জানুয়ারি ১৯৮৫।

৮ পিয়র্সন (জাতীয় জীবনী গ্রন্থমালা)।। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট।। ১৯৯৪।

৯ ক্ষিতিমোহন সেন ও অর্ধশতাব্দীর শান্তিনিকেতন।।
পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি।। ১৯ আগস্ট ১৯৯৯।
টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট প্রদত্ত দেবজ্যোতি দত্তমজুমদার পুরস্কার এবং ২০০২ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত গ্রন্থ।

১০ ক্ষিতিমোহন রচনা সংকলন। প্রথম খণ্ড। সাধক ও সাধনা। সম্পা.।
পুনশ্চ প্রকাশন। জানুয়ারি ২০০৩।

রবীন্দ্রচর্চা পত্রিকা

১৯৭৫।

১ পিয়র্সন ও পুলিশ রিপোর্ট।
রবীন্দ্রচর্চা। বিশেষ সংখ্যা। রবীন্দ্রসাহিত্য সম্মেলন প্রবন্ধাবলী ১৯৭৪—৭৫।।
সম্পা-প্রমথনাথ বিশী ও সোমেন্দ্রনাথ বসু।

২ নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা।। রবীন্দ্রগ্রন্থের আলোচনা। ফেব্রুয়ারি।

৩ স্মৃতিকথা : মীরা দেবী।। গ্রন্থ সমালোচনা। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর।

৪ অন্তরঙ্গ রবীন্দ্রকথা : ড. পশুপতি ভট্টাচার্য।।
গ্রন্থ সমালোচনা। নভেম্বর-ডিসেম্বর।

১৯৭৬।

১ নিজের প্রাণের স্রোতের পরে আমার প্রাণের ঝরণা নিল তুলি*।
রাজেশ্বরী দত্তের প্রয়াণে স্মরণ। এপ্রিল।

২ আমি দিতে এসেছি শ্রাবণের গান। রাজেশ্বরী দত্তের প্রয়াণে স্মরণ। ঐ।

রবীন্দ্রভাবনা পত্রিকা

১৯৭৭।

১ কবে আমি বাহির হলেম তোমারি গান গেয়ে*। ফেব্রুয়ারি।
২ যেথায় থাকে সবার অধম*। মার্চ।
(১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৭ সোমেন্দ্রনাথ বসু প্রদত্ত বক্তৃতা অবলম্বনে রচিত)।
৩ বিদেশী কবিবন্ধু পিয়র্সন। এপ্রিল।
৪ রবীন্দ্রসান্নিধ্যধন্য জ্ঞানতপস্বী ভাষাচার্য সুনীতিকুমারের দীর্ঘযাত্রা সমাপ্ত*। মে।
৫ শিল্পরসিক আনন্দ কুমারস্বামী। সেপ্টেম্বর।
৬ উইলিয়ম পিয়র্সনের শেষ কটি দিন।। পিয়র্সনের প্রয়াণে কৃষ্ণ কৃপালনীকে লিখিত ডরোথি পিয়র্সনের পত্রের অনুবাদ। ডিসেম্বর।

১৯৭৮।

১ 'খেলাঘর বাঁধতে লেগেছি'*। জানুয়ারি।
২ 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে'*। ঐ।
৩ 'জরুরী অবস্থার শিকার : রবীন্দ্রনাথ'। জুন।

১৯৭৯।

১ রাবীন্দ্রিক প্রদ্যোৎকুমার। মে।
২ রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে নায়িকার রূপবর্ণনা : গোরা ও নৌকাডুবি। জুন।
৩ ভারতবর্ষীয় সভ্যতার সংকট। জুলাই।
৪ রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে নায়িকার রূপবর্ণনা : চতুরঙ্গ ও ঘরে-বাইরে। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর।
৫ রবীন্দ্রচর্চা ভবনের পনেরো বছর। নভেম্বর-ডিসেম্বর।
৬ ইনস্টিটিউটে যাঁদের দেখেছি। ঐ।

১৯৮০।

১ স্মৃতির খেয়া।। সাহানা দেবী। (গ্রন্থ সমালোচনা) মার্চ।
২ তিনি একাধারে আমাদের প্রয়োজন এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত। (রবীন্দ্রচর্চা ভবনে গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে রচিত স্বাগতভাষণ) এপ্রিল-মে।
৩ বৃক্ষরোপণ।। অপব্যয়ী সন্তানের লুণ্ঠিত মাতৃভাণ্ডার পূরণ করবার কল্যাণ উৎসব *। জুন।
৪ উইলিয়াম উইনস্ট্যানলি পিয়র্সন ১৮৮১-১৯২৩। জুলাই-আগস্ট।
৫ আয় আমাদের অঙ্গনে।। রবীন্দ্রচর্চা ভবনে বৃক্ষরোপণ উৎসব*। ঐ।

১৯৮১।

১ স্বর্গের কাছাকাছি : মৈত্রেয়ী দেবী। গ্রন্থ সমালোচনা। অক্টোবর-নভেম্বর।

১৯৮২।

১ রবীন্দ্রভাবনার গ্রাহক ও পাঠকবর্গের প্রতি। সম্পাদকীয়। জানুয়ারি।
২ রূপশিল্পী রবীন্দ্রনাথ - সুধা বসু। গ্রন্থ সমালোচনা। সেপ্টেম্বর।
৩ গুরুদেব*। অক্টোবর-নভেম্বর।

১৯৮৩।

১ সাগর সেন*। প্রয়াণে স্মরণ। জানুয়ারি।
২ রবিতীর্থে বিদেশী।। প্রবীরকুমার দেবনাথ*। গ্রন্থ সমালোচনা। জুলাই।
৩ রবীন্দ্রনাথ পড়াই রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে মিথ্যা প্রচার প্রতিরোধের পথ। নভেম্বর-ডিসেম্বর।

১৯৮৪।

১ রবীন্দ্র-আলোচনায় রুশ-অধ্যাপক দানিলচুক* । ফেব্রয়ারি-মার্চ।
২ যদি হল যাবার ক্ষণ।। সন্তোষ সেনগুপ্ত প্রয়াণ সংবাদ। জুন।

১৯৮৫।

১ রবীন্দ্রচর্চার ক্ষেত্র বিস্তারিত হচ্ছে, রবীন্দ্রবিরোধিতার চক্রগুলিও নিষ্ক্রিয় নেই।। সম্পাদকীয়। জানুয়ারি।
২ রবীন্দ্রচর্চাভবনে উমাশঙ্কর যোশী*।। প্রতিবেদন। ঐ।
৩ শ্রদ্ধায় ভালবাসায় প্রমথনাথ বিশী স্মরণে*। প্রয়াণে স্মরণ। এপ্রিল-মে।
৪ শ্রদ্ধায় ভালবাসায় সোমেন্দ্রনাথ বসু স্মরণে*। প্রয়াণে স্মরণ। জুন-জুলাই।
৫ শ্রীশকুমার কুন্ডু স্মরণে। প্রয়ানে স্মরণে। ঐ।
৬ পুরানো সেই দিনের কথা। প্রমথনাথ বিশী। গ্রন্থ সমালোচনা। আগস্ট।
৭ শিক্ষক সোমেন্দ্রনাথ। সোমেন্দ্রনাথ বসু স্মরণ সংখ্যা। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর।
৮ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়*। প্রয়াণে স্মরণ। নভেম্বর-ডিসেম্বর।
৯ সুরেশরঞ্জন খাস্তগীর : একটি রবীন্দ্রমনস্ক আশ্চর্য প্রাণ*। ঐ।

১৯৮৬।

১ রবীন্দ্রচর্চার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ নামক মানস-সম্পদ অর্জন করতে হবে।। সম্পাদকীয়। জানুয়ারি।
২ শ্রদ্ধায় ভালোবাসায় অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য স্মরণে*। প্রয়াণে স্মরণ। ফেব্রুয়ারি।
৩ রবীন্দ্র-জন্মোৎসবের পটভূমিকায়*।। সম্পাদকীয়। জুন।

৪ কবি অমিয় চক্রবর্তী*। প্রয়াণে স্মরণ। জুলাই।
৫ স্মরণে ভালোবাসায় সোমেন্দ্রনাথ বসু*। আগস্ট।
৬ 'কী ধ্বনি বাজে গহন চেতনা মাঝে' : অমিয়া ঠাকুর। প্রয়াণে স্মরণ। ডিসেম্বর।

১৯৮৭।

১ রবীন্দ্রচর্চা ও রবীন্দ্রভাবনা*।। সম্পাদকীয়। মে-জুন।
২ 'তোমারে স্মরিয়া রেখেছি ভরিয়া ডালা' : সোমেন্দ্রনাথ বসু*।। সম্পাদকীয়। জুলাই-আগস্ট।
৩ কৃষ্ণ কৃপালনী : রবীন্দ্রবোধের এক অক্ষয় অধিকার*। ৮০ বছরের জন্মদিন উপলক্ষে। অক্টোবর।
৪ ইষ হুল্‌টে আইনে লান্ডশাফ্‌ট : আমি একটি দৃশ্য হতে চেয়েছিলাম*।। চিত্র সমালোচনা। ঐ।
৫ রমা : কবির সৃষ্টিলীলা প্রাঙ্গনে সুরলোকের দূতী*। নভেম্বর।
৬ রবীন্দ্র রচনাবলী*।। সম্পাদকীয়। ডিসেম্বর।

১৯৮৮।

১ রবীন্দ্রস্নাতকদের প্রতি * ।। সমাবর্তন ভাষণ। রবীন্দ্রচর্চাকেন্দ্র, কাঁথি। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি।
২ কালো মেঘের ভ্রূকুটি* । সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুশীল মুখোপাধ্যায়-এর প্রয়াণে স্মরণ। জুলাই।
৩ আন্তর্জাতিক রবীন্দ্রকাব্যপাঠ দিবস*। আগস্ট-সেপ্টেম্বর।
৪ হরিপদ কেরাণীর ভাবনা*।। কবিভারতী - কানাই সামন্ত। গ্রন্থ সমালোচনা। অক্টোবর-নভেম্বর।
৫ বিদায়ব্যথার ভৈরবী*।। রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী কনক বিশ্বাসের প্রয়াণে স্মরণ। ঐ।
৬ This World is Beautiful। Rabindranath Tagore। A collection for young people। The Tagore Centre, U.K.*।। গ্রন্থ সমালোচনা। ঐ।

১৯৮৯।

১ টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট : পঁচিশ বছর। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি।
২ উমাশঙ্কর যোশী। ঐ।
৩ রবীন্দ্রসংগীতে যন্ত্রানুষঙ্গ। এপ্রিল।

অন্যান্য রচনার তালিকা

১ 'পূর্ণ প্রাণে চাবার যাহা'।। মুল গ্রন্থ : Kathryn Hulme রচিত The Nun Story।।
মাসিক বসুমতী। ধারাবাহিক বৈশাখ ১৩৭০ থেকে মাঘ ১৩৭১।

২ রূপপতি নন্দলাল। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রচিত প্রবন্ধের অনুবাদ।
রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ।। ৫ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৭৩।

৩ রবীন্দ্রদর্শন। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন রচিত প্রবন্ধের অনুবাদ।
রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ।। সম্পা, সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৫ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৭৩।

৪ Africa and C. F. Andrews
C. F. Andrews Centenary Volume (July 1972)
Ed. Somendranath Bose. Deenabandhu Andrews Centenary Committee
Calcutta : 1972

৫ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবার্ষিকী উৎসব।
দিনেন্দ্র শতবার্ষিকী গ্রন্থ, ১৯৮৫।। টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট।

৬ স্মৃতিকথার আলোকে রবীন্দ্রনাথের আপনকথা।
যুবমানস।। রবীন্দ্রনাথের একশ' পঁচিশ-তম জন্ম-বার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ সংখ্যা। মে, ১৯৮৬।

৭ জাতীয় সংগীত নিয়ে সাম্প্রতিক বিতর্ক প্রসঙ্গে।
চতুরঙ্গ।। মে, ১৯৮৭।

৮ রবীন্দ্রনাথের সংগীতসংকলন গ্রন্থ।
মধুচক্র সাহিত্য সংসদ।। সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব স্মরণিকা ১৯৮৬-৮৮।
শেওড়াফুলি রাজবাটী, হুগলী। ১৯৮৮।

৯ প্রমথনাথ। ৩০ বর্ষপূর্তি : টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট,
কলকাতা। (১৯৬৫-১৯৯৫)। ৩০ ডিসেম্বর, ১৯৯৪।

১০ স্মৃতিকথা : আমার পিতামহী - বসুমতী মা।
নিবোধত।। আষাঢ় ১৪০৪।

১১ কবির আত্মানুসন্ধান।
সাংস্কৃতিক সমধ্বন্।। রবীন্দ্রসংখ্যা, বৈশাখ ১৪০৫। সংখ্যা ১১।

১২ বার্ষিক আধ্যাত্মিক শিবিরের অনুষঙ্গে।
স্মরণিকা : ১৯৯৮।। সারদাকল্যাণ সমাজকল্যাণমূলক সংস্থা।
সম্পা। সুব্রতা সেন।

১৩ বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রভাবনা নিয়ে দুচারটি কথা।
দ্বি-মাসিক সমাজভাবনা।। ইন্ডিয়ান সেন্টার ফর ডেমোক্রাটিক সোশ্যালিজম।
অষ্টম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা -

১৪ আমার কথা। গুরুজন সংবর্ধনা,
১৪০০ সাহিত্য।। ১০ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা।

১৫ ক্ষিতিমোহন সেনের সম্প্রীতি ভাবনা।
দিবারাত্রির কাব্য। ১০ম বর্ষ। মৌলবাদ ও সম্প্রীতি বিশেষ সংখ্যা।

১৬ বসুমতী সাহিত্য মন্দির।
গ্রন্থজগৎ পত্রিকা।। বিশেষ সংখ্যা। ত্রয়োদশ বর্ষ।
আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৭২। সম্পা. অনিলকুমার ভৌমিক।

১৭ ক্ষিতিমোহন সেনের সম্প্রীতি ভাবনা।